

মানুষের দেহত্যাগ ও পরবর্তী জীবন

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

প্রকাশক
সেন্ট্রাল পাবলিশিং হাউস,
১৪বি, স্ট্রট লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৪০

তিন টাকা।

[গ্রন্থকার কর্তৃক সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত ।]

১২নং করিস চার্চ লেনস্থ বিজয়া প্রেস হইতে শ্রীগোপেশচন্দ্র নন্দা
কর্তৃক মুদ্রিত ও ১৪বি, স্কট লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীশচীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বি, এ কর্তৃক প্রকাশিত ।

নিবেদন ।

একাদিক বার আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায় পতিত হইয়া মৃত্যুভয়জনিত দারুণ যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। সুশীল ও সচ্চরিত্র, বিজ্ঞাবুদ্ধি-সম্পন্ন, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের বিয়োগ-জনিত নিদারুণ শোকের ভীষণ যন্ত্রণাও সহ্য করিয়াছি। মনুষ্য জীবনে এই দুই প্রকারের যাতনা এতই কঠোর ও মর্মান্বিতারক যে ভুক্তভোগী ভিন্ন অল্প কাহারও পক্ষে শুধু অল্পধাবনা দ্বারা ইহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। মানুষ মায়ামোহে মুগ্ধ আছে বলিয়াই সময় সময় পার্থিব আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে দূরদর্শী ও চিন্তাশীল অণ্ড প্রকৃত জ্ঞানহীন মানবের পক্ষে আমোদে নিমগ্ন হওয়া ত দূরের কথা, -মৃত্যু ও শোকের লীলাস্থল এই পৃথিবীতে বাস করা নিতান্তই ক্লেশকর হইত। কিন্তু উপায় কি? চক্ষের উপরে প্রাণাদিক পুত্র চলিয়া গেল! সাধ্যাতিরিক্ত চিকিৎসা শুশ্রূষাদি করা ইয়াও রক্ষা করা গেল না! না জানি বাছা আমার কি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে! বাছা কি আমার আছে? যদি থাকিয়াই থাকে তবে কি ভাবে কোথায় আছে—স্থখে কি দুঃখে—তাহার সুখ শাস্তি বিধান করার কোন উপায় আছে কি না, এই সকল স্বাভাবিক প্রশ্নের প্রকৃত ও অবিসংবাদী উত্তর পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইল। কিন্তু, কে দিবে উত্তর? প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধবের শাস্তনা-বাণী তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। শাস্তির উৎস শুষ্ক হইল—পৃথিবী মরুভূমি হইল। প্রাচীন আৰ্য্য-ঋষি-প্রচারিত শাস্ত্রানুশ্রবণে প্রবৃত্ত হইলাম। কোন কোন শাস্ত্রবাণী চিত্তাকর্ষক হইল, কিন্তু নিভ অজ্ঞতামলিন শুষ্ক

হৃদয়ে ইহাদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হইল না। অগত্যা পৃথিবীতে প্রচারিত অগাধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম-শাণ্ডের বাধা এবং তত্ত্বজ্ঞান সমিতি (Theosophical Society) ও পারলৌকিক চর্চা-সমিতির (Society for Psychical Research) গভীর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। শোকসন্তপ্ত ব্যাকুল হৃদয়ে শাস্তি স্থাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া বর্তমান যুগের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের প্রচারিত তথ্যেরও পানিকটী অল্পসন্ধান দ্বারা স্বাভাবিক রূপে মনে যে সকল সিদ্ধান্তের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আবার বর্তমান যুগের জড়-বিজ্ঞান দ্বারাও সমর্থিত হওয়ায়, এ বিষয়ে আমার সকল সংশয় বিদূরিত হইয়াছে। আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে ঋষিবাক্য অশাস্ত—মৃতা বলিয়া কিছু নাই, দেহত্যাগে বাতনা নাই, পার্থিব জীবনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মৃত্যবস্থা এবং জড়দেহ ত্যাগ হইলেই আমাদের প্রকৃত জীবন উপস্থিত হয়। স্পষ্ট বুঝিয়াছি যে দেহত্যাগে লোকের অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের বিলোপ ত হয়ই না, পক্ষান্তরে সমস্ত পার্থিব জালা বহুধার নিবৃত্তি হইয়া মানুষ পরম সূত্র শাস্তির অধিকারী হয়। ইহা আনুমানিক সিদ্ধান্ত নহে—এ বিষয়ের প্রচুর চাক্ষুষ ও পতাক প্রমাণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রিয়জনের দেহত্যাগ হেতু শোকগস্ত হওয়ার মূলে কেবল মানুষের অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিজের দেহত্যাগের কাল উপস্থিত হওয়া মাঝেই সেই পরলোকগত প্রিয়জন উপস্থিত হইয়া দেখা দিবে, কথা কহিবে, সেবা ও সাহায্য করিবে, ইহা সত্য—প্রব সত্য।

জড়-জগতের সর্বপ্রধান জীব মনুষ্যজাতি ভ্রান্ত ধারণার বশবস্তী হইয়া অলীক ভয়ে ভীত ও সঙ্কট অবস্থায় জীবন কাটান বড়ই পরিতাপের বিষয়। মানুষের এই অলীক ভয় ও তজ্জনিত দুর্গতি দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই এই পুস্তক রচয়ণের দুঃসাহসিক কাণ্ডে ব্রতী হইয়াছি। ইহার

উপাদানগুলি সবই সংগৃহীত। লিপিতাত্ত্ব্য ও আমার নাই। কাজেই এই পুস্তক প্রণয়নে আমার নিজের কৃতীত্বের কোনরূপ প্রশংসাই উঠিতে পারে না। সঙ্গীতসাহারণের বিশেষতঃ মাতৃজাতির পাঠোপযোগী করার উদ্দেশ্যে বিষয়টা সোজা ভাবে ও সোজা কথায় প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছি। আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা এই যে, প্রত্যেক নরনারীর অন্তঃকরণ হইতে মৃত্যুভয় ও শোকসম্ভাপ সর্বতোভাবে বিদূরীত হউক।

অনিবার্য কারণ বশতঃ মুদ্রাক্ষণ সময়ে দূরদেশে থাকা হেতু নিজে প্রকৃত দেখিতে সক্ষম হই নাই। তজ্জন্ত মুদ্রাক্ষণে ভ্রম বাতলা সংঘটিত হইয়াছে। শুদ্ধিপত্র দ্বারাও সমস্ত অশুদ্ধ স্থল প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয় নাই। যে যে স্থলে ভাষা অবোদা বা বিসমার্থবোধক হওয়ার আশঙ্কা বোধ হইয়াছে, সঙ্গীয় শুদ্ধিপত্র দ্বারা কেবল ঐ ঐ স্থল প্রদর্শন করারই চেষ্টা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে সঙ্গদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছি। বর্তমান সংস্করণে তদতিরিক্ত কিছু করিবার সাধা নাই।

বিনীত

গ্রন্থকার।

১৩৩০ বাঃ ৫ই আশ্বিন।

১৪বি, স্ট্রটস্ লেন,

কলিকাতা।

সূচী-পত্র ।

বিষয়

পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দেহ ও দেহী	১
দেহ ও দেহীর স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা ব্যাপারে ব্রহ্মবিজ্ঞা ও জড়-বিজ্ঞানের কাৰ্য্যকারিতা	১—৮
এক জীবনেই মনুষ্য দেহের অস্থি, মাংস, রক্ত প্রভৃতি সমস্ত উপাদান পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়	৪
জড়-দেহের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় সমূহ যন্ত্র মাত্র । প্রকৃত ইন্দ্রিয় স্থল দেহে নহে	৫
দেহের পতনে দেহীর পতন হইতে পারে না	৬
মৃত্যু নাই - মৃত্যুতে যাতনা নাই । পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবন হইতে অধিকতর প্রীতি দায়ক	৮
কাঠিয়া বাবা ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৯
রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর ।—মৃত ব্যক্তির সশরীরে দর্শন দান	১০
প্রভু নামক ব্রাহ্মণ কুনার	২১
কাৎসগোরোর পুনর্জন্ম	১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ইহলোক ও পরলোক ।

ইহলোক ও পরলোক	২১
বস্তুর স্থল ও স্থানাবস্থা	২২—২৪
পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ও তাহাদের গুণ	২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
পৃথিবী ও তাহার বহিরাবরণ	২৫—২৭
স্থল স্ফল বিবেচনায় বায়ু এবং আকাশের বহু প্রকার-ভেদ	২৭
স্ফল এবং স্থল বস্তুর মধ্যে স্ফলই অধিকতর বাস্তব জিনিষ	২৮
আমাদের দৃশ্যভূত ভূমি ও জল যেমন দৃশ্য-প্রাণী সমাকীর্ণ, অদৃশ্য ভূত বায়ু, তেজ, আকাশ প্রভৃতি ও অদৃশ্য প্রাণী সমাকীর্ণ	২৯
স্থল ভূতবাসী প্রাণী হইতে স্ফলভূতবাসী প্রাণী শ্রেষ্ঠ ...	২৯
স্থায়ী কিরণই সকল বস্তুর মূল উপাদান	৩০
আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ...	৩১, ১০১
জ্ঞান লাভ করার ঋষি প্রবর্তিত পন্থা	৩৪
পরলোকের অস্তিত্ব ও জীবের জন্মান্তর গ্রহণ বিষয়ে ঋষি- দিগের মতবিরোধ নাই	৩৭
ইহলোকের স্ফলবাস্থ্যই পরলোক । একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া সপ্তলোক গণনা হয়	৩৮। ১১৭
“জগদীশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন” না বলিয়া “জগদীশ্বর জগদাকার ধারণ করিয়াছেন” বলাই যুক্তিযুক্ত ...	৩৯
জগদীশ্বর হইতে ক্রমশঃ স্থলেৱ দিকে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত সৃষ্টিক্রম	৪১
পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব	৪২
জীব জগতের উৎপত্তি	৪৩
জগদীশ্বর অগণিত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপে কোটি কোটি সূর্য্য কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ সম্বলিত অচিস্তনীয় বিরাট আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন	৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে থিয়সফিকেল সোসাইটীর সাক্ষ্য	৪৬
ঐ সোসাইটীর উৎপত্তি বিবরণ	৪৬
অদৃশ্য সাহায্যকারী সম্প্রদায়	৪৯
থিয়সফী মতে ভিন্ন ভিন্ন প্লেন বা লোক	৫০
পরলোকের অবস্থা সম্বন্ধে মহাত্মা সি, ডাবলিউ লিড্‌বিটার সাহেবের বিবৃতি ও যোগী স্বর্ষিগণের মন্তব্য	৫৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

নর-দেহ বিশ্লেষণ ।

ভাবের অভিব্যক্তি	৫৮
নরদেহের পঞ্চকোষ	৫৯
থিয়সফির ভিন্ন ভিন্ন body বা দেহ	৬০
একটি আত্মহত্যা নিবারণিত	৬২
উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন দেহের পৃথক অস্তিত্ব	৬৭, ৮৬
দিব্যজ্ঞান ও দিব্য দৃষ্টি লাভ করার শক্তি প্রত্যেক নম্রুশ্যেতেই সুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে	৭১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

জীবাত্মা ও তাহার জন্মমৃত্যু ।

জীবাত্মা ও তাহার জন্ম মৃত্যু	৭৫
জীবাত্মার স্বরূপ	৭৬, ৮৬
সৃষ্ট পদার্থ মাত্রের পুনরাবর্তনশীল	৮০
দিবা রাত্রি বর্ণন	৮২
সর্বধর্ম সম্বন্ধ	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
হৃদয় দেহের পৃথক অস্তিত্ব ...	৭৬, ৬৭
জড় ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রটি বশতঃই সহজ ভাবে হৃদয় দেহের অনুভূতি হয় না ...	৮৮
স্বপ্ন ও নিদ্রিতাবস্থার আলোচনা ...	৮৯, ১১১, ১১৫
জড়-দেহ ত্যাগের পর জীবের অবস্থা ...	৯০
মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি ...	৯৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

পরলোকের সন্ধান ।

পরলোকের সন্ধান পাওয়ার উপায় আছে ...	৯৭
মানুষের চৈতন্য ও অনুভূতির মূলের অন্বেষণ ...	৯৯
জ্ঞান বুদ্ধির বীজ সকল মনুষ্যে সমান নহে ...	১০০
মানুষের ইন্দ্রিয় গুলির শক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ ...	১০১, ১১
পুরুষকার দ্বারা ঐ সকল ইন্দ্রিয় শক্তি অসাধারণরূপে বদ্ধিত করা যাইতে পারে ...	১০১
মানুষের অনুভূতি আদিবার প্রণালী ...	১০২
মনুষ্য দেহের ভিন্ন ভিন্ন কোষের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের (জগতের) অনুভূতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি না হওয়ার হেতু ...	১০৫
পরলোকের অনুভূতি সকলেরই অল্পবিস্তর হইয়া থাকে ...	১০৬
বর্ণীকরণ মেসমেরিজম্, হিপনটিজম্ আদির আলোচনা ...	১১৫
খ্রীষ্টান মহাপুরুষ ডক্টার মিলারের মন্তব্য ...	১২১
প্রকৃত মানুষ অর্থাৎ দেহীর স্বরূপ নির্ণয় ...	১২২
স্বপ্ন, রজ, তন এই গুণত্রয়ই বন্ধনের মূল ...	১২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবের স্বপ্নান বর্ণন হইতে ক্রমশঃ জড়দেহধারী জীবজগতে	
নানিয়া আসিবার প্রণালী	১২৪
পার্শ্বিক জীবন হইতে পুনরায় মূল বাসস্থান স্বর্গধামে ফিরিয়া	
যাওয়ার প্রণালী	১২৫
দেহত্যাগের পর জীবের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকার	
প্রমাণ	১২৬, ১৩০, ১৩৪
মহাপুরুষগণের সাক্ষ্য বিশ্বাস স্থাপন করার সপক্ষে সুপ্রসিদ্ধ	
বৈজ্ঞানিক প্রফেসার ডেম্‌স্ সাহেবের মন্তব্য ...	১২৯
মৃত্যু নাই—মৃত্যুতে ক্লেশ নাই। প্রিয়জনের দেহত্যাগ	
হেতু শোকাভিভূত হওয়ায় কোন কারণ নাই ...	১৩০
দেহত্যাগের পর ও জীবের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব বর্তমান	
থাকার সপক্ষে বৈজ্ঞানিক ও সাইকিক রিসার্চ সোসাই-	
টির সংক্ষ্য এবং আধ্য-ঋষিগণের প্রচারিত মত ...	১৩০—১৩৪
পরলোকের মোটামোটা অবস্থা	১৩৫
পরলোক সপক্ষে আধ্য-ঋষিগণ একঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচার্য্য	
গণের ঐকমত্য	১৪০
শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীজীর কাণ্ডিত দলইলামার বিবরণ ...	১৪১
কুমিল্লা জজকোটের উকীল ৬কৃষ্ণকুমার দে এম,এ, বি,এল,	
মহাশয়ের দেহত্যাগের বিবরণ ...	১৪১
পুরুষকার বলে স্মৃতি অজ্ঞান করিয়া তদ্বারা জন্ম-	
জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফল খণ্ডন করা যায় ...	১৪৩
মানুষের প্রতি ঋষিগণের প্রদত্ত উপদেশ সমূহের সার-	
সংক্ষেপ	১৪৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেহত্যাগের পরও জীবের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে নানাব্যয়ের মত		
এবং মহাপুরুষের সাক্ষ্য	...	১৪৮
ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের উক্তি	...	১৪৮
মুসলমানী মত	১৫২
পরলোক সম্বন্ধে প্রভু বিজয়রাম গোস্বামীর উক্তি		১৫৬
গোস্বামী মহাশয়ের পরলোকগতা জননী ৬ স্বর্ণময়ীর দেবীর		
দিব্যা দেহে আবির্ভাব ও জলাঞ্জলী গ্রহণ	...	১৫৭
৬ স্বর্ণময়ী দেবী পিতৃলোকের সহিত উপস্থিত হইয়া একাদশ		
দিবসে শাক্ত করার অনুরোধ	১৫৮
আতিবাহিক দেহধারী কোন ও মহাপুরুষের ক্ষম্মিতিকর		
জন্ম গোস্বামী মহাশয়ের অসাময়িক আহাৰ	...	১৫৯
একটি কুকুরের নির্দেশমতে একটি পাতক ও পঞ্চপাত্র সহ		
পিতৃলের হাড়ী ভূগর্ভ হইতে উত্থান	...	১৬২
গোস্বামী প্রভুর পূর্ণজন্মের স্মৃতি জাগরণ	...	১৬০
বিলাত ফেরত ব্যক্তি কর্তৃক পিণ্ড প্রদান ও দিব্যা দেহ দর্শন		১৬৩
গোস্বামী প্রভুর গুরু পরমহংস দেবের কল্পিত দেহে আগমন		১৬৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ		
মানবের দেহত্যাগের পরের অবস্থা	...	১৬৭
মানব জাতির নিম্নস্তরের অবস্থা	১৬৯
সাধারণ সংসারী লোকের অবস্থা	১৭০
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের প্রেতদেহ গঠিত হওয়ার		
নিয়ম	১৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরলোকে উদ্বেগ অশান্তির কারণ	১৭৪
স্থল বিশেষে পরলোকগত ব্যক্তি সাময়িক ভাবে পুনরায় একটি স্থলদেহের আবরণ লইয়া আবির্ভূত হইতে পারে।	১৭৮
পরলোকের বাস্তবতা উপলব্ধি করার অসুবিধার কথা ...	১৮০
স্থল জগতের বিষয় বুঝিবার উপায়	১৮২
পদার্থের স্থল অবস্থা হইতে স্থলবস্থা অধিকতর শক্তিশালী	১৮৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাহ্বার আবির্ভাব

ডাবলিউ, টি, ষ্টেড্ মহোদয়ের পুস্তকের ভূমিকার উদ্ধৃত অংশ	১৮৭
ভৌতিক ঘটনা নানাভাবে সংঘটিত হয় ...	১৮৯
মেডেম্, ডি, এসপেরেন্সের বৃত্তান্ত	১৯১
সি, ডাবলিউ, লিউবিটার সাহেব মহোদয়ের দেহ বিছানায় রাখিয়া পরলোকে যাওয়ার বিবরণ ...	১৯৩
ডিলেনী সাহেবের বর্ণিত পরলোকে বিচরণের ঘটনা ...	১৯৪
ইঞ্জিনিয়ার ভার্লী সাহেবের পরলোকের অভিজ্ঞতা ...	১৯৯
অক্সফোর্ড নগরের দুইজন ধর্মযাজকের বৃত্তান্ত ...	২০০
মিঃ রাবার্ট্ ক্রসের জাহাজের ঘটনা (Steer to the North West)	২০৪

নবম পরিচ্ছেদ ।

মুম্বু লোকের স্থল দেহের বিবরণ ।

ক্রমে তিনবার দেখা দেওয়া	২২০
---------------------------------	-----

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিটন মহোদয়ের মন্তব্য	২২৭
প্রেতাত্মার ফটোগ্রাফ চাওয়া	২২৯
মিসর হইতে টরকোয়ে	২৩১
বৈজ্ঞানিকের ভগিনী	২৩২

দশম পরিচ্ছেদ ।

ভাব দেহ ।

উয়ান্টার সাইটারের ভাব দেহ	২৩৬
সবুজ প্লাব্‌সের কথা	২৩৮
আমার নিজ অভিজ্ঞতা	২৪২
সৈনিকের পিতামহী	২৪৩
শ্রীমতী পেরেটের বৃত্তান্ত	২৪৪
আরাণ্ডালের মা	২৪৭
গেষ্টন থরিণ	২৪৯
সেনাপতি সাহেবের পুনরাবির্ভাব	২৪৯
মৃত ভগ্নীর কীর্তি	২৫৭
কর্তিতবাহ সেনা নাযকের বৃত্তান্ত	২৬০

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

মৃত্যুশয্যা পরলোকগত আত্মীর দর্শন ।

জেনি ও এডিথের বৃত্তান্ত	২৬৬
এডামিনার বৃত্তান্ত	২৬৮

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে আবির্ভাব ।

মৃত কর্তৃক জীবিত আত্মীর সাহায্য	
সহায়তার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী	২৭০
মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্ত	২৭২
মৃত্যুভয় দূর করার জন্ত পিতার আগমন	২৭৪
জনপণ ষ্ট্রাটে আবির্ভাব	২৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত পিতার সতর্কবাণী	২৮৩
চুক্তিবাদ্য প্রেতাঙ্গা	২৮৬
হারাণ ধন বাহির করিয়া দেওয়ার জ্ঞাত প্রেতাঙ্গার আগমন	২৮৮

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

অভিপ্রায় সিদ্ধির জ্ঞাত মৃতের আগমন ।

কাপ্তান ব্রুমবার্গ	২৯৩
ভূতের বাড়ী	২৯৭
অষ্ট্রেলিয়ার রাখাল	৩০০

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

জীবিত কালের গুরুতর ত্রুটি বা অপরাধের
প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে মৃতের আগমন ।

গুপ্ত স্বীকারোক্তি	৩০৩
সঙ্গীতের নেশা হেতু আবির্ভাব	৩১৬
সিগনর বেগনোরো মহাশয়ের প্রত্যক্ষ করা বৃত্তান্ত	৩১৮
সৈন্যাদ্যক্ষ মিঃ বার্টারের বৃত্তান্ত	৩২০
ঝগড়াটে ভূত	৩২৪
পাখীরূপী ভূত	৩২৬

পুনর্জন্ম ।

টিক্ কাঠ নির্মিত বৌদ্ধ মঠের বৃত্তান্ত	৩২৮
মোয়াংশান্ নাইই এবং মান্গাই উইনের বৃত্তান্ত	৩৩৩

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

মৃত্যুভয় ।

মহাবীর আলেকজান্ডার ও দণ্ডী ঋষি	৩৩৮
দেহত্যাগে কষ্ট নাই	৩৪২
রোগ যন্ত্রণা কর্মফলানুযায়ী	৩৪৫

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্ত	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩	১১	“ব্রহ্মবিদ্যাংধর”	ব্রহ্মবিদ্যাংধর
৪২	১০	বায়ু	পায়ু
৪১	৮	বিভাগে	বিভাবে
৪৪	২০	অনুভূতির	অনুভূতির জগৎ
৫৩	১০	recognized	cognized
৫৪	১২	Page 14	Page 141
৫৭	১২	একতার	অজ্ঞতার
৫৬	২১	১২।২৬	১১।২৬
৭৪	৪	ঐ স্মবিচার	ঐশী স্মবিচার
৮৭	৯	বর্গ	স্পর্শ
৯৩	২	মহোময়	মনোময়
১০৪	২	পারিলাম	পারিল
১০৫	৪	প্রভাবিত	সম্ভাবিত
১০৭	১১	অবধারণা	অবধারণ
১১৪	৫	দুরভিসন্ধি	দুরভিসন্ধি সিদ্ধিঃ
১২১	২।৩	দুই লাইন এক কোটেশনে	দুই লাইন দুই পৃথক কোটেশনে হইবে
১৩৭	২০	যাচিস্ন	যাচিস্ব
১৩৬	১৫	উষ্ণপা	উত্পা

(খ)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৯	১৮	(ged)	(god)
১৫২	১১	‘মাতৃগর্ভস্থিত’ শব্দের পর... স্থলে	‘মাতৃগর্ভস্থিত’ শব্দের আস্থার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া মাত্র
১৫৪	১৪	স্মৃতি	স্মৃতি
১৫৭	৪	সেই এক	সেই বাসনার তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয়। সকলের এক
১৭০	১১	পূরক পিণ্ডক	পূরক পিণ্ড
১৯৩	১৮	behide	vehicle
২২২	৮	জনপূর্ণ	জনপূর্ণ
২২৭	১৪	অভিব্যক্ত	অভিব্যক্তি
২৩৫	১৫	রালীলা	রাস লীলা
২৪৭	৩	১৮১২	১৯১৮
২৪৯	১	রহিয়াছেন	রহিয়াছে
২৪৯	৬	১৮১২	১৯১৮
২৮৯	১৫	শজী	শজীর বীজ
২৯৬	৪	আকান্মা	আকাজ্জা

মানুষের দেহত্যাগ ও পরবর্তী জীবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেহ ও দেহী

উপনিষদাদি ঋষিশাস্ত্রে দেহ দেহী, শরীর শরীরী প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে মনে হয় যে দেহ ও দেহী যে দুই পৃথক বস্তু, ঋষিগণ যেন তাহা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ধরিয়া লইয়াছিলেন। জন্ম জন্মান্তরের বিবরণ তাঁহাদের মানসচক্ষে স্পষ্টই প্রতিভাত হইত বলিয়া মনে হয়। “জাতস্য হি ক্রবোমৃত্যু ক্রবং জন্ম মৃতস্ত চ”, “পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নং”, এইরূপ অগণিত বাণী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্রজীবী আমরা ঐ সকল বাণী অবিশ্বাস করিতেও সাহস পাই না, অথচ ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া শাস্তি লাভ করিতেও সমর্থ হই না। ইহার কারণ এই যে এক স্তরের লোক অন্য স্তরের লোকের ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। প্রাচীন কবি বিষয়টা বেশ পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন :—

“গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিগুণঃ

বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি দুর্বলঃ।

গীকো বসন্তস্ত গুণং ন বায়সঃ

করীচ সিংহস্ত বলং ন মুষিকঃ ।”

[গুণীই গুণীর গুণ বুঝিতে পারে, নিগুণে পারে না। বলীই বলীর বল বুঝিতে পারে—তাহা দুর্বলের বোধগম্য নয়। বসন্তের গুণ কোকিলের বোধগম্য—কাকের নয়। আর সিংহের বল হস্তী বুঝিতে সক্ষম—মুষিক নহে]

মূলে কথাটা এই যে ঋষিগণ সাধনাবলে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া দেহ এবং দেহী উভয়কেই দেখিতে পাইতেন। আমাদের সেইরূপ সাধনা না থাকায় দেহীকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব বলিয়াই মনে করিতে পারি না। তজ্জন্মই ঋষিবাক্য দ্বারা আমরা বিষয়টার সন্ধান বা ঠিকানা মাত্র পাইতে পারি কিন্তু তদ্বারা আমাদের বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য অনুভূতি হয় না। বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে মনের ধাঁধাও কাটে না, বিশ্বাসও স্থাপিত হয় না। কাজেই আলোচ্য বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিজ্ঞানের পন্থা অবলম্বন ভিন্ন গতান্তর নাই।

বর্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান আমাদের বিশিষ্ট জ্ঞান লাভের সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার পরিসর বা গভীরতা আজও আশানুরূপ বর্ধিত না হওয়ায় তৎসাহায্যে অভীষ্ট স্থানে পৌছান সম্ভবপর হয় না। অধ্যাত্ম বিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা উর্দ্ধে দাড়াইয়া উর্দ্ধ অধঃ সমস্ত স্পষ্ট দেখিতেছে এবং দৃঢ়তার সহিত স্বরূপ বর্ণনা করিতেছে। অপর দিকে জড়বিজ্ঞান

নিম্নে দাড়াইয়া উর্দ্ধদিগের কয়েকটা সিড়ি পর্য্যন্ত দেখিতে সমর্থ হইতেছে এবং তাহার বর্ণনা করিতেছে। ব্রহ্মবিজ্ঞা ও তদ্বারা অর্জিত জ্ঞান সাধকের নিজ আয়ত্ব থাকে—তাহা সাধারণ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। অপরদিকে জড়-বিজ্ঞান দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সাধারণ্যে সঞ্চে লইয়া চলে। ব্রহ্মবিজ্ঞাবলে বশিষ্ঠ ঋষি লব কুশ কোথায় তাহা নিজে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ক্ষমতাটা একমাত্র ঋষিতেই নিবদ্ধ ছিল। অন্য কেহ তাহা করিতে সমর্থ ছিল না। পক্ষান্তরে জড়বিজ্ঞানের বেতারবার্তার ফল সমস্ত পৃথিবী যথেষ্টা ভোগ করিতেছে।

উপরি উক্ত অবস্থাধীনে আমাদের ন্যায় নিম্নস্তরের ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র এই পন্থাই অবলম্বনীয় বলিয়া মনে হয় যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা কর্তৃক প্রচারিত ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত ক্রমনিম্ন অসংখ্য সোপানাবলীর মধ্যে নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে যে কয়টা সোপান পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞান আলোকিত করিতে পারিয়াছে, ঐ কয়টা সোপানের অবস্থা কোন প্রকারের আলোক কিরূপ দেখায় তাহা লক্ষ্য করা। ব্রহ্মবিজ্ঞা যখন তাহার বক্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে, এখন জড়বিজ্ঞানের বক্তব্য জানিতে পারিলেই খাঁটা সত্য উপনীত হওয়া অনেকটা সহজ হইয়া পড়িবে। কারণ জড়বিজ্ঞান যতটুকু দেখাইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষই দেখাইয়া দেয়। জড়বিজ্ঞানের আলোকরশ্মি অবশ্য অধিক উর্দ্ধে আরোহণ করে নাই, তথাপি ইহা ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে থাকায় ইহার নূতন আবিস্কৃত তথ্যগুলির সঙ্গে

যদি ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ব প্রচারিত তথ্যগুলি ক্রমশঃ মিলিয়া যাইতে থাকে তবে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারিত উদ্ধাস্ত সোপানগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করাও আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া উঠিবে।

এখন লক্ষ্য করুন, ব্রহ্মবিদ্যা বজ্র-নির্ঘোষে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে যে দেহ ও দেহী পরম্পর পৃথক বস্তু। দেহটী দেহীর একটা পোষাক মাত্র, ঐ পোষাক খুলিয়া দিলেও দেহীর কিছুই যায় আসে না। দেহী অক্ষয়, অজর, অমর। সে অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হয় না, আগুনে পোড়া যায় না, জল দ্বারা আর্দ্র বা বিগলিত হয় না, বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইয়া যায় না।

অপরদিকে জড়বিজ্ঞান কিন্তু দেহী সম্বন্ধে নীরব। দেহ সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞানের বলে সে সকলকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছে যে আজ যে দেহে যে অস্থি মাংস রক্ত মজ্জা আদি ভৌতিক পদার্থ আছে, কয়েক বৎসর পর ঐগুলির অনুমাত্রও থাকিবে না। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ পৃথক পরমাণু দ্বারা গঠিত পৃথক অস্থি মাংস রক্ত মজ্জা আদি বিশিষ্ট সম্পূর্ণ নূতন দেহ থাকিবে।

তাহা হইলে বিষয়টা এইরূপ দাড়াইতেছে যে, ধরুন সাত বৎসর পূর্ব্বে আমার যে দেহ ছিল সেই দেহস্থিত একটী অতি সূক্ষ্ম পরমাণুও আজ আমার দেহে নাই। আমার বর্তমান দেহটী একটী সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে গঠিত একটী নূতন দেহ। অবশ্য দৈনন্দিন ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে ক্রমশঃ এক নূতন দেহে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কৈ? আমার

অর্থাৎ এই দেহ সংক্রান্ত দেহীর ত কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্বভাব, চরিত্র, স্মৃতি, বুদ্ধি, বিদ্যা। অভ্যাস সবই ত বর্তমান রহিয়াছে। পূর্ব দেহের সঙ্গে ত কিছুই চলিয়া যায় নাই! ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে দেহটী দেহীর ব্যবহারের একটি যন্ত্র মাত্র?

দেহের অংশ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলও দেহী হইতে পারে না। ইহারা দেহযন্ত্রের কলকজা মাত্র। ইহারা দেহী দ্বারা পরিচালিত হয়। দেহী পরিচালনা না করিলে ইহারা নিজে কিছুই করিতে পারে না। ইহারা দেহী ত নহেই, দেহের অত্যাৱশ্যক অংশও নহে। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি না থাকিলেও দেহের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। দেহীও ইহার আশ্রয় ত্যাগ করে না। বিশেষতঃ চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি বহিরিন্দ্রিয়গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয়ই নহে। ইহারা অন্তরিন্দ্রিয়ের যন্ত্র মাত্র। অন্তরিন্দ্রিয় অনুপস্থিত থাকিলে শুধু বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা কোন কাজই হয় না। অনেক সময় এইরূপ হইয়া থাকে যে চক্ষুর সাম্নে দিয়া একটা লোক চলিয়া গেল, অথচ কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। সাম্নে আসিয়া কেহ কিছু বলিয়া গেল অথচ তাহা শুনা হইল না। এইরূপ ব্যাপার অনবরত সংঘটিত হইতেছে না কি?

আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জীবনকে প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য। শৈশবে যে দেহ থাকে

বাল্যে তাহার একটী পরমাণুও থাকে না। সেইরূপ বাল্যের দেহ কৈশোরে থাকে না। কৈশোরের দেহ যৌবনে থাকে না। যৌবনের দেহ প্রৌঢ়ে থাকে না এবং প্রৌঢ়ের দেহ বার্দ্ধক্যে থাকে না। ইহা জড়বিজ্ঞান সম্মত প্রত্যক্ষ সত্য। এক জীবনের মধ্যেই দেহী পুনঃ পুনঃ দেহত্যাগ করে এবং নূতন নূতন দেহ গ্রহণ করে তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। দেহত্যাগ করা এবং নূতন দেহ গ্রহণ করা যেন তাহার স্বভাব।

অপর দিকে আমরা জড়বিজ্ঞানের নিকট ইহাও পাইতেছি যে দেহ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহীর পরিবর্তন হয় না। সে যা ছিল তা ত থাকেই অথচ কোন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করে। দেহ ও দেহীর উপাদান যখন এক নহে তখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে যে দেহের পতনে দেহীর পতন হইতে পারে না। দেহ পচিয়া গেলে কিম্বা দগ্ধ হইয়া গেলেও দেহী থাকিবে।

আর এক দিক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে দেহী কখনো দেহের জন্ত শোক করে না। পক্ষান্তরে দেহী দেহীর জন্ত শোক করে। আমরা যাহাকে একান্ত ভালবাসি সে যদি বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া বিকৃতমনা হয়—অর্থাৎ খাইতে পরিতে ও চলা ফিরা করিতে পারে কিন্তু কিছু বুঝে না, পরিবারস্থ লোক-কেও চিনিতে পারে না, কাহাকেও ভালবাসে না, মনের বিকৃতি-বশতঃ ঘরে আগুণ দিতে কিম্বা গলায় ছুরি বসাইয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করে না, তবে তাহার প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকে কি ?

এইরূপ অবস্থা ঘটিলে আমাদের ভালবাসা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে বিলুপ্ত হয়। মনে হয়, যাহাকে ভালবাসিতাম সে এই দেহে নাই।

আবার লক্ষ্য করুন, প্রিয়জনের শৈশব দেহ চলিয়া গিয়া বালা দেহ হইল এবং ক্রমশঃ বালা দেহ চলিয়া গিয়া কৈশোর দেহ হইল, আবার কৈশোর দেহ চলিয়া গিয়া যৌবন দেহ উপস্থিত হইল; তজ্জন্ম আমরা কখনো ব্যাকুল বা দুঃখিত হই কি? বাস্তবিক দেহীর সঙ্গেই দেহীর সম্পর্ক এবং দেহীর সঙ্গেই দেহীর কাজ কারবার চলিতেছে। দেহটা যানবাহনের কাজে লাগে এইমাত্র।

আবার দেহীকে চিনিবার যন্ত্র যখন হইতেছে দেহ, তখন কাজ কারবার উপলক্ষে দেহেরও আবশ্যক রহিয়াছে। পরিচয়ের জন্ম অনুরূপ একটা দেহ থাকিলেই আমাদের আর কোন আপত্তি থাকে না। জীবদ্দশাকালের ক্রমপরিবর্তিত দেহগুলি একরূপ আকৃতি বিশিষ্টই থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আকারের অর্থাৎ আয়তনের পরিবর্তন হয়। তাহাতে কিছুই যায় আসে না।

এখন প্রশ্ন আসিতেছে যে এক জীবনে দেহী যেরূপ পুনঃ পুনঃ দেহ পরিবর্তন করিয়া অনুরূপ দেহ ধারণ করে, জড়-দেহ শেষ ত্যাগ করার পর অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে পূর্ব অভ্যাস বশতঃ কোন একটা দেহ অবলম্বন করিয়াই থাকে কি না? এই প্রশ্নটাই হইতেছে এই পুস্তকের মূল লক্ষ্যস্থল; এবং এই পুস্তকে আগা গোড়াই এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা চলিবে। পৃথিবীর

সর্বশ্রেষ্ঠ মানবগণের সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা উপার্জিত জ্ঞানসমুদ্র মন্বন করিয়া ইদানীন্তন দেশীয় ও পাশ্চাত্য মনিষীগণ জড়বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া যে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই হইবে উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর। সেই উত্তর অতীব আশা ও শান্তিদায়ক। ইহা তাপিত প্রাণ শীতল করে—মরুভূমিতে জলপ্লাবন করে—জীবন মধুময় করে! সেই উত্তরের সন্ধানেই ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। আপাততঃ পাঠক মহাশয়ের আগ্রহ নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে উত্তরের সারভাগ এই স্থলে দেওয়া যাইতেছে :—“মৃত্যু নাই, মৃত্যুতে যন্ত্রণা নাই, মৃত্যুর পর সবই থাকে, অনুরূপ দেহ পর্য্যন্ত থাকে, কোন বিষয়ে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হয় না—মোটের উপর পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবন হইতে অধিকতর প্রীতিদায়ক। মৃত ব্যক্তিগণই প্রকৃত জীবিত। তাঁহারা ইহলোকের তথাকথিত জীবিত লোকের দুর্গতি দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিবার ও আলাপ করিবার উপায় আছে। জীবিত ব্যক্তির পক্ষে গায়ের ওভারকোটটি খুলিয়া ফেলা যেক্রপ, দেহত্যাগও ঠিক তদ্রূপ।” মৃত্যুর পর দেহী কি কৌশল বা প্রণালীতে কি অবস্থায় কোথায় থাকে এই সকল খুঁটিনাটি ও জটিল বিষয়ের আলোচনার পূর্বে প্রেতাঙ্গা অর্থাৎ পরলোকগত ব্যক্তির সম্বন্ধে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

পরলোকগত মহাপুরুষ কাঠিয়া বাবা ও

৩বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় এখনও জীবিত আছেন । সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতে তাঁহার নাম হইয়াছে সন্তদাস কাঠিয়া । প্রথম হইতেই তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকশীল ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন । তৎকালে গ্রাম্য হিন্দু সমাজ অধিকতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিবেকহীন দেখিয়া তিনি ইহার প্রতিবাদী হওয়ায় ঐ সামাজিক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ধর্ম্ম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া মনে করিত । তাঁহার সমাজ বিরোধী আচার ব্যবহার এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে একটা ঘোরতর বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল । অবশেষে স্বনামখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু রামদাস কাঠিয়া বাবার সংসর্গ লাভ করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হয়, এবং তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । কাঠিয়া বাবা পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন । দেহত্যাগের পূর্ব্ব তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যদিগকে এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে দেহত্যাগের পরও আবশ্যক হইলে তিনি সশরীরে উপস্থিত হইয়া দেখা দিবেন ও আবশ্যক মতে উপদেশ দিবেন । তদনুসারে দেহত্যাগের পরও কাঠিয়া বাবা পরলোকগত ৩বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় তারাকিশোর বাবুকে দেখা দিয়াছেন ও উপদেশ দিয়াছেন । তারাকিশোর বাবু এখন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী—বৃন্দাবনে আছেন ।

শ্রী শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।

কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহতাগ করার অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস আকাশ পথে এক সুবর্ণময় রথ চলিয়া যাইতে, এবং তাহার ভিতরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়াছিলেন ।

সশরীরে দর্শন দান ।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত তন্তুর গ্রামনিবাসী পূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ ছিলেন । তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও প্রতিষ্ঠাশালী চিকিৎসক বটেন । তাঁহার বর্তমান বয়স ৬৮ বৎসর । তিনি আমাকে স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের (পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র) আদ্য শ্রাদ্ধের দিন বেলা ১১টার সময় তিনি স্বয়ং মৃত ছেলেকে সশরীরে দেখিয়াছেন, এবং ছেলের পিতা তৎকালে জীবিত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকেও দেখাইয়াছেন । ঘটনাটি এইরূপ :—

তাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্নই একটা পুষ্করিণী । পাড়ে বাঁশ-ঝাড় আছে এবং কোন কোন বাঁশ কাৎ হইয়া জলের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে । বাড়ী হইতে তাহা দেখা যায় ।

বাড়ীতে শ্রাদ্ধের আয়োজন হইতেছে এবং সকলেই কাজে ব্যস্ত এমন সময় তিনি বাহির বাড়ী হইতে আসিবার কালে দেখিতে পাইলেন জলের উপর ঝুলান একটা বাঁশের উপর ঐ ছেলেটি বসিয়া পা দুখানা নীচ দিকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে । পরণে এক খানা লাল পেড়ে কাপড় ।

পূর্ণ কবিরাজ মহাশয় এই ধরনের ঘটনাকে মোটেই বিশ্বাস করিতেন না ; বরং উপেক্ষা করিতেন । তজ্জন্ম তাহাকে দেখান আবশ্যক মনে করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন । উপস্থিত আরও দুই এক জন দেখিল । এ অবস্থায় হঠাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব হইল । বাঁশুটি নড়িয়া উঠিল ।

প্রভু নামক ব্রাহ্মণ কুমার ।

আমাদের জন্মভূমির কৃতী সন্তান রাও বাহাদুর পণ্ডিত শ্যাম সুন্দর লাল সি, আই, ই মহোদয় রাজপুতানার গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী । তিনি জন্মান্তর বাদ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন, এবং জন্মান্তর বাদের সমর্থক বহু ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন । তন্মধ্যে ১৯২৩ ইং সনে তিনি একটী ঘটনার বিবরণ প্রচার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাজধানী নিউইয়র্ক নগরীতে পাঠাইয়াছিলেন । ১৯২৩ ইং সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ নামক পত্রিকায় ঐ বিবরণ প্রকাশিত হয় । নিম্নে বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল ।

“ভরতপুরের মহারাজার সুবিশাল রাজ্য মধ্যে খয়ের্তি নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তাঁহার পুত্রের নাম প্রভু । এই প্রভুর বয়স যখন মাত্র ৪ বৎসর, তখন সে শৈশব-সুলভ হাসিখেলার মধ্যে তাহার নিজ পূর্ব জন্মের বিবরণ বলিয়া ফেলিল । তাহার পূর্ব জীবনের নাম, ঐ জীবনের স্ত্রী ও পুত্র কন্যার নাম, তাহাদের বিবাহে কি পরিমাণ টাকা পাইয়াছিল

তাহা—ঐ জীবনের তাহার বাড়ী ঘরের বিবরণ, প্রতিবেশীদের নাম ধাম, পূর্ব জন্মে সে কোন সনে জন্মিয়াছিল, তাহার চেহারা কেমন ছিল, ঐ জীবনে কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিল, তাহার শেষ জন্মের ৫০ বৎসর পূর্বে দেশে যে একবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাও সে বলিল।

একে ত ছেলের বয়স মাত্র ৪ বৎসর তাহার উপর এই ছেলের প্রতিবেশী বহু বিদ্বান ও পণ্ডিত লোক আছেন ; ঐ সকল পণ্ডিত লোক ধর্মতঃ সাক্ষ্য দিতেছেন যে এই ছেলেকে কেহ কখনো এইরূপ বলিতে শিক্ষা দেয় নাই। এইরূপ শিক্ষা পাওয়ার তাহার কোনরূপ সুবিধাও ছিল না। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে কোন কথা কখনো তাহার কাণেও যায় নাই।

শিশুর মুখে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া সেই গ্রামে ও অঞ্চলে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক একত্রিত হইয়া শিশুকে লইয়া তাহার কথিত পূর্ব জন্মের স্থানে রওয়ানা হইলেন। সেখানে গিয়া গ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করতঃ শিশুর কথিত সমস্ত প্রকৃত বলিয়া প্রমাণ পাইলেন। তাহার কথিত স্ত্রী পুত্রের নাম পর্য্যন্ত মিলিয়া গেল।

ছেলের পূর্ব জন্মের বসত বাড়ী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানের অবস্থার ইতিমধ্যে ঘোরতর পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি ঐ শিশু তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে কি না দেখিবার

জন্ম কৌতূহলী হইয়া কেহ ঐ শিশুকে উক্ত পরিবর্তনের কথা বলিল না। ঐ স্থানটা এক বৃহদাকার ধ্বংসস্থাপে পরিণত হইয়াছিল। শিশু ঐ ধ্বংসস্থাপের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিল এবং ইহার নিকটেই বাড়ী ছিল বলিয়া বলিল কিন্তু ঠিক স্থানটি নির্দেশ করিতে পারিল না।

অশুরূপ একটা ঘটনা জাপান দেশে সংঘটিত হইয়াছে। বিবরণটা লিপিবদ্ধ হইয়া সেই দেশের অনেক বড় বড় রাজ-কন্সচারী, ধর্ম্মযাজক ও সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত মতে দলিল আকারে পরিণত হইয়া রাজ তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত আছে। বর্তমানের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

কাৎসোগোরোর পুনর্জন্ম।

গত বৎসরের একাদশ মাসে কোনও একদিন কাৎসোগোরো ধান ক্ষেতে খেলা করিতে করিতে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ফুসাকে বলিল

“দিদি তুমি আমাদের পরিবারে জন্মিবার পূর্বে কোথায় ছিলে?”

ফুসা বলিল, “জন্মের পূর্বে কোথায় ছিলাম তাহা কিরূপে বলিব?”

তখন কাৎসোগোরো আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া বলিল “তবে তোমার জন্মের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তোমার মনে নাই?”

ফুসা জিজ্ঞাসা করিল “তোমার কি মনে আছে নাকি?”

কাৎসোগোরো বলিল “মনে আছে বৈ কি। তুমি কি

জান না যে আমি হোডোকুবো নামক স্থানের ক্যুবিশান নামক ব্যক্তির পুত্র ছিলাম। আমার নাম ছিল টোজো।”

ফুসা বলিল “হো ! হো ! আমি এই সব কথা বাবা মাকে ব’লে দিব।” কিন্তু কাৎসোগোরো তাহাতে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল ‘দিদি তোমাকে অনুনয় করি বাবা মাকে এ সব কথা বলিও না। তাহাদিগকে এ সব কথা বলা ভাল না।” ফুসা খানিকক্ষণ পরে বলিল “আচ্ছা এখন বলিব না কিন্তু তুমি যদি আর কখনো ছুঁছুঁমি কর তবে বলিয়া দিব।”

ইহার পর হইতে যখনই এই দুজনের মধ্যে ঝগড়া হইত তখনই ফুসা বলিয়া উঠিত “আচ্ছা ঐ কথাটা বাবা মাকে বলিতেছি।”

এই কথা বলিলেই ছেলেটা কাতর হইয়া পড়িত। অনেক বার দু’জনের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হইয়া গেল। ঘটনাক্রমে একদিন তাহাদের বাপ মা আড়ালে থাকিয়া তাহাদের এরূপ কথাবার্তা শুনিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কাৎসোগোরো কোন অন্যায় কাজ করিতেছে। সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ফুসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ফুসা ঠিক সত্য কথাটা বলিয়া ফেলিল। এই কথা শুনিয়া ছেলের পিতা জেঞ্জো এবং জেঞ্জোর স্ত্রী ও ছেলের পিতামহী সূয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কাৎসোগোরোকে ডাকিয়া আনিলেন এবং ফুসলাইয়া এবং কিছু ধমক দিয়া প্রকৃত বিষয়টা তাহার নিকট জানিতে চেষ্টা করিলেন। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করতঃ কাৎসোগোরো বলিল :—

“আপনাদের নিকট আমি সবই বলিতেছি। আমি হোডোকুবো নিবাসী কুাবিশান্‌এর পুত্র ছিলাম। আমার মায়ের নাম ছিল ওসিব্‌জুশান। আমার ৫ বৎসর বয়সের সময় পিতার মৃত্যু হয়। তখন হান্‌সোরিসান নামক অপর এক জন আসিয়া আমার পিতৃস্থান অধিকার করেন। তিনিও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার পর বৎসর ৬ বৎসর বয়সে বসন্ত রোগে আমার প্রাণ বিয়োগ হয়। তাহার তৃতীয় বৎসর আমি আমার মাননীয় বর্তমান জননীর গর্ভে প্রবিষ্ট হই এবং পরে যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি।”

এই কথা শুনিয়া বালকের পিতামাতা এবং পিতামহী অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং অবিলম্বে হোডোকুবোতে যাইয়া হানসিরো-সানের নিকট সমস্ত বিষয় তদন্ত করিতে সংকল্প করেন। কিন্তু তাহাদের সময়ের অভাব ছিল। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত সকলেরই ঘোরতর পরিশ্রম করিতে হইত। কাজেই তৎক্ষণাৎ তাহারা তদন্ত করিতে সময় পায় নাই। কাৎসোগোরোর জননী সেয়াইর একটা শিশুকণ্ঠা ছিল। তাহার নাম সুনী। সুনীকে রাত্রে স্তনের দুধ খাওয়াইতে হইত। সেইজন্য কাৎসোগোরো তাহার পিতামহী সূয়ার সঙ্গে গুইত। বিছানায় গুইয়া দিদি নাতির মধ্যে অনেক কথাবার্তা হইত। একদিন খুব খুসীর সহিত কথা-বার্তা চলিতে চলিতে কাৎসোগোরো তাহার পূর্বমৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা বলিতে সম্মত হইল। বলিল “যখন আমার ৪ বৎসর বয়স তখন পর্য্যন্ত সবই আমার পরিষ্কার মনে ছিল। তাহার পর

হইতে কিছু কিছু করিয়া ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছি। এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, বসন্তরোগে আমার মৃত্যু হয়। আমার মনে হয় একটা মৃৎপাত্র আমাকে রাখা হইয়াছিল এবং একটা পাহাড়ে আমাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। মাটিতে একটা গর্ত করা হইয়াছিল এবং লোকেরা সেই গর্তের মধ্যে মৃৎপাত্রটী নিক্ষেপ করিয়াছিল। পন করিয়া যে মৃৎপাত্রটী পড়িল তাহাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তারপর আমি একভাবে পুনরায় ঘরে গেলাম এবং নিজের বালিশটী শিয়রে দিয়া পড়িয়া রহিলাম। এমন সময় ঠাকুরদাদার মত বড় একজন আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। তিনি কে বা কি তাহা আমি জানিতাম না। আমি যে চলিলাম তাহা শূন্য বায়ুর উপর দিয়া উড়িয়া যাওয়ার মত। যাওয়ার সময়টাতে আমার মনে হইল যেন দিনও নয়, রাতও নয়, সন্ধ্যা সময়ের ত্রায় অস্পষ্ট দিবালোক। গরমও লাগিল না ঠাণ্ডাও লাগিল না। ক্ষুধাও পাইল না। আমরা বহুদূরে চলিয়া গেলাম তথাপি যেন বাড়ীর লোকের কথাবার্তা কিছু কিছু শুনিতে পাইতেছিলাম। আমার জ্ঞান যে মত্ত পড়া হইল তাহাও শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে বাড়ীর লোকে বাড়ীর উপাসনা গৃহে চাউলের গুড়ির পিঠা গরম অবস্থায় উৎসর্গ করিল। আমি তাহার স্বাদ পাইলাম। ঠান্দি, মৃত লোকের উদ্দেশ্যে গরম খাওয়া উপহার দিতে কখনো ভুলিবেন না। পুরোহিতকেও তাহা দিবেন। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি ইহা করা বড়ই ভাল। আমার ইহাও মনে হইতেছে

যে ঐ কুড়া লোকটী আমাকে অনেক জায়গা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অবশেষে এখানে আনিয়াছে। আমার মনে হয় গ্রামের বাহিরের সরক দিয়া আমরা আসি। তারপর এখানে আসি। এই ঘরটী দেখাইয়া দিয়া বলে যে এখানে তুমি পুনরায় জন্মাবে। কারণ তোমার মৃত্যু হইতে তিন বৎসর পূর্ব হইতে চলিল। যিনি তোমার পিতামহী হইবেন তিনি খুব দয়ালু ব্যক্তি। অতএব এখানে গর্ভস্থ হওয়া ও ভূমিষ্ঠ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল হইবে। এই কথা বলিয়া বুড়া চলিয়া গেল।

“আমি এই বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্ব্বে কতকক্ষণ সময় এই কফি গাছটার তলায় ছিলাম। তারপর যখন প্রবেশ করিতে যাই তখন ঘরের ভিতরের কথাবার্তা শুনিয়াছিলাম। কোন একজন বলিল যে বাবার রোজগার যখন অনেক কমিয়া গিয়াছে তখন মাকে চাকরী করার জন্য জেডো সহরে যাইতে হইবে। আমি মনে করিলাম এই বাড়ীতে যাইব না। এই ভাবিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত বাগানে রহিলাম। তৃতীয় দিনে শেষ মীমাংসা হইল যে মা জেডোতে যাইবেন না। ঐ দিন রাত্রিতে বেড়ার বাঁপের ছিদ্র দিয়া আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। ইহার পর আমি রান্নাঘরের কিনারায় ৩ দিন ছিলাম। তারপর আমি মাননীয়া জননীর (বর্তমান) গর্ভে প্রবেশ করি। আমার মনে হইতেছে যে ভূমিষ্ঠ হওয়া উপলক্ষে কোন প্রকার ক্লেশ বা যাতনা হয় নাই। ঠান্দি, এই সব কথা তুমি বাবা মাকে বলিতে পার কিন্তু অন্য কাহাকেও বলিও না।”

কাৎসোগোরোর কথিত এই বৃত্তান্ত তাহার ঠান্দি তাহার পিতামাতার (জেঞ্জো ও জেঞ্জো-পত্নী) নিকট বলিলেন। তখন হইতে কাৎসোগোরো তাহার জনকজননীর নিকটও এই সব কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। সরলভাবে সব কথা বলিত। সময় সময় তাহার পিতামাতাকে বলিত “আমি কুবিসানের সমাধি মন্দিরে যাব।”

এই সনের প্রথম মাসের ২০শে তারিখ সূয়া তাহার নাতিকে লইয়া কুবিসানের সমাধি মন্দিরে যাওয়ার জন্য জেঞ্জো তাহার মাতা সূয়াকে বলিয়াছিলেন। সূয়া কাৎসোগোরোকে লইয়া হেডোকুবো গ্রামে গেলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই সূয়া কয়েকটা বাড়ী দেখাইয়া কাৎসোগোরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সেইটা কোন বাড়ী? এই বাড়ী না সেই বাড়ী?” কাৎসোগোরো বলিল “না না, এই সব বাড়ী নয়। সেই বাড়ী আরও সামনে।” এই কথা বলিয়া সে সূয়ার আগে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষটায় এক বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উঠেঃস্বরে বলিল “এই সেই বাড়ী।” এই বলিয়া সে ঠান্দি আসিবার অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তারপর সূয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করতঃ একজনকে জিজ্ঞাসা করিল “এই বাড়ী কাহার?” একজন উত্তর করিল “হানসিরোর”। সূয়া হানসিরোর স্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর হইল “সিবজো।” তারপর টেজো নামে কোন ছেলে এই বাড়ী জন্মিয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলে

উত্তর হইল “হা, কিন্তু সেই ছেলে ১৩ বৎসর পূর্বে ৬ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।”

এতক্ষণে সূয়ার নিশ্চিত ধারণা হইল যে কাৎসোগোরো যে সব কথা বলিয়াছে সবই সত্য এবং সূয়া দরবিগলিত ধারায় চক্ষুজল ছাড়িয়া দিল। তখন সূয়া ঐ বাড়ীর সকলের নিকট কাৎসোগোরোর কথিত তাহার পূর্বজীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। হান্সিরো এবং তাঁহার পত্নী শুনিয়া অবাক হইলেন এবং কঁাদিতে কঁাদিতে কাৎসোগোরোকে আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে টেজোর যে চেহারা ছিল তাহা অপেক্ষা এবারকারে কাৎসোগোরোর চেহারা অনেকটা সুশ্রী হইয়াছে। ইতিমধ্যে কাৎসোগোরো এদিক ওদিক দেখিতেছিল। হান্সিরোর বাড়ীর সামনে একটা তামাকের দোকানের ছাদ দেখিয়া কাৎসোগোরা বলিল “এই বাড়ীটা এখানে ছিল না।” আরও একটা গাছ দেখাইয়া বলিল “এই গাছটাও এখানে ছিল না।” হান্সিরো এবং তাহার স্ত্রী দেখিল যে বালক যা বলিতেছে সবই সত্য। তদবধি তাহাদের মন হইতে সব সংশয় বিদূরিত হইল।

কাৎসোগোরোর বৃত্তান্তটী পাঠক মহাশয়ের সামনে উপস্থিত করা গেল। এই বৃত্তান্তটী একটা চিত্রের আয় প্রতিভাত হইবে। শত যুক্তি তর্ক হইতেও একটা প্রত্যক্ষ ঘটনা অধিকতর মূল্যবান এবং প্রকৃত ধারণা উৎপন্ন করিতে সমর্থ। বৃত্তান্তটী সম্বন্ধে একটু অনুধাবনা করার জন্য পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ

করিতোছ। বিবরণটি জাপানের গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দলীল আকারে সুরক্ষিত আছে। তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যাহাতে ভবিষ্যতেও কোনরূপ সংশয় আসিতে না পারে তজ্জন্ত বহু গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর ও মোহরযুক্ত মতে রাখা হইয়াছে। জাপানীরা পৃথিবীতে একটী প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি। এশিয়া মহাদেশে ইহাদের সমকক্ষ নাই। জ্ঞান বুদ্ধি পরাক্রম ও মনুষ্যত্বে ইহারা পৃথিবীর কোন সভ্য জাতির তুলনায়ই হীন নহে। তাহাদের গভর্ণমেন্ট কর্তৃক কোনরূপ মিথ্যা বা প্রতারণা-মূলক দলীল স্বীকৃত বা রক্ষিত হওয়ার কল্পনাও হইতে পারে না। এই প্রকারের অসংখ্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হইতেছে। এই পুস্তকের শেষ ভাগে এই ধরণের আরও কয়েকটী সত্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যুক্তি তর্কের দিক দিয়া লক্ষ্য করিলেও এই সব ঘটনাকে উপেক্ষা বা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। আপাততঃ যুক্তি তর্কের দিকটা একটু আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইতে নিবৃত্ত হওয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইহলোক ও পরলোক।

ইহলোক ও পরলোকের কথা উত্থাপন হইলেই আমাদের মনে পরলোক নামক একটা সুদূরবর্তী দেশের ধারণা উপস্থিত হয়। ব্যবহারিক হিসাবে ধারণাটিকে আংশিক সত্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরলোককে কোন নির্দিষ্ট স্থান বলিয়া মনে করা সম্ভব হইবে না। দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা হইতে যথাসম্ভব নিবৃত্ত থাকার উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সুতরাং পরলোক জিনিষটা উপলব্ধি করার জন্য আস্ত আস্ত অগ্রসর হইতে হইবে। বিষয়টা অত্যন্ত জটিল। পরলোকে ঘর দরজা, দালান পাকা, মনুষ্য পশু আদি সবই আছে। বহুদূরেও পরলোক আছে আবার অতি নিকটেও আছে। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন অবাস্তব বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। সে আশঙ্কা বৃথা। গোটা পৃথিবীটা যে ধরণের বাস্তব জিনিষ, পরলোক তদপেক্ষা বেশী বাস্তব। চক্ষু বুজিলে পৃথিবীটা অবাস্তব হয়; আমরা পরলোকের চক্ষু বুজিয়া রহিয়াছি, কাজেই পরলোক আমাদের নিকট অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছে। একজন পরলোকগত ইংরেজ সেনাপতি মৃত্যুর পর তাঁহার পার্থিব জীবনের একজন বন্ধুর দেখা পাইয়া বলিয়াছিলেন

“বুঝিলাম আমি মরিয়াছি। আচ্ছা তবে আমি কোথায়? স্বর্গে কি নরকে? ইহা যদি স্বর্গ হইয়া থাকে তবে স্বর্গের তেমন কিছু বিশেষত্ব ত দেখা যাইতেছে না। আর যদি নরক হইয়া থাকে তবে নরকেই বা ভয় করিবার কি আছে?” প্রকৃত প্রস্তাবে পরলোকগত ব্যক্তির পক্ষে পরলোক অধিকতর বাস্তব জিনিষ। বেদান্ত-দর্শন ইহলোককে অবাস্তব বলিয়া সিদ্ধান্ত ও প্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন দার্শনিক আজ পর্য্যন্ত ঐ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহলোকের কোন জীবের নিকট পৃথিবীটা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইতেছে না। পক্ষান্তরে অত্যন্ত বাস্তব বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। যা হউক বাস্তব পৃথিবীর লোক আমরা, বাস্তব হিসাবেই পরলোক তত্ত্ব অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আমরা সাধারণতঃ যে যে পদার্থকে জড়-পদার্থ বলি তাহাদিগকে স্থূলতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে :— কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি পদার্থ আমাদের অনুভূতির ভিতরে আসে, যেমন সুখ, দুঃখ, স্নেহ, ভক্তি, শ্রীতি, ভালবাসা, চিন্তা, ভাবনা ইত্যাদি।

একটু অনুধাবনা করিলেই লক্ষ্য হইবে যে দৃশ্যমান জগতের সকল পদার্থেরই কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা আছে এবং ঐ তিনটি অবস্থা আমাদের অনুভূতির যোগ্য। জলের কঠিন অবস্থা বরফ, তরল অবস্থা জল, বায়বীয় অবস্থা বাষ্প। সোণার কঠিন অবস্থা সোণা, তরল অবস্থা গলান সোণা এবং বায়বীয় অবস্থা হয়

তখন যখন তরল অবস্থার উপরে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগে সোণা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়।

আমরা যে বস্তুর উপরি-উক্ত রূপ কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা মাত্র আছে বলিয়া মনে করি তাহার কারণ হইতেছে এই যে আমরা জড়-জগতের জড়-দেহধারী জীব, বিশেষতঃ জড়-ভাবে বিভাবিত হইয়া এক ভাবের জড় প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সূক্ষ্ম অবস্থা বুঝিবার বা অনুভব করিবার ক্ষমতা আমরা অর্জন করিতে পারি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুর এই তিন অবস্থা ছাড়াও সূক্ষ্মের দিকে আরও অনেক অবস্থা আছে যাহা আমাদের অনুভূতির ভিতরে আপাততঃ আসিতেছে না। বিশ্বাস না হইলেও আপাততঃ কেবল জানিয়া রাখুন যে বস্তুর ঐ তিন অবস্থা ছাড়া ভাব অবস্থা, গুণ অবস্থা, প্রকৃতি অবস্থা, তন্মাত্র অবস্থা ইত্যাদি অনেক অবস্থা আছে যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই স্থলে বিষয়টার বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া কথাটা যাহাতে নিতান্ত আজগবি বলিয়া মনে না হয় তজ্জন্ম দুই একটী ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতেছে। দিগদর্শন স্বরূপে ইহা অনুধাবণা করার সাহায্য করিতে পারে।

তেতুল শুকাইলে ইহার কঠিন অবস্থা হইল। জলে ভিজিলে কিম্বা তরল এসিডে পরিণত করিলে হইল ইহার তরল অবস্থা। আবার তেতুল পোড়াইয়া দিলেই বাষ্পীয় অবস্থা হইয়া আমাদের অনুভূতির বাহিরে চলিয়া গেল। এখন তেতুল এক ব্যক্তি খাইতেছে এবং অপর এক ব্যক্তি তাহা দেখা মাত্র তাহার জিহ্বা

জলসিক্ত হইয়া উঠিল। ভাবিয়া দেখুন তেতুলই হইতেছে তাহার জিহ্বা জলসিক্ত হওয়ার কারণ। কিন্তু তেতুলের কোন অবস্থা তাহার জিহ্বাকে অধিকার করিল? কঠিন অবস্থা নয়। তরল অবস্থা নয়। বায়বীয় অবস্থাও নয়, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তেতুলের ভাব অবস্থা হয় কি না চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন। তেতুল খাওয়া দেখিয়া লোকটার মনে দর্শন জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতুলের ভাব একটা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ঐ ভাবটা দ্বারা জিহ্বা আক্রান্ত হইলেই তেতুল ভাবিয়া জিহ্বা জলসিক্ত হইতে পারে।

উপরি-উক্ত প্রণালীতে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে জগতে যা কিছু বস্তু দেখা যাইতেছে সবই ভাবের অভিব্যক্তি। প্রভাতী রাগিনী গাহিয়া প্রভাতের ভাব সৃষ্টি করিতে পারিলে গভীর রাত্ৰিকেও প্রভাত মনে করিয়া পাখীরা কলরব করিয়া উঠে। মেঘমল্লার রাগিনী ভালরূপ গাহিতে পারিলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বর্ষণ পর্য্যন্ত হয়। তাহা অবিশ্বাস করার হেতু নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পদার্থের আর একটা অবস্থা আছে যাহাকে ভাব অবস্থা বলা যায়, সেইটা অতি সূক্ষ্মাবস্থা এবং অবস্থাটা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বাস্তব অবস্থা।

প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তু মাত্রেরই আরও কতকগুলি সূক্ষ্ম ও বল-শালী অবস্থা আছে। তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে। এখন চলুন আমরা জড়-জগৎ সম্বন্ধে একটু অনুধাবনা করি

জড়-বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক বস্তুই ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম নামাকরনীয় পঞ্চ মহাভূতের একত্র সমাবেশ মাত্র। এই ভূতগুলি আবার স্ভাবিক অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরা যায় না, কারণ ইহারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু। পঞ্চভূত একত্রিত হইলে স্থূল আকার ধারণ করে। সেইজন্য স্থূল জগতে ইহারা পঞ্চীকৃত অবস্থায় বিद्यমান। আমরা যে মাটিকে ক্ষিতি বলি তাহা আসলে ক্ষিতি নয়। পঞ্চভূতের মিশ্রিত অবস্থা—তাহাতে ক্ষিতি ভূতের প্রাবল্য। সেইরূপ জলেতে অপের প্রাবল্য, অগ্নিতে তেজের, বায়ুতে মরুতের এবং আকাশে ব্যোমের প্রাবল্য বর্তমান রহিয়াছে।

এই ভূতগুলির আবার পৃথক পৃথক গুণ আছে। যেমন ক্ষিতির গুণ গন্ধ, অপের গুণ রস, তেজের গুণ রূপ, মরুতের গুণ স্পর্শ, ব্যোমের গুণ শব্দ। এই সব ব্যাপার জড়-বিজ্ঞান মতে সত্য এবং একটু অনুধাবনা করিলেই ইহাদের সত্যতা উপলব্ধি হয়।

এখন চলুন আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে একটু চিন্তা করি। পৃথিবী একটা মাটির গোলক মাত্র। মহাশূন্য আকাশে ভাসিয়া আছে। মাটি হইতেছে পঞ্চীকৃত ক্ষিতি। তাহার উপরের আবরণটা হইতেছে জল অর্থাৎ পঞ্চীকৃত অপ। ইহা দৃষ্টতঃই ক্ষিতি হইতে সূক্ষ্ম ভূত। কঠিন অবস্থার উপরের আবরণটা হইল তরল অবস্থা। জলের উপরের আবরণটি বায়ুর আবরণ নয় কি? পৃথিবীর উপরে নীচে পার্শ্বে সব দিকে বায়ু মহাসাগর

দ্বারা আবৃত। এই আবরণটি জলের আবরণ হইতেও সূক্ষ্ম।

তাহার উপরের আবরণ হইতেছে আকাশ। ইহা বায়ু হইতেও অনেক সূক্ষ্ম।

আকাশ অবধি উপরে অনন্ত, নীচে অনন্ত, ডানে অনন্ত, বামে অনন্ত। কিসের আবরণ তাহা আমরা জানি না, জড়-বিজ্ঞান জানে না, মহর্ষিগণ জ্ঞানবলে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, বলিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক আকাশ পর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু জানি তাহারই আরও একটু চিন্তা করা যাউক। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ভূতগুলি সর্বত্রই মিশ্রিত অবস্থায় আছে। কাজেই পঞ্চ মহাভূত হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম আরও ভূত যদি থাকিয়া থাকে তবে তাহারাও পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে মিলিত থাকাই সম্ভব।

এখন বিবেচ্য হইতেছে এই যে বায়ু হইতে সূক্ষ্ম বোম অর্থাৎ আকাশ পর্য্যন্ত বলিয়া, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কোন কিছুর সন্ধান না পাওয়ায় আমরা আকাশ অবধি সূক্ষ্মের দিকট। সম্পূর্ণই আকাশ নামে অভিহিত করিতেছি। প্রকৃত প্রস্তাবে আকাশ হইতে সূক্ষ্ম আরও ভূত রহিয়া গিয়াছে। সেগুলিও পঞ্চ মহাভূতের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে মেলামেশা করিয়া আছে।

এস্থলে দুই একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক। জড়-বিজ্ঞান বলিতেছে যে আকাশের একটা অবস্থাকে ইংরেজীতে ইথার বলা হয়। সেই ইথারের পরমাণুর স্পন্দনে আলোকের

উৎপত্তি হয় তাহা সত্য। আবার জড়-বিজ্ঞান ইহাও বলিতেছে ইথারেরই অত্র এক অবস্থার পরমাণুর স্পন্দনে বিছাতের উৎপত্তি হয়। আলোক আর বিছাৎ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। তাহা যদি হইল—তবে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ইথার দুই রকম। ইথারও যদি দুই রকম হইল তবে আকাশ যে কত রকম থাকিতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। রঞ্জন রে, রেডিও, বেতার, সিনেমা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের আকাশের বাপার আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন আর সব আকাশকে এক রকম বলা যাইতে পারে না। মহাভারতেও আমরা অন্ততঃ পঞ্চাশ রকম আকাশের তালিকা এবং ঊনপঞ্চাশ রকম বায়ুর তালিকা পাইয়া থাকি। গাঢ় ও পাতল হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম জল ও বায়ুর অস্তিত্ব আমরা সহজ বুদ্ধিতেই ধরিতে পারিতেছি। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্থূল সূক্ষ্ম হিসাবে আকাশও অনেক রকম আছে। বস্তু মাত্রেরই যখন স্থূল হইতে ক্রমশঃ পাতল বা সূক্ষ্ম হইতে পারিতেছে তখন সূক্ষ্মের দিকে বস্তুর গতি অনন্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রম যেমন যতদূর ইচ্ছা বাড়ান যাইতে পারে সেইরূপ মহাভূতের ক্রমও অনন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা হইলে আৰ্য্য ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যার বলে মহাভূতের যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্রম বা ডাইলিউসন নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তাহাকেও আমাদের বিবেচনার বাহিরে রাখা সঙ্গত হইবে না। তাঁহারা বলেন পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম

অবস্থা পঞ্চ তন্মাত্র। এই তন্মাত্রকে অধিকতর সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত করিলেই অহঙ্কার তত্ত্ব হয়। অহঙ্কার তত্ত্বের সূক্ষ্মাবস্থা প্রধান বা বুদ্ধিতত্ত্ব, তদোপরি প্রকৃতি বা স্বত্ব রজ তম গুণা-ত্রিকা আদ্যাশক্তি, তদুপরে অনন্ত—ভগবান—জগদীশ্বর—ব্রহ্ম।

এখন একবার দেখা যাউক সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যে কোনটা বাস্তব জিনিষ এবং কোনটা অবাস্তব। বাস্তব অবাস্তবের হিসাবটা আমাদের উল্টাদিক হইতে ধরিবার অধিকার নাই। আসল বাস্তব হইতেছে উপরের দিকে সূক্ষ্মের দিকে। মূলে সৃষ্টিকর্তা বাস্তব হইলেই তাহা হইতে উৎপন্ন যাহা কিছু সবই বাস্তব। তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তা হইতে প্রথম উৎপন্ন প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি হইতেছেন প্রধান বাস্তব জিনিষ এবং অসাধারণ শক্তিশালিনী। তদপেক্ষা নিম্নস্তরের বাস্তব জিনিষ প্রধান তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব। তন্মিলে অহঙ্কার তত্ত্ব। তন্মিলে পঞ্চ তন্মাত্র। তন্মিলে পঞ্চ মহাভূত এবং তন্মিলে সোনা রূপা লোহা পাথর গাছপালা ইত্যাদি। তবেই আমরা যে সব বস্তুকে বাস্তব জিনিষ বলি ঐ গুলি হইতেছে অতি নিম্নস্তরের বাস্তব জিনিষ। আসল বাস্তব জিনিষ রহিয়াছে সূক্ষ্মে।

বিষয়টা আরও বিশ্লেষণ করা যাউক। বাস্তবতার লক্ষণ হইতেছে শক্তি। আমরা সহজ জ্ঞানেই বুঝিতে পারি স্থূল হইতে সূক্ষ্মের শক্তি অধিক। স্থূল হস্তীর বল সূক্ষ্ম বাষ্পবলের নিকট পরাভূত; সূক্ষ্ম বায়ুর বলের নিকট স্থূল ধরণের পাথিব সমস্ত বল পরাজিত। বায়ু হইতে সূক্ষ্ম আকাশ বা ইথার হইতে

উৎপন্ন বজ্রের নিকট বায়ুর বলও নগণ্য। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রম বাড়াইয়া যতই সূক্ষ্ম করা যায় ততই ইহার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শক্তির মাপেও স্থূল হইতে সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ।

প্রাণী-জগতের প্রতি লক্ষ্য করিতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর সৃষ্ট স্থান মাত্রেই প্রাণী সমাকীর্ণ। জলে প্রাণী—স্থলে প্রাণী, বায়ুতে প্রাণী—আকাশে প্রাণী। তাহার উপরে আমরা কিছু দেখি না। কিন্তু এই অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে জগতের যে অংশ আমাদের অদৃশ্য তাহাও প্রাণীময়—অদৃশ্য প্রাণী। আবার কতগুলি অদৃশ্য প্রাণী আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিতেও পাই। এ অবস্থায় আর্য্য ঋষির কথিত “অন্তরীক্ষ চরা ঘোরা কুস্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ” ইত্যাদি প্রাণীগণের কথা আমরা কিরূপে উপেক্ষা করিতে পারি?

শুধু কি তাই? স্থূল ভূতবাসী প্রাণী হইতে সূক্ষ্ম ভূতবাসী প্রাণী নানা প্রকারে শ্রেষ্ঠ নয় কি? ভূগর্ভবাসী প্রাণী অপেক্ষা জলচর প্রাণী অনেক উন্নত। আবার জলচর প্রাণী হইতে বায়ুচর প্রাণী (মনুষ্য পশু আদি) অনেক উন্নত। তাহা হইলে বায়ুর প্রাণী হইতে আকাশের প্রাণী উন্নত হইবে। আকাশের প্রাণী হইতে ইথারের প্রাণী এবং ক্রমাগত পরলোকবাসী প্রাণী অধিকতর উন্নত হইবে। ঋষি-শাস্ত্রে পাওয়া যায় ভুলোকের জীব হইতে ভুবলোকের জীব উন্নত। স্বর্গলোকের জীব তদপেক্ষা উন্নত। মহা, জন, তপ ও সত্য লোকের জীব ক্রমশঃই

আরও উন্নত। কথাগুলি ভাবিবার বিষয়, উপেক্ষা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

জড়-বিজ্ঞান ইথার স্তরের উদ্ভেদ অবস্থিত অসংখ্য স্তরোপ-যোগী স্থানে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া তদুদ্ভিস্থিত প্রচণ্ড দীপ্তিশালী সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। সূর্য্য বহু দূরবর্তী হইলেও আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর। জড়-বিজ্ঞান ইথার এবং ইহার কিরণ রশ্মির বিষয়ে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা আদি করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। সূর্য্যদেবের বরণা ভণ্ডাই যে দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির মূল উপাদান তাহা জড়-বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। ডক্টার বোসের (শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু) ‘অব্যক্ত’ নামক বাংলা পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন যে একটি বৃহদাকার কাষ্ঠখণ্ড বেশীপক্ষে ৩৪ হাজার বৎসরের সঞ্চিত একীভূত সূর্য্যরশ্মি মাত্র। “আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ” কথাটী কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবের প্রলাপ উক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল কিন্তু বর্তমানে শুধু সূর্য্য কিরণ দ্বারা চিকিৎসা করা উপলক্ষে সুসভ্য ইউরোপ মহাদেশে প্রতি বৎসর অজস্র অর্থ ব্যয় করা হইতেছে এবং এই চিকিৎসা প্রণালীও সাফল্য লাভ করিয়াছে।

জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সহজ জ্ঞানসম্পন্ন মানবের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষিত সত্য সন্দেহ নাই কিন্তু এই জড়-বিজ্ঞানের আশ্রয়ে সূক্ষ্মের দিকে আজ পর্য্যন্ত অতি

অল্প দূরই অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। তথাপি ইহা দ্বারা যতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তদ্বারাই আবার জড়-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত সুবিশাল অব্যাক্ত রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রমাণ-স্বরূপ জড়-বিজ্ঞানের দুই একটা পরীক্ষিত সত্যের উল্লেখ করা যাইতেছে।

জড়-বিজ্ঞানের কঠোর প্রচেষ্টায় বর্তমানে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে যে বায়ু পরমাণুর স্পন্দনে সর্বত্রই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। বায়ু সর্বদা সর্বত্র চঞ্চল। ইহার স্পন্দনের নিরন্তরতা নাই, কাজেই ধ্বনিও অনবরতই চলিতেছে। তবে স্পন্দনের ক্ষিপ্ততা ও শিথিলতার অনুপাতে ধ্বনির উচ্চতা ও ক্ষীণতা হয়। এই ধ্বনির সর্বোচ্চ স্তর ও সর্বনিম্ন স্তর উভয়ই অসীমে মিশিয়া গিয়াছে। এই সুবিশাল ধ্বনিরাজ্যের অতি অল্প অংশই মানুষের উপভোগ্য। মানুষ নিম্নস্তরের ধ্বনি শুনিতে পায় না ক্ষীণ বলিয়া, এবং উচ্চ স্তরের ধ্বনি শুনিতে পায় না তীব্র বলিয়া। ধ্বনিরাজ্যের মধ্যভাগস্থিত যে অংশে মানুষের অধিকার রহিয়াছে তাহা অতি ক্ষুদ্র অংশ।

আলোক রাজ্যেও মানুষের ঠিক একই প্রকারের দুর্গতি। ইহারের স্পন্দনে আলোকের উৎপত্তি হয়। স্পন্দনের ক্ষিপ্ততার তারতম্যে আলোকেরও প্রখরতার তারতম্য হয়। ধ্বনি বা শব্দ-রাজ্যের ন্যায় আলোক-রাজ্যেরও মধ্যভাগের অতি সামান্য অংশ মাত্র মানুষের দৃষ্টিগোচর। অবশিষ্ট আলোকে মানুষ অন্ধ।

ঔষধ-রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় জগদীশ্বরের সৃষ্টি

ভ্রাণ-সম্পদের অতি ক্ষুদ্র অংশেই মানুষের অধিকার রহিয়াছে। ভ্রাণ উপভোগ বিষয়ে মানুষ পশু হইতেও বহুগুণে নিকৃষ্ট।

রসনার স্বাদ গ্রহণ ব্যাপারেও ঠিক একই কথা। জগদীশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে বহু প্রকারের সুস্বাদ রহিয়াছে। তাহার অতি সামান্য অংশই মানুষের জিহ্বায় উপলব্ধি হয়। কুকুর বিড়াল মাছের কাটাতে কি স্বাদ পায় তাহা হাতী ঘোড়া কিম্বা গরুতে বুঝিবে না, আবার হাতী ঘোড়া আদি ঘাস খাইয়া কি স্বাদ পায় তাহা মানুষের বুঝিবার বিষয় নহে। তবে পশুগুলির খাওয়ার স্পৃহা ও আনন্দের ভাব দেখিয়া মনে হয় যে ইহাদের জিহ্বায় যে পরিমাণ স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা রহিয়াছে মানুষের যেন তাহা নাই।

আনন্দ উপভোগ ব্যাপারেও মানুষ পশু হইতে অনেক খাট। প্রস্তুতি ফুলের গন্ধে কীটগুলি কি আনন্দ পায়, ডমরুর রবে সাপের কি আনন্দ, কি আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া পতঙ্গগুলি জ্বলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জন করে তাহা মানুষে বুঝিবে না।

আবার এমন কতকগুলি উপভোগ্য বিষয়ের অস্তিত্ব থাকার আভাস পাওয়া যায় যাহা উপভোগ করার জন্য মানবের কোন ইন্দ্রিয় নাই। পরস্পরের মধোমনোভাব আদান প্রদান করা যায় এমত কোন ইন্দ্রিয় মানুষের নাই। মানুষ বুদ্ধিবলে ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহার সাহায্যে মনোভাবের অর্ধেক পরিমাণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছে। অবশিষ্ট মনোভাবগুলি অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইতেছে। জন্মান্ত ও জন্মবধির যেমন দেখাশুনা কি

বস্তু তাহা ধারণাই করিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মানুষও সেইরূপ কোন ধারণা করিতেই অসমর্থ।

এই সকল অবস্থা চিন্তা করিলে মনে স্বতঃই ধারণা হয় যে আমরা জড়দেহ ধারণ করার দরুণ উন্মুক্ত বিশাল বিশ্বরাজ্য মধ্যে রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। রজ্জুর দৈর্ঘ্য যতটা অনুমোদন করে তদতিরিক্ত স্থানে বিচরণ করার অধিকার নাই। সহজজ্ঞান সম্পন্ন মানব তাহার পঞ্চদশ ইন্দ্রিয় এবং মনকে সম্বল করিয়া ইহাদের সাহায্যে বিশ্বের যতটুকু জানিতে পারে তাহার অতিরিক্ত অগণিত জিনিষ বিশ্বরাজ্যে বর্তমান রহিয়াছে। মানুষ কেন বুঝিয়াও বুঝে না—“দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে-সমত্বাকৃষ্ট মানস” কেন হয়, এই প্রশ্ন মহারাজ শুরথ “ব্রহ্মবিভাংধর” মহর্ষি মেধসুকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

জ্ঞানীনঃ মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলং ।

তথাহি জ্ঞানীনঃ সর্ব্ব পশুপক্ষী মৃগাদয়ঃ ॥

মানুষের জ্ঞান আছে বটে কিন্তু ইহা খণ্ডজ্ঞান মাত্র। এই ধরনের খণ্ডজ্ঞান পশুপক্ষী মৃগাদিরও আছে। তদ্বারা সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান নিঃশেষে লাভ করার সম্ভাবনা নাই।

মানুষের উপরি-উক্তরূপ ছরবস্থা বর্ণন নিরুৎসাহ করার উদ্দেশ্যে নহে এবং বাস্তবিক নিরুৎসাহের কোন কারণও বর্তমান নাই। মানুষ তাহার জড়দেহের সাহায্যে যতটা দেখে, শুনে বা অনুভব করে, তাহাই যে সম্পূর্ণ সৃষ্টি নয় এবং তদতিরিক্ত অনেক লোভনীয় জিনিষ যে মানুষের ধারণাভীত রহিয়া গিয়াছে তাহা

প্রচার করা এবং অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য প্রবুদ্ধ করাই এই সকল বর্ণনের অভিপ্রায়। কারণ মানুষ ভগবানেরই অংশ—অমৃতের সন্তান। নিজ কর্মদোষে পাশাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাশমুক্ত হইতে পারিলেই সমস্ত অজ্ঞানতা দূর হইয়া অখণ্ড পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইবে। তখন দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া অর্জুন যেমন দেবাদিদেবের শরীরে “ইহেকস্মৎ জগৎ-কৃৎস্মন্ প্রবিভক্তমনেকধা” দেখিয়াছিলেন সেইরূপ সম্পূর্ণ জ্ঞান রাজ্যের অধিকারী হইবে—জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

সংসারী লোকের মধ্যে অনেকেই আপাতমনোমুগ্ধকর ও পরিণামে চিত্তবিভ্রমকারী বিষয় বাসনায় বিজড়িত হইয়া নিজ-দিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখেন, তাঁহাদের মনে আত্মজ্ঞান লাভ করার আকাঙ্ক্ষাই জাগ্রত হয় না। অনেকে আবার নিজদিগকে ঐ বিষয়ে অগ্গম মনে করিয়া ঐ বিষয়ের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হন এবং গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাইয়া দিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান মানবের পক্ষে এ ভাবে অমূল্য জীবনটিকে অপব্যয়িত করা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমরা জাজ্জল্যমান জীবিত আছি জানি। সুখের সংসার করিতেছি জানি। এই সংসার অবিলম্বেই চলিয়া যাইতেছে জানি। দেহত্যাগ অবশ্যস্বাবী ও নিকটবর্তী তাহাও জানি, অথচ দেহত্যাগের পরবর্তী অবস্থাটা কি তাহা না জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কি ?

কঠোর সংকল্প এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা প্রাচীন যুগের ঋষিগণ আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে

আমরা অতি মাত্রায় বিষয়াসক্ত হওয়ায় সেই পন্থা অবলম্বন করা দূরে থাকুক সেই পথের সন্ধান লওয়ারও অবকাশ পাই না। বর্তমান জগতের ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকানগণ মনুষ্যত্ব-শালী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই এখন ঋষি-প্রবর্তিত দুজ্জৈয়রাজ্যাভিমুখী পন্থাসমূহ ব্যবহৃত ও সার্থক হইতেছে।

আমাদের ভিতরে মহাজ্ঞানের যে ক্ষীণ রশ্মিটুকু রহিয়াছে তদ্বারা কি বৃদ্ধিতে পারি না যে বিশ্বনাথ আমাদের ভিতরে রহিয়াছেন? আমরা যে চোখে দেখি, কাণে শুনি, তাহা কি আমাদের নিজ ক্ষমতায়? ভুক্ত দ্রব্যসমূহ কি আমাদের নিজ শক্তিতে হজম হয়? তবে আমরা এতটা অক্ষম, এতটা দুর্বল, এতটা বিপন্ন কেন? শুধু মনটিকে সংযত করতঃ আত্মশাসনাধীনে রাখিতে পারিলেই অন্য সব আপনা হইতেই হইয়া যায়, যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই আঙ্গাবহ। অবশ্য মনকে সংযত করা সহজ সাধ্য নয়, কিন্তু কষ্ট করিয়া করিয়া উঠিতে পারিলে যাহা লাভ করা যায়, সমাগরা ধরণীর একচ্ছত্র রাজত্বও তাহার কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর। “যং লব্ধ্বাপরং লাভমন্যতে নাথিকং ততঃ।” প্রাচীন ঋষিগণ তাহা কিরূপে করিতেন লক্ষ্য করুন। তাঁহারা প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করতঃ আহার নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে সংযম অভ্যাস করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস-যোগ দ্বারা অমানস (প্লাঘা রাহিত্য), অদম্বিত (দম্ব রাহিত্য), অহিংসা (পর পীড়া বর্জন), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্ষ্যব (সরলতা), আচার্য্যোপাসনা (গুরু সেবা), শৌচ (পবিত্রতা), স্নৈর্য্য (সংসার্য্যে দৃঢ়তা),

আত্মবিনিগ্রহ (আত্ম সংযম), ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য), অনহঙ্কার (নিরহঙ্কারিতা), জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন (জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা), অসক্তি (বিষয়ে অনাসক্তি), পুত্রদারগ্রহাদিতে অনভিষঙ্গ (স্ত্রীপুত্রগ্রহাদিতে মমত্বের অভাব), ইষ্টানিষ্ট উপপত্তিতে নিতা সমচিত্তত্ব (ভাল মন্দ যখন যাহা উপস্থিত হয় তাহাতে চিন্তের অবস্থা ঠিক এক রকম রাখা), জগদীশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিধ দেশসেবীত্ব (নির্জ্ঞান স্থানে বাস), জনসংসদে অরতি (জন কোলাহলে থাকার অনিচ্ছা), তত্ত্বজ্ঞান লাভের অমুসন্ধান ইত্যাদি মহদগুণরাজির অনুশীলন করিতেন। তৎপর,

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 নাত্যাচ্ছিতং নাতিনীচম্ চৈলাজিন কুশোন্তরম ॥
 তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ ।
 উপবিস্তাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাত্ম বিশুদ্ধয়ে ॥
 সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
 সংপ্রক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্ং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
 যুগ্মেন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
 শান্তি নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥

ভারতীয় যোগী ঋষিদিগের প্রচেষ্টার অতি সামান্য একটা নমুনা এখানে দেওয়া হইল। এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য যে জাতিগত ভাবেই হউক বা ব্যক্তিগত ভাবেই হউক যে যে বিষয়ের জন্য ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করে সে সেই বিষয়ে

অন্যাপেক্ষা অধিকতর অভিভূত হয়। পাশ্চাত্য ঋষিগণ ঐকান্তিকভাবে জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা করেন। কাজেই জড়-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের মত অল্প সকলের মতের অগ্রগণ্য। অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কোন্ জাতি বা কোন্ কোন্ ব্যক্তি অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন এবং সেই চেষ্টার সফলতা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল তাহা অবধারণ করার জন্য জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুন, পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য দর্শনাদি অনুসন্ধান করুন, অতি প্রাচীন কালের প্রস্তরলিপি, তাম্রলিপি আদির বিবরণ সংগ্রহ করুন, অতি দুর্গম পর্ব্বত গুহাসমূহ পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করুন, দেখিতে পাইবেন যে অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা ব্যাপারে ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণই অল্প সকলের অগ্রগণ্য। সেই ঋষি শব্দ বাচ্য লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে এবং তাঁহারা সকলে ঠিক এক সময়ে প্রাচুর্ভূত হন নাই। তাঁহাদের অবলম্বিত সাধন প্রণালীও সকলের এক রকম নহে। নানা বিষয়ে তাঁহাদের মতের অনৈক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরলোক ও জন্মান্তর সম্বন্ধে তাঁহাদের সকলেরই একমত। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণের ভিন্ন ভিন্ন শতাধিক উপনিষদ গ্রন্থের সার গ্রহণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন :—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা

শৃঙ্খানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

[জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে ঠিক সেইরূপ দেহীগণ জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে মাত্র ।]

ঋষি-শাস্ত্র আলোচনা করিলে স্বভাবতঃ এই ধারণা জন্মে যে ইহলোক ও পরলোক পরস্পর পৃথক বস্তু নহে, পক্ষান্তরে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র । একই বস্তুর যেমন কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা আছে এবং সেই অবস্থাগুলি একটী হইতে আর একটী সূক্ষ্ম এবং ক্রমশঃই অধিকতর সূক্ষ্ম, সেইরূপ ভূ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সাতটী বিভাগে জড় জগৎ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থানকে বিভক্ত কল্পনা করা হইয়াছে । কল্পনা বলাতে কোনরূপ অবাস্তবতার সন্দেহ করার হেতু নাই । পার্শ্বের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে

খ

সত্য
তপ
জন
মহ
স্ব
ভুব
ভূ

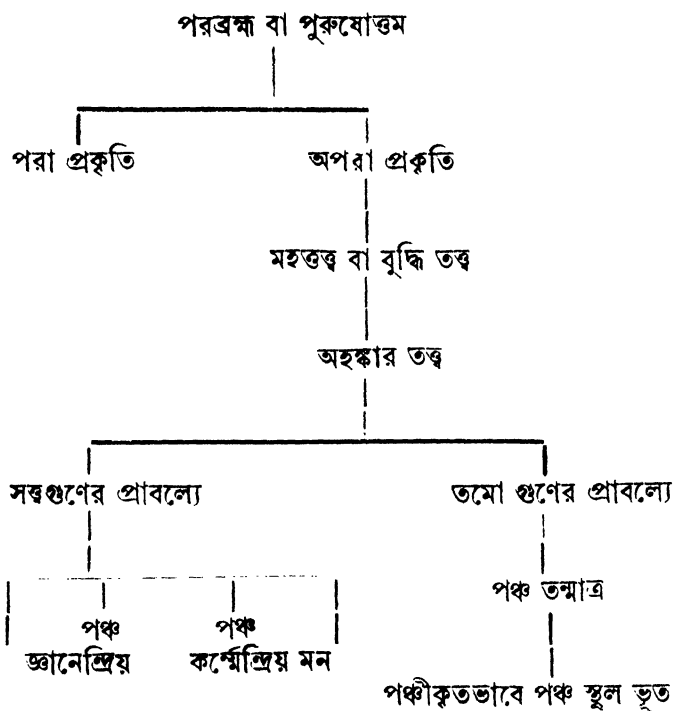
ক হইতে খ পর্য্যন্ত স্থানকে ৭ ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে ! সূক্ষ্মত্বের তারতম্য অনুসারে এই বিভাগ । ইচ্ছা করিলে এই স্থানকে ১৪ ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে । বস্তুতঃ কেহ কেহ তাহা করিয়াওছেন । যেমন প্রেতলোক, ক

পিতৃলোক, যমলোক, চন্দ্রলোক, সূর্যালোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, ধ্রুবলোক ইত্যাদি। ঐ সবই ভুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত স্থানের অন্তর্গত। ঐ সকল বিভাগের স্বভাবতঃ কোন নাম থাকিতে পারে না। বুঝাইবার সুবিধার জন্ত ঋষিগণ ঐ সাত ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সাতটি নাম দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের পরমাণু স্বভাবতঃই ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও প্রকৃতি বিশিষ্ট। ভুলোকের পরমাণু হইতে ভুবলোকের পরমাণু অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। এইরূপ ক্রমশঃ অধিকতর সূক্ষ্ম। আবার ভুলোকের উর্দ্ধস্তরের সঙ্গে ভুবলোকের নিম্ন স্তরের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এইরূপ সর্বত্র।

ভুলোকে প্রধানতঃ ভুলোকের পরমাণু রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে উপরিস্থ সমস্ত লোকের পরমাণুই মিশ্রিত রহিয়াছে। ভুবলোকে ভুবলোকের পরমাণু এবং তদুর্দ্ধ-স্থিত অপর পাঁচটি লোকের পরমাণু মিশ্রিত রহিয়াছে। ভুলোকের সংলগ্ন বিধায় তাহাতে ভুলোকেরও গন্ধমাত্র বর্ত্তমান আছে। ক্রমশঃ উর্দ্ধ লোকের অবস্থা এইরূপ।

ঋষি-শাস্ত্রানুযায়ী জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে জগদীশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন না বলিয়া জগদীশ্বর জগৎ হইয়াছেন বলাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পরমহংসদেব সোজা কথায় বলিতেন “তিনিই সব হইয়াছেন।” কেহ কিছু করিয়াছে বলিলে আমাদের মনে স্বভাবতঃ এই ধারণা হয় যে কর্ত্তা এক জন আছেন, কোন একটা বস্তু করা হইয়াছে, কোন

যন্ত্র দ্বারা বা হস্তপদাদি দ্বারা করা হইয়াছে, কতকগুলি উপাদান ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে করা হইয়াছে, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া করা হইয়াছে এবং করিয়া জিনিষটাকে কোন স্থানে রাখা হইয়াছে। বাস্তবিক সৃষ্টি ব্যাপারে ঐ ধরনের চিন্তার কোন স্থান নাই। তিনি সর্বতঃ পাণিপাদ, সর্বতো-ক্ষিরোমুখ, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ, সব বাপিয়াই নিজে। সবই তিনি। অতিরিক্ত কিছুই নাই। কোথায় যন্ত্র, কোথায় উপাদান, কোথায় জিনিষ, কোথায় সময় এবং কোথায়ই বা রাখিবার স্থান। তিনি তিনিই। তাঁহার কোন নাম নাই, রূপ নাই, বাড়ী নাই, ঘর নাই, জিনিষ নাই, পত্র নাই, নাই বলিতে কিছুই নাই! বম্ ভোলানাথ! স্থূল দৃষ্টিতে যেমন দেখা যায় যে বাতাস হইতে জলের উৎপত্তি হইয়া বৃষ্টি হইতেছে সেইরূপ একমাত্র তাঁহার অস্তিত্ব হইতেই সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ জগতের অস্তিত্ব হইয়াছে। হওয়ার ক্রমটী যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল :—



পরা প্রকৃতি = অখণ্ড জীব চৈতন্য ।

অপরা প্রকৃতি = সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা ।

বুদ্ধি তত্ত্ব = (ভাব বস্তু) স্বয়ং অখণ্ড সমগ্রবুদ্ধি । (ব্যক্তিত্ব ছাড়া) ।

অহঙ্কার তত্ত্ব = (ভাব বস্তু) আমিহ অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের ভাব ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় = (সূক্ষ্ম ভাবে) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও হৃক ।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় = (সূক্ষ্ম ভাবে) বাক্, পাণি, পাদ, বায়ু ও উপস্থ ।

পঞ্চ তন্মাত্র = (সূক্ষ্ম বস্তু) রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র ও শব্দ তন্মাত্র ।

পঞ্চ মহাত্ম = (স্থূল পদার্থ) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং বোম ।

লক্ষ্য করা আবশ্যিক যে উপরি-উক্ত সৃষ্টিক্রম অনুযায়ী (১) পরা প্রকৃতি, (২) অপরা প্রকৃতি, (৩) মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, (৪) অহঙ্কার তত্ত্ব, (৫) মন, (৬) বাক্, (৭) পাণি, (৮) পাদ, (৯) বায়ু, (১০) উপস্থ, (১১) চক্ষু, (১২) কর্ণ, (১৩) নাসিকা, (১৪) জিহ্বা, (১৫) ত্বক্, (১৬) শব্দ, (১৭) রূপ, (১৮) রস, (১৯) গন্ধ, (২০) স্পর্শ, (২১) ক্ষিতি, (২২) অপ (২৩) তেজ, (২৪) মরুৎ এবং (২৫) বোম এই পঁচিশটি ভাবকে তত্ত্ব বলা হয়। তৎ + ত্ব = তত্ত্ব—তঁহার ভাব। তিনিই ঐ সকল ভাব ধারণ করিয়াছেন ।

নির্মল আকাশে সহসা এক খণ্ড সাদা মেঘের উৎপত্তি হইল। দেখিতে দোষেতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া কাল রং ধারণ করিল। বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল, ঘোরতর ঝড় বহিতে লাগিল। অপর্ধ্যাপ্ত বর্ষণ ও শিলাপাত হইল। তার পর আবার আকাশ পরিষ্কার। দিক্‌দর্শন স্বরূপে ইহার সঙ্গে সৃষ্টি ও লয় ব্যাপারের তুলনা করা যাইতে পারে ।

নিরাকার, নিগুণ, নির্বিকার পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় অবস্থায়

আছেন ; এ অবস্থায় সহসা তাহাতে বিকার উপস্থিত হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের বীজ উৎপন্ন হইয়া ওতপ্রোতভাবে সাম্যাবস্থায় থাকে। তিনি শক্তিস্বরূপা এবং সকলের আদি, তজ্জগৎই তাঁহাকে আদ্যাশক্তি বলা যায়। তিনিই তত্ত্ব হিসাবে অপরা প্রকৃতি।

পরব্রহ্মের পরা প্রকৃতিকে সাক্ষা দর্শনে পুরুষ বলা হইয়াছে। তাহা জীব-চৈতন্য মাত্র। নিরাকার, নির্বিকার ও নিগুণ।

সত্ত্ব গুণের ভাব নিম্নলিখিত, প্রকাশ। রজোগুণের ভাব উৎসাহ, চাঞ্চল্য ও কল্পতৎপরতা। তমোগুণের ভাব মোহ, আলস্য, জড়তা ইত্যাদি।

মূল পরব্রহ্ম (ওঁ তৎসৎ পদবাচ্যে) নিগুণ বিধায় সুখ, দুঃখ, নিন্দা স্তুতির বহির্ভূত। তাঁহার সন্তোষ অসন্তোষ নাই। কাজেই সেই ব্রহ্মভাব অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়। তাঁহাকে উপাসনা করার উপায়ও নাই সার্থকতাও নাই। তাঁহাকে ধারণা করা অর্থাৎ মনে উপলব্ধি করা জীবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কারণ সেই ভাবে (ব্রহ্মভাবে) পৌছাইতে পারিলে জীব মুক্ত হইয়া যায়।

পরব্রহ্মের অখণ্ড পরা প্রকৃতি অর্থাৎ জীব-চৈতন্য হইতে ছোট বড় নানা প্রকারের ফুলিঙ্গবৎ খণ্ডাংশ বাহির হইয়া অবশিষ্ট ২৪টা তত্ত্বের প্রত্যেকটির খণ্ডাংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া খেলা করে। তাহাতেই জীব জগতের উৎপত্তি।

পঁচিশটি তত্ত্ব সহ অসীম অনন্ত পরব্রহ্মে ভিন্ন ভিন্ন রকমের

অগণিত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক জগতে অসংখ্য একটা করিয়া সূর্য্য আছে সেই সকল সূর্য্যের সংখ্যা অসংখ্য কোটি। প্রত্যেক সূর্য্যের এলেকাধীন আবার অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র আছে। ভাবিতে গেলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

ওঁতৎসৎ পদবাচ্য পরব্রহ্ম বা জগদীশ্বর প্রকৃতি ভাব গ্রহণ করিলেই সগুণ ও ক্রিয়াশীল হন। সগুণ হইলেই সুখ, দুঃখ, সন্তোষ, অসন্তোষের অধীন হয়, কারণ ঐ সব সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের ক্রিয়া। প্রকৃতি মূলতঃ এক হইলেও দুই বিভাগে উৎপন্ন বলিয়া দ্বিহ আরাপিত হইয়াছে। পরা প্রকৃতিতে চৈতন্য আছে কিন্তু গুণ না থাকায় স্বয়ং প্রকাশিত হইতে পারে না। যেহেতু সত্ত্ব গুণ ভিন্ন প্রকাশক আর কিছু নাই। অপরা প্রকৃতিতে গুণ আছে কিন্তু চৈতন্য নাই। কাযেই ইহা একা প্রকাশিত হইতে হইলে অচৈতন্য ভাবে হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা একা থাকে না। উভয় প্রকৃতি মূলতঃ একই। সৃষ্টিতে যা কিছু ব্যক্ত হয় অর্থাৎ ব্যক্তির প্রাপ্ত হয়, সবই এই দুই প্রকৃতি সংযোগে হইয়া থাকে।

সমগ্র ভাবে পরা ও অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব গুণের প্রাবল্যে বিষ্ণু, রজগুণের প্রাবল্যে ব্রহ্মা এবং তমোগুণের প্রাবল্যে রুদ্র। অপরা প্রকৃতির শক্তিতে তাঁহারা শক্তিমান। তাঁহাদের শক্তির পার্থক্যের অনুভূতির যথাক্রমে বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী নামকরণ হইয়াছে। মূলতঃ এক প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হয়। কাযেই মূলতঃ

তঁাহারা এক বস্তু। প্রকৃতির অপর নাম অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার ও অপ্রকাশ। তজ্জন্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের স্থূলদেহধারীগণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। আবার সমস্ত আকারের বীজ, ইন্দ্রিয়ের বীজ, অহঙ্কারের বীজ ও বুদ্ধির বীজ প্রকৃতিতে আছে বলিয়া তঁাহারা আবশ্যকমত সকল রূপই ধরিতে পারেন। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ব্যাপারে অনুক্ষণ কাজ করা আবশ্যক বলিয়া তঁাহাদের কার্যাকরী শক্তিসমূহের কেন্দ্র করিয়াছেন সূর্য্যমণ্ডলকে। ইহারা পরব্রহ্মের অত্যন্ত নিকটবর্তী ভাবরাজ্যের জীব, কাজেই ইহাদের স্বাভাবিক বাসস্থান সৃষ্টির সর্বোচ্চ লোকের নিকটবর্তী। ইহাদের মধ্যে সর্বলোকের বীজ রহিয়াছে বলিয়া যে কোন ভাবে যে কোন লোকে বর্তমান থাকিবার কোন বাধা নাই। ইহারা মূল শক্তির প্রতীক বলিয়া তুষ্ট হইলে সবই করিতে পারেন।

প্রকৃতি হইতে আর একটু স্থূল অবস্থাকে মহত্ত্ব, প্রধান তত্ত্ব বা বুদ্ধি তত্ত্ব নাম দেওয়া হইয়াছে। সেইটা অখণ্ড বুদ্ধির ভাব। কোন ব্যক্তিত্বের অপেক্ষা রাখে না। তাহাতে পরা ও অপরা প্রকৃতি থাকায় ক্রিয়াশীল ও সজীব।

বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে এক সিড়ি নিম্নের অপেক্ষাকৃত স্থূলভাব হইতেছে অহঙ্কার তত্ত্ব—আমি আমি ভাব। এই সিড়িতে ব্যক্তিত্বের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

ব্যক্তিত্বের ভাবটা জাগ্রত হইলেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূতের প্রয়োজন

আপনা হইতে আসে। অতএব দেখা যাইতেছে যে অতি সূক্ষ্ম ও অনির্বচনীয় ব্রহ্ম হইতে ভাবরাজ্য সমুদ্ভূত হয় এবং সেই ভাবই ক্রমশঃ স্থূল হইতে হইতে লৌহ প্রস্তরাদি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে কোন একটি ভাব যদি উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধির সুযোগ পায় তবে ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়া প্রবল হইতে হইতে পরিণামে গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়।

আলোচ্য বিষয় হইতে খানিকটা সরিয়া আসা হইয়াছে। আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার সুবিধার জন্মই ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাহা করা হইল। এখন পুনরায় আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করা যাইতেছে।

থিয়সফিকেল সোসাইটির সাক্ষ্য।

বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকা দৈশবাসী মনীষিগণের এই খ্যাতিটুকু আছে যে তাঁহারা কোন বিষয়ের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে কিম্বা স্বার্থত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রকৃত স্বাধীন জাতীয় লোক ইহারা, এবং শারীরিক, মানসিক, আর্থিক এবং নৈতিক বলেও তাঁহারা বর্তমান জগতের মানব সমাজের অগ্রগণ্য। বাস্তবিক ঐ গৌরবটুকু ইহাদের স্বাভিজিত এবং ত্রায্য প্রাপ্য।

অনুমান এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহিলাকুলের গৌরব স্বরূপিণী মাননীয়া মেডেম ব্লেভেস্কির মনে পরলোক সংক্রান্ত জটিল

প্রশ্ন সমাধান করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইলে, তাঁহার চেষ্টায় এই অভিপ্রায়ে একটা সমিতি গঠিত হয়। অতি অল্প সময় মধ্যেই আমেরিকা নিবাসী মহামতি কর্ণেল আল্ফট মহাশয় তাঁহার সহযোগী হন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁহারা এই জটিল বিষয়টির সমাধানের উপায় চিন্তা করিতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশের আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে ঐ সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া সকলে অক্লান্ত পরিশ্রমে, এক দিকে পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রেতাশ্রম আবির্ভাব সংক্রান্ত ঘটনাবলী সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিতে থাকেন, এবং অপর দিকে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীতে প্রচারিত সকল দেশের সর্ব প্রকারের ধর্মশাস্ত্র ও প্রচলিত রীতি নীতি এবং সমস্ত দর্শন শাস্ত্র এবং জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সমস্ত তথ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত আলোচনা করিতে থাকেন। ঐ সমিতি কোন ধর্মেরই বিরোধী নহেন। তাঁহারা সমস্ত ধর্মের প্রতিই যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সত্য নির্ণয় করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এইরূপে বহু গণ্যমান্য বুদ্ধিমান, ধার্মিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনিষীগণ কিছুকাল কঠোর সাধনা ও গবেষণার ফলে দেখিতে পাইলেন যে পরলোকগত ব্যক্তির আবির্ভাব সংক্রান্ত অনেক সত্য ঘটনা প্রত্যেক দেশেই অনাদিকাল হইতে সংঘটিত হইতেছে এবং এই সকল ঘটনা সমূহ যে পরলোকের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে তাহা খণ্ডন করার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ,

পৃথিবীতে প্রচারিত প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই কোন না কোন ভাবে প্রেতলোকের অস্তিত্ব প্রচার করিয়া আসিতেছে। এ ছাড়া জড়-বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত যতগুলি তথ্য প্রমাণ করিয়াছে তাহার কোনটাই প্রেতলোকের অস্তিত্বের বিরোধী নহে, পক্ষান্তরে জড়-বিজ্ঞান যতই উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইতেছে ততই তদ্বারা প্রেতলোকের অস্তিত্ব সমর্থনের ভাবই দেখা যাইতেছে। দার্শনিকগণের মধ্যে মাত্র এ বিষয়ে কোন কোন স্থলে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া প্রেতলোকের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কোনরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করার উপযোগী কোন সঙ্গত কারণ বা যুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু সমিতির সভ্যগণ চাক্ষুষ প্রমাণ ব্যতীত কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌছিবার লোক নন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন চিন্তাশীল ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি এই বিষয়ের চাক্ষুষ প্রমাণের অন্বেষণে জীবন উৎসর্গ করতঃ দূতসংকল্প হইয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক দেশের সাধু মহাপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। এইভাবে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে তিব্বত দেশের এক পর্ব্বতের গুহায় দুইজন সন্ন্যাসীর আশ্রয় পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হন, এবং তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী সাধনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহারা নিজে ইচ্ছানুসারে জড়দেহ বিছানায় রাখিয়া প্রেতলোকে গমন করতঃ মৃত ব্যক্তিদের সহিত কথোপকথন ও পরামর্শ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ স্মৃতির সহিত পুনরায় জড়দেহে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। এই অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করিয়া

তঁাহারা সমিতিতে আসিয়া অনেক সদস্যকেই এই প্রণালী শিক্ষা দেন। বর্তমানে সমস্ত সভ্য দেশেই এই সমিতির শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশেরই অনেক গণ্যমান্য সত্যানুরাগী ও সদাশয় ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য হইয়াছেন। বর্তমানে এই সমিতির সভ্যগণ মধ্যে অনেকেই ইচ্ছানুসারে দেহ ছাড়িয়া পরলোকে যাইয়া ইঙ্গিত কার্যা সম্পাদন করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন।

যে সকল লোক নিজ নিজ কুর্শ্বের ফলে এবং অজ্ঞতার দরুণ মৃত্যুর পর নিতান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া কষ্ট পায় তঁাহাদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সমিতি কর্তৃক ইদানীং একটা “অদৃশ্য সাহায্যকারী দল” গঠিত হইয়াছে। সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যঁাহারা পরলোকে যাওয়া অভ্যাস করিয়াছেন তঁাহাদের কেহ কেহ এবং পরলোকগত অনেক ব্যক্তি এই দলভুক্ত আছেন। ইহলোক ও পরলোকে মেলামিশিভাবে এই দলটি গঠিত হইয়াছে। ইহলোক বা পরলোকে যেখানে যেখানে বিষম বিপদ উপস্থিত হয়, এই দলের সভ্যগণ সেই সেই স্থানে যাইয়া অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে সহায়তা করেন। পরোপকারই তঁাহাদের ব্রত। এই সকল ব্যাপারের খানিকটা বিবরণ পশ্চাৎ বিবৃত হইবে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির সভ্য। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বেল্‌ফোর্ স্বয়ং এই থিয়সফিকেল সোসাইটির সভ্য ছিলেন।

থিয়সফিকেল সোসাইটি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সমিতি তাহাদের চাক্ষুষ জ্ঞান হইতে প্রচার করিতেছেন যে সমগ্র সৃষ্ট স্থান, বস্তু, জীব, ভাব, গুণ বা অবস্থা কোনটিরই সম্পূর্ণ অংশ সাধারণ মানবের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। অভাবনীয় সূক্ষ্ম ভাব বা অবস্থা হইতে ক্রমশঃ স্থূলের দিকে নাগিতে থাকিয়া অবশেষে অতি স্থূল জড় জগতে পৌঁছিয়াছে। আমরা জড় জগতের জীব—জড় জগৎ লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে অভ্যস্ত। কাজেই জড় জগতের সাহায্যে ক্রমশঃ আত্মশক্তির বিকাশ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধ-দিগের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়।

পার্শ্বের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য থ

করিলে তত্ত্বজ্ঞান সমিতির অভিজ্ঞতানুযায়ী ইহলোক পর-লোক আদি সম্বন্ধে ধারণা করার সুবিধা হইতে পারে। আমরা জীবিত মানবগণ যে লোকে বাস করিতেছি তাহা স্থূলতম লোক এবং ঐ লোককে তাঁহারা Physical plane বলেন। তদূর্দ্ধ সূক্ষ্ম লোককে তাঁহারা এথ্রেল প্লেন (Astral plane) বলেন। তাঁহাদের কথিত ক

Causal plane কারণ জগৎ
Mental plane স্বর্গলোক
Astral plane প্রেতলোক, পিতৃলোক ও স্বর্গলোকের অংশ
Physical plane জড় জগৎ

এথ্রেল প্লেন, ঋষিগণের কথিত প্রেতলোক, পিতৃলোক, স্বর্গ-

লোকের কতকাংশ বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই এষ্ট্রেল প্লেনে তাঁহারা প্রায়ই যাতায়াত করিতেছেন; এবং ঐ প্লেনের জীবের সহিত তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরামর্শ আদি হয়। এষ্ট্রেল প্লেন হইতেও সূক্ষ্মতর আর একটী প্লেনেও তাঁহারা সময় সময় যাইতে সমর্থ। ঐ লোককেই স্বর্গলোক বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। ঐ লোককে তাঁহারা মেন্টেল প্লেন (Mental plane) বলেন। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম আরও প্লেন থাকার আভাষ তাঁহারা পাইয়াছেন এবং তাহার নামাকরণ করিয়াছেন Causal plane বা কারণ লোক। সেখানে তাঁহারা যাইতে অক্ষম। তদূর্দ্ধস্থিত কোন লোক আছে কি নাই তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না।

তাঁহারা বলেন, এই সকল প্লেন বা লোক যে পৃথক পৃথক স্থান ব্যাপিয়া আছে তাহা নহে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যেক গুণে ও প্রত্যেক ভাবে ঐ সমস্ত প্লেন-গুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পর অনুরূপ হইয়া আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে একটী বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রকৃত বস্তুটী এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, জড় জগতের হিসাবে ইহার দেহে আমরা যেমন মূলকাণ্ড, শাখা প্রশাখা, বন্ধল দেখি, এষ্ট্রেল প্লেনের হিসাবেও ইহাতে অবিকল ঐ সমস্তই দেখা যাইবে কিন্তু সেগুলি সমস্তই সূক্ষ্ম এষ্ট্রেল প্লেনের পরমাণু নির্মিত। আবার মেন্টেল প্লেনের হিসাবেও ঐ বৃক্ষের উল্লিখিত সমস্ত অংশই দেখা যাইবে কিন্তু ঐগুলি আবার অধিকতর সূক্ষ্ম মেন্টেল প্লেনের পরমাণু নির্মিত।

এথ্রেল প্লেনটা যে ফিজিকেল প্লেনের নকল বা ছায়াস্বরূপ তাহাও নহে। এথ্রেল প্লেনের নিজস্ব বহু পদার্থ, বহু ভাব এবং বহু দৃশ্য আছে যাহা জড় জগতের মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ধ্বন, ভৈরবী রাগিনীর একটা গান গীত হইল। জড় জগতের বায়ু পরমাণুর স্পন্দনে যে ধ্বনি উৎপন্ন হইল তাহা আমরা শুনিয়া শ্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এথ্রেল প্লেনের পরমাণুগুলি স্পন্দিত হইয়া যে ধ্বনি হইল তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই। সেইটা কিন্তু অধিকতর চিত্তবিনোদনকারী। আবার জড় জগৎবাসী আমরা গানটা শুনিলাম মাত্র—কিছু দেখি নাই। এথ্রেল প্লেনে ঐ রাগিনিটা মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে। এইরূপ এথ্রেল প্লেনে নানারূপ দৃশ্য, নানারূপ ভাব, নানারূপ জীবজন্তু আছে, তাহা ফিজিকেল প্লেনে নাই।

ফিজিকেল প্লেনের পরলোক এথ্রেল প্লেন। এথ্রেল প্লেনের পরলোক মেটেল প্লেন এবং মেটেল প্লেনের পরলোক কজেল প্লেন। পরলোক কেবল একটা নহে। সাধারণ ভাবে ভুলোকের জীব ভুবলোকের কোন কিছু দেখিতে শুনিতে পায় না। আবার ভুবলোকের জীব স্বর্গলোকের কিছুই দেখিতে শুনিতে পায় না। কিন্তু উর্দ্ধলোকের জীব নিম্নলোকের সবই একভাবে দেখিতে শুনিতে পারে। ঐ সব বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে থিয়সফিকেল সোসাইটীর প্রচারিত পুস্তক সমূহ পাঠ করা আবশ্যিক।

একটু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিলে দেখা যাইবে যে প্রাচীন আৰ্য্য

ঋষিগণ পরলোকের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞান সমিতির প্রত্যক্ষ করা বিবরণের বিশেষ অনৈক্য নাই। পাঠক মহাশয়ের সর্ব প্রকারের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে, পরলোকের অবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক মহামতি রাইট রেভারেণ্ড্‌ সি, ডাবলিউ লিড্‌বিটার সাহেব স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করা যাইতেছে :—

“I have already referred to the latent faculties by means of which the unseen world can be directly recognized, and the whole life beyond the grave seen as clearly and as fully in detail as we now see the Physical life around us. A certain number of our Theosophical students have already unfolded these inner senses, and so are in a position to give definite information upon this most interesting subject. I am quite aware that this is a considerable claim to make—a claim which would not be made by any of the modern expounders of Western Orthodoxy. Any minister of any church has his version of the states after death to put before us ; and in support of it he will explain that the church teaches this or that or that the Bible tells us so and so. But he will never say to

us, 'I who speak to you have been in this Heaven or this hell which I describe ; I myself have seen these things and therefore know them to be true.' But this is precisely what the Theosophical investigators are able to say, for they do know that of which they speak, and they are dealing with a definite series of facts which they have personally investigated and, therefore, they speak with the authority and certainty which only direct knowledge gives."

[The Other Side of Death p. 14 .]

ভাবার্থ—আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে মানুষের এমন শক্তি সুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে যদ্বারা অদৃশ্য জগৎ স্পষ্ট দর্শন করা যাইতে পারে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সম্পূর্ণ জীবনের বিস্তারিত বিবরণ এমন স্পষ্ট ও পরিস্ফুটভাবে দেখা যাইতে পারে যেমন আমাদের চতুস্পার্শ্বে পার্থিব জীবন দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সমিতির প্রচারিত জ্ঞান-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ঐ সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সেই কারণেই তাঁহারা পরলোক সম্বন্ধীয় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে নিশ্চিত সংবাদ দিতে সমর্থ। আমার লক্ষ্য আছে যে দাবীটা অত্যন্ত গুরুতর—এত গুরুতর যে ইদানীন্তন পাশ্চাত্য গোড়ামীর প্রচারকেরাও এত বড় দাবী করিতে অসমর্থ। খ্রীষ্টান

ধর্মের যত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে ঐ ঐ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ধর্মযাজকদিগের পরলোকসংক্রান্ত পৃথক পৃথক রকমে বিবৃতি আছে এবং ঐ ঐ বিবৃতির সপক্ষে তাঁহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা বাইবেলের দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কখনো এই কথা বলিতে পারিবেন না যে তাঁহার বর্ণিত স্বর্গ বা নরকে তিনি নিজে কখনো গিয়াছেন এবং ঐ স্বর্গ বা নরকের কোন বস্তু তিনি নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। থিয়সফিকেল সোসাইটীর তদন্তকারীগণ কিন্তু ঠিক ইহা বলিতে সক্ষম। কারণ তাঁহারা যাহা নিজে জানিতে পারিয়াছেন তাহাই বলেন এবং তাঁহারা এমন কতকগুলি তথ্য লইয়া নাড়াচাড়া করেন যাহা তাঁহারা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের বক্তবাগুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নিশ্চিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বিবরণ সংক্ষেপে যাহা দেওয়া হইল, অস্থিমাংসসম্পন্ন জড়-দেহযুক্ত জীব আমাদের পক্ষে তাহা সম্যক ধারণা করিয়া উঠা কঠিন। সাময়িক ভাবে যদি আমরা অস্থিমাংসের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি তাহা হইলেই আমাদের সন্দেহ দূর হইয়া যাইতে পারে। তাহা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যোগী মহাপুরুষদের মধ্যে এরূপ শক্তিশালী লোক আজও বর্তমান আছেন। আন্তরিকভাবে তালাস করিলে তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী

(বর্তমানে সন্তদাস কাঠিয়া) পাইয়াছিলেন। বারদীর স্বর্গীয় লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নিজেরই এই ক্ষমতা ছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়েরও এই ক্ষমতা হইয়াছিল। আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। এই সকল ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করান কঠিন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনেক বলাতেও অর্জুনের নিশ্চিত ধারণা না হওয়ায় অর্জুন ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং দেখিবার প্রার্থনা জানাইলে ভগবান তখন দয়া করিয়া অর্জুনকে স্বর্গীয় চক্ষু প্রদান করিলেন। অর্জুন তখন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন। (গীতা, একাদশ অধ্যায়।) লক্ষ্য করার বিষয় যে অর্জুন এক স্থানে থাকিয়াই সম্পূর্ণ বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। তজ্জন্ত দূরে যাওয়ার আবশ্যক হয় নাই। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক যে স্বর্গীয় দৃষ্টিতে সংকল্পগুলিও মূর্তিমন্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। কারণ তখন পর্যাস্ত হুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কেহই দেহ ত্যাগ করেন নাই। ভগবানের মনে তাঁহাদের মৃত্যুর সংকল্প মাত্র হইয়াছে। তদবস্থায় অর্জুন তাঁহাদের মৃত্যবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

অমী চ স্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ

সর্বে সইবাবনিপাল যজ্ঞৈঃ ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্র স্তথাহসৌ

সহাস্রদীযৈরপি যোধ মুর্থেঃ ॥ গীতা ১২।২৬

বক্তৃদ্বানি তে ত্বরমানা বিশস্তি
দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চুর্ণিতৈরুত্তমাজৈঃ ॥ গীতা ১১।২৭

যথা নদীনাং বহবোহস্থুরবেগাঃ
সমুদ্ভমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।

তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশস্তি বক্তৃদ্ব্যস্তভিত্তৌ জলন্তি । গীতা ১১।২৮

উপরোক্ত কথাগুলি গীতার উক্তি হিসাবে তো কথাই নাই, সহজ বুদ্ধিতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। কারণ সচরাচর আমরা এই ধরনের অনেক ঘটনা দেখিতে পাই; সজ্জবদ্ধ একতার ভিতরে একটা বেয়াদবি থাকে। সেই বেয়াদবি মূলেই এ যাবত ঐ সমস্ত বিষয়ে স্থলবিশেষে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পাইত। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে গুরুতর কোন শুভ বা অশুভ ঘটনা কার্য্যতঃ ঘটিবার কিছু সময় পূর্বেই মানুষের মনে ঐরূপ ঘটনার একটা ছায়াপাত হইয়া থাকে। যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁহারা ঐ ছায়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরদেহ বিশ্লেষণ

মनुষ্য জীবনে নানা সময়ে নানা প্রকারের অবস্থা উপস্থিত হয়। ঐ সকল অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। একটু লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট দেখা যায় যে মনের ভাব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার দেহের গঠন, বর্ণ, আবভাব আদি সবই পরিবর্তিত হয়। আজকাল ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করার ক্ষমতাটাও একটী বিশিষ্ট বিচাররূপে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ অভ্যাস দ্বারা ঐ ক্ষমতা অর্জন করতঃ তদ্বারা বেশ অর্থ উপার্জন করিতেছেন। কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের অনেক স্থানে, সাধারণতঃ ধনী লোকের বৈঠকে, অত্যাণ্ড প্রকারের আমোদ প্রমোদের হ্রায় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শনও একটা আমোদের বিষয়স্বরূপে গণ্য হইয়াছে। প্রদর্শকেরা অনুশীলন দ্বারা এমন শক্তি অর্জন করিয়াছেন যে তাঁহারা ইচ্ছানুসারে নিজ মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চেহারাও পরিবর্তিত হয়। একই ব্যক্তির সহজ অবস্থা, ক্রোধাবিষ্ট অবস্থা, বিজয়ীর অবস্থা, অপমানিত ও পরাজিত অবস্থা ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবস্থাকালে ভিন্ন ভিন্ন ফটোগ্রাফ লইলে

দেখা যাইবে যে ভিন্ন ভিন্ন ফটোগ্রাফে বিলক্ষণ পার্থক্য রহিয়াছে।

সুস্থ-দেহ পাঁচ জন লোক একত্রে বসিয়া নিশ্চিস্ত ভাবে গল্প করিতেছে. এমন সময়ে এক জনের নিকট একটা টেলিগ্রাম আসিল, তাহাতে ভয়ানক দুঃসংবাদ। টেলির বিবরণ জানা মাত্রেই তাহার চেহারা পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, ইহা স্বীকার্য।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে টেলিগ্রামটা ঐ লোকটার অস্থিমাংসে কিম্বা গাত্র চৰ্ম্মে আঘাত করে নাই। আঘাত করিয়াছে তাহার মনে—আঘাত করিয়াছে তাহার বুদ্ধিতে—আঘাত করিয়াছে তাহার অহঙ্কারে। এখন ভাবিয়া দেখুন, জড় দেহের অস্থি ভিন্ন মাংস, চৰ্ম্ম, শিরা প্রভৃতি সবই ন্যূনাধিক স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ সঙ্কোচন প্রসারণ যোগ্য। ইহা সহজ দৃষ্টিতেই দেখা যাইতেছে।

এখন ঋষি-শাস্ত্রে আমরা পাইতেছি যে নরদেহে পাঁচটা কোষ আছে :—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, জ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ বা হিরণ্ময় কোষ। এই কোষগুলি সবই এক আকৃতিবিশিষ্ট এবং পরস্পর পরস্পরের অন্তপ্রবিষ্টভাবে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিজড়িত রহিয়াছে। আমরা কিন্তু দেখিতেছি যে অন্নময় কোষ অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহটা অনেকটা সঙ্কোচন-প্রসারণশীল। তাহা হইলে অন্যান্য কোষগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে নিম্নিত বিধায় অধিকতর সঙ্কোচন-প্রসারণশীল হওয়াই নিশ্চিত। প্রাপ্তকৃত টেলিগ্রামটা মনোময়কোষে

আঘাত করা মাত্র ঐ কোষটী অবস্থানুসারে বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রাণময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে বিক্ষোভ উপস্থিত করে। ঐ কোষগুলি অল্পময় কোষ বা জড়দেহের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকায় তদ্বারা স্থিতিস্থাপক জড়দেহ পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া চেহারা পরিবর্তিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় কি? আবার চেহারা পরিবর্তিত হওয়া অর্থে কেবল যে মুখশ্রী পরিবর্তিত হয় তাহা নহে; নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে পা অবধি মাথা পর্য্যন্ত সর্বদ্বারই অনুভবযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমানিত হইতেছে যে মনুষ্য দেহে ভিন্ন ভিন্ন কোষ আছে এবং কোষগুলি পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট ভাবে মিশ্রিত আছে।

যুক্তির দিক ছাড়িয়া দিয়া আসুন এখন আমরা প্রত্যক্ষের দিকে লক্ষ্য করি। থিয়সফিকেল সোসাইটী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে মানুষের দেহ একটি নয়। তাঁহারা বলেন যে মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায়ই তাহার তিনটি দেহ পর্য্যন্ত তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন।—(১) ফিজিক্যাল বডি বা জড়দেহ, (২) এথ্রেল বডি বা প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষের কতকাংশ, (৩) মেটেল বডি বা মনোময় কোষ। ঐ ঐ বডি অর্থাৎ দেহগুলি তাহাদের নিজ নিজ প্লেন অর্থাৎ লোকের (ফিজিক্যাল, এথ্রেল ও মেটেল) বস্তু পরমাণু দ্বারা গঠিত। নরদেহের ভিতর ও বাহিরের প্রত্যেক পরমাণুতে ঐ সকল প্লেনের পরমাণু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ইহাও বলেন যে ইথিরিয়েল ডাবল্ (Etherial

double) নামে আর একটি দেহ আছে, তাহা ইথারের পরমাণু দ্বারা নিশ্চিত। ইহাও অন্য দেহগুলির ন্যায় জড়দেহের সঙ্গে বিজড়িত। ইহাই ভিন্ন ভিন্ন দেহ (বডি) বা কোষগুলির পরস্পরের মধ্যে সংশ্রব রক্ষা করিতেছে। ইহার আর একটি আশ্চর্য্য শক্তি এই যে এথেরাল বডি ফিজিক্যাল বডি হইতে বহু দূরে চলিয়া গেলেও সে আবশ্যক মতে নিমেষ মধ্যে ইহাকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম। [অবিশ্বাস করিবার মোটেই কোন কারণ নাই। লগুনের বক্তৃতা তন্মূহূর্ত্তেই কলিকাতায় বসিয়া শুনা যাইতেছে না কি ?]

ভিন্ন ভিন্ন বডি বা কোষগুলিকে লইয়া থিয়সফিকেল সোসাইটীর সভ্য মহোদয়গণ কিরূপে নাড়াচাড়া করিতেছেন এবং জগতের হিতসাধন করিতেছেন তাহার একটা বিবরণ মহাত্মা সি, ডবলিউ লিডবিটার সাহেবের স্বহস্ত লিখিত বিবরণ হইতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

[বলিয়া রাখা আবশ্যক যে সোসাইটীর কয়েকজন সভ্য পরোপকার করার উদ্দেশ্যে একটা দল গঠন করিয়াছেন। ঐ দলের মধ্যে পরলোকগত সদস্যও আছেন ইহলোকের জীবিত সদস্যও আছেন। যাহারা মৃত অর্থাৎ পরলোকগত তাহারা পরলোকের এথেরাল বডি (Astral body—প্রেত দেহ) লইয়াই সর্বত্র বিচরণ করেন। জীবিত সদস্যদের মধ্যে সকলেরই এই ক্ষমতাটুকু অর্জিত হইয়াছে যদ্বারা তাঁহারা জড় দেহটী বিছানায় রাখিয়া এথেরাল বডিটী লইয়া চক্ষের পলকে যেখানে সেখানে

যাইতে পারেন। তাঁহাদের এই ক্ষমতাও আছে যদ্বারা জড়দেহে থাকিয়াও সমীপবর্তী প্রেত দেহ দেখিতে পারেন এবং তাহার কথা শুনিতে পারেন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট যাইয়া সংবাদ আদান প্রদান, যুক্তি পরামর্শ আদি করেন এবং প্রায় প্রত্যহই নানা স্থানে ঘুরিয়া পরোপকার করিয়া থাকেন।]

লিড্‌বিটার সাহেবের লিখিত বিবরণের অনুবাদ।

“একটি আত্মহত্যা নিবারণিত।”

“মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত আদিয়ার নামক স্থানে এক দিন একটু অধিক রাত্রিতে আমি আমার নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিজে বলিয়া দিয়া অন্তের দ্বারা একটি বিষয় লিখাইতেছি, এমন সময়ে পূর্ব কথামতে আমাদের দলের একজন যুবক সভা (এষ্ট্রেল বডিতে) আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রিতে আসিবার জন্ত পূর্বেরই পরামর্শ ছিল। আসিলে তাহার সঙ্গে আমিও বাহির হইব এইরূপ কথা ছিল। [তাহাকে যুবক নামে অভিহিত করা যাইতেছে।] আমার হাতের কাজটা শেষ করিয়া লইবার জন্ত তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলাম। আমার কথামতে সে অপেক্ষা করা উপলক্ষে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করিয়া তৎপর বঙ্গোপসাগরে চলিয়া গেল। একটু বেড়াইয়া ১০।৫ মিনিট সময় ক্ষেপ করা ভিন্ন বঙ্গোপসাগরে যাওয়ার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। একটি ষ্টীমার যাইতেছে দেখিয়া শুধু কৌতূহলবশতঃই সে ঐ ষ্টীমারটির নিকটে গেল। তখন ঐ ষ্টীমারের একটি বন্ধ প্রকোষ্ঠের বাতায়নের উপরে একটি

ধ্বংসে সাদা বর্ণের প্রেতদেহ নিতান্ত বিষন্ন অবস্থায় তির্যগ্ ভাবে জানালার উপর লুইয়া থাকা দেখিতে পাইল। যে কোন স্থানে কোনরূপ বিপদের লক্ষণ দেখিলেই সেই বিষয়ে একটু বিশেষ তদন্ত করার জন্ত তাহার প্রতি সমিতির উপদেশ ছিল। তদনুসারে সে প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করিয়া (প্রেতদেহ যে কোন বদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিতে পারে) দেখিল একটি যুবক হাতে একটি পিস্তল লইয়া একবার নিজ কপালের দিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিল এবং তখনই কি যেন ভাবিয়া আবার পিস্তলটি নামাইল। কিন্তু হাত হইতে পিস্তলটি ছাড়িল না। যুবকটি (আমাদের দলের সদস্য) আমাদের দলে সবেমাত্র নূতন যোগ দিয়াছিল। সে ইহা বুঝিল যে এ অবস্থায় কোনরূপ প্রতীকার করা আবশ্যক কিন্তু কি ভাবে প্রতীকার করা যাইতে পারে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া বিছাৎবেগে সে আমার নিকট চলিয়া আসিল এবং ব্যস্ততার সহিত বলিল ‘শীঘ্র আসুন, একটা লোক আত্মহত্যা করিতে উচ্চত হইয়াছে।’

তাহার কথা শুনামাত্র আমি লিখাইবার কাজ বন্ধ করিলাম এবং দেহটি বিছানায় রাখিয়া তন্মুহূর্তে সেই যুবকের সঙ্গে স্টীমারে উপস্থিত হইলাম। আমি উপস্থিত হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে আত্মহত্যায় উচ্চত লোকটির মনের উপর ক্রিয়া করতঃ কার্যটি স্থগিত না রাখিতে পারিলে পরে আর কিছুই করার উপায় থাকিবে না। এদিকে আবার আমার পরিত্যক্ত কার্যটি শেষ করিয়া যাওয়ার জন্ত খানিকটা সময় লওয়াও আবশ্যক।

এই ভাবিয়া আমি প্রথমেই তাহার অজানিত ভাবে তাহার মনের উপর আমার মনের প্রভাব বিস্তার করিলাম। সে অনভ্যস্ত অল্পবয়স্ক যুবক মাত্র এবং আমি বহুদিনের অভ্যস্ত ও অধিক বয়স্ক। কাজেই তাহার মনের উপর আমার প্রভাব প্রবল হইল। তাহাকে এই পর্য্যন্ত লওয়াইতে পারিলাম যে মধ্যরাত্রি সময় পর্য্যন্ত ভাবিয়া তাহার পর যাহা হয় করা হইবে। এই ভাবে তাহার আত্মহত্যার কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রহিল। আমার গুপ্ত অনুশাসন মতে পিস্তলটি ড্রয়ারের ভিতরে রাখিয়া দিল। তখন আমি আমার সঙ্গী ও সহায়তাকারী যুবকটিকে ঐ স্থানে পাঠরা রাখিয়া আমার নিজদেহে চলিয়া আসিলাম এবং আরন্ধ কার্য্য আরও খানিকটা সম্পাদন করতঃ যথাস্থানে বন্ধ রাখিলাম। সঙ্গীয় যুবকটিকে বলিয়া আসিলাম যে ইতিমধ্যে আত্মহত্যার উদ্যোগী লোকটি যদি পুনরায় ড্রয়ার খুলিতে উদ্যোগ করে তবে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গিয়া আমাকে যেন সে খবর দেয়।

রাত্রি ১২টা বাজিবার পূর্বেই আমি পুনরায় স্টীমারে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম যে যদিও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই তথাপি আমার সাহায্যকারী যুবকটী নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। আত্মহত্যার উদ্যোগী যুবকটীর মন পরিবর্তিত হয় নাই এবং আত্মহত্যা করার সংকল্পই তাহার মনে প্রবল রহিয়াছে।

তখন আমি তাহার মনের ভাবগুলি বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে লোকটী ঐ জাহাজের একজন কন্মচারী। জাহাজের তহবিলের কতকগুলি টাকা তহরুপ

করার অপরাধটি তাহার আত্মহত্যার উদ্যোগের মূখ্য কারণ। তহবিল তচ্ছুপের টাকাগুলি সম্বন্ধে পরদিনই তাহার ধরা পড়া অবশ্যসম্ভাবী হইয়াছিল এবং ঐ টাকাগুলি সংগ্রহ করতঃ হিসাবে তহবিল মিল থাকা দেখাইয়া দেওয়ার মত সামর্থ্য তাহার ছিল না। অপরাধী স্বরূপে ধৃত হওয়ার অপমান সহ্য করার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। তজ্জগুই আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল।

আরও তদন্তে জানিলাম যে লোকটা মোটের উপর ভালই ছিল। কিন্তু যৌবনস্বভাবশুলভ মোহবশতঃ সে একটা যুবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রীতি ভালবাসা আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তহবিল ভাঙ্গিয়া টাকা খরচ করিয়াছিল। সাময়িক মোহবশতঃ এই দুষ্কার্য্য করিয়া থাকিলেও মূলে তাহার চরিত্র খারাপ ছিল না।

কিরূপে তাহাকে তাহার আত্মহত্যার সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে তাহার সূত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, তাহার মা বর্তমান আছেন এবং মায়ের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। অপর দিকে সে যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার সূত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে জাহাজের অধ্যক্ষ সাহেবের মনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম তিনি বিবেচক, দয়ালু ও সহৃদয় লোক। এই সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া আমি আমার মনের প্রভাব দ্বারা আত্মহত্যায় উদ্যোগী যুবককে তাহার মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। এই স্মৃতিটি তাহার মনের উপর এত ক্রিয়া করিল যে সে তাহার ট্রান্স খুলিয়া তাহার

মায়ের ফটো বাহির করিল, এবং সে আত্মহত্যা করিলে তাহার মা যে কি নিদারুণ আঘাত পাইবে এই সমস্ত ভাবনা তাহার মনে আসিতে লাগিল। কিন্তু অপরাধের দায়িত্ব হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে তাহার কোন উপায় দেখিতে না পাওয়ায় সে আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ করিতে পারিল না।

অবস্থা অনুকূল দেখিয়া আমি তাহার মনের ভিতরে এই চিন্তা প্রবেশ করাইলাম যে জাহাজের অধ্যক্ষ সদাশয় লোক। তাঁহার নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ করিলে ক্ষুফল পাওয়ার আশা একেবারে ছুরাশা নহে। অপর দিকে জাহাজের অধ্যক্ষের মনেও আমার মনের প্রভাব বিস্তার করতঃ তাঁহার মনকে অধিকতর কোমল ও দয়ালু করিয়া তুলিতে লাগিলাম।

অবশেষে ঐ রাত্রিতেই অপরাধী যুবক জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট গেল এবং অকপটভাবে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিল এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে প্রস্তুত হইয়া সম্প্রতি দয়াপ্রার্থী হইল। তখন অধ্যক্ষের চিত্তও দয়াদ্র হইয়া গেল এবং কিস্তিবন্দিমতে টাকাগুলি ক্রমশঃ লইবার সৰ্ত্তে অধ্যক্ষ সাহেব নিজ হইতে টাকাগুলি জাহাজের তহবিলে জমা করিয়া দিলেন। আত্মহত্যা নিবারিত হইল।”

উপরোক্ত ঘটনাটী লিড্‌বিটার সাহেব নিজে সংঘটন করিয়াছেন। বিবরণটীও স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি একা যে ঐ সকল কাজ করিয়াছেন তাহাও নহে। অনেক

লোক দলবদ্ধ হইয়া এই ধরণের পরোপকারের কাজ আজও করিতেছেন। সেই দলে কেবল ইংরেজ নহেন, সকল দেশের গণ্যমান্য লোকই আছেন। আমাদের ভারতবর্ষেরও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য লোক ঐ সমিতিতে আছেন এবং প্রায় সকলেই ঐ সমিতির আস্থা-সম্পন্ন বটেন। সমিতি-ভুক্ত ভারতবাসীর মধ্যে আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব মহামতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মান্দাজ প্রেসিডেন্সীর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ সুব্বা রাওএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুনরায় আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করা যাক। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে স্থানবাচক সৃষ্টি যেমন স্থূল সূক্ষ্ম হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত, জীব দেহও তদ্রূপ। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কার্যনির্বাহার্থ ই ঐ স্তরের পরমাণু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের কোষ বা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রস্তুত হইয়াছে এবং একটা জীবিত নরদেহ ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন দেহের একীভূত অবস্থা।

জড়-জগতে থাকিতে হইলে জড় বস্তু লইয়া কাজ কারবার করিতে হয়, কাজেই জড় দেহের প্রয়োজন। এণ্ট্রেল প্লেনে জড় বস্তু নাই। কাজেই সেখানে জড় দেহের প্রয়োজনও নাই। জড় দেহ লইয়া সেখানে যাওয়ারও ব্যবস্থা নাই। সেখানে এণ্ট্রেল বডি লইয়া যাইতে হয়। আবার মেটেল প্লেনে এণ্ট্রেল বস্তু নাই। কাজেই এণ্ট্রেল বডিরও সেখানে প্রয়োজন হয় না এবং এণ্ট্রেল বডি বা দেহ লইয়া সেখানে যাওয়ারও ব্যবস্থা নাই।

ইহা লক্ষ্য করা অতি সহজ যে অন্য এক জনের জড় দেহকে ধরিতে হইলে বা বহন করিতে হইলে নিজের জড়দেহের সাহায্য ভিন্ন তাহা হওয়ার উপায় নাই। কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতে হইলে বা তাহার প্রতি বিদ্রোহ ভাব পোষণ করিতে হইলে জড় দেহ দ্বারা তাহা হইতে পারে না। ভালবাসা, দয়া, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি ভাবপদার্থ এষ্টেল প্লেনের পরমাণু দ্বারা নিষ্পন্ন। নিজের এষ্টেল বডি দ্বারা ঐগুলি অপরের এষ্টেল বডিতে প্রয়োগ করা হয়। ঐ সকল প্রয়োগ করিতে কাছ যাওয়ারও প্রয়োজন হয় না। কলিকাতায় থাকিয়া দিল্লীর লোককে ভালবাসা যায় আবার হিংসাও করা যায়। কার্যতঃ সেই ভালবাসা বা হিংসা দিল্লীতে পৌছায়ও।

যাঁহারা প্রীতি, ভালবাসা, সত্য, সরলতা উদারতা ক্ষমা প্রভৃতি সদগুণরাজির অনুশীলন করিয়া নিজেদের সূক্ষ্ম দেহকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের এষ্টেল বডি অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ নীচাশয় লোকদের সূক্ষ্মদেহ হইতে অত্যধিক বলবান ও সুস্থ। বলবান যেমন দুর্বলকে সাহায্যও করিতে পারে আবার নির্যাতনও করিতে পারে ঠিক সেইরূপ বলবান সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা দুর্বল সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যও হইতে পারে আবার অনিষ্টও হইতে পারে। এই জন্যই প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে শ্রীরদ্ধি এবং অভিশাপে শ্রীভ্রংশ হইত। যেহেতু তৎকালের আদর্শ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ শম দমাদি স্বর্গীয় ভাবের অনুশীলন দ্বারা নিজেদের সূক্ষ্ম দেহকে প্রভূত বলশালী করিয়া রাখিতেন।

জড় জগতে আঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন করে। ধ্বনি প্রতি-
ধ্বনি উৎপন্ন করে। ঠিক সেইরূপ এষ্টেল মেনে প্রীতি প্রীতি
উৎপাদন করে হিংসা হিংসা উৎপাদন করে। ইহা প্রকৃত সত্য।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই রিপু ছয়টি
আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে
আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহারা আমাদের জড়দেহের
অংশ নহে কিন্তু সূক্ষ্ম দেহের অংশ। জড় দেহে ইহাদের প্রকাশ
পাওয়ার দ্বার আছে মাত্র। আমরা জীবিত থাকিতেই ইহারা
এমন ভাবে পালাইয়া থাকিতে জানে যে, আমরা ইহাদের
থাকিবার জায়গাটিরই খোঁজ পাই না। আমাদের মৃত্যুকালে
ইহাদের কখনো ইচ্ছা করিয়া জড়দেহের সঙ্গে মরিতে সম্মত
হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

আমাদের মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতিও সর্বদাই আমাদের
সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে। ইহারা আছে বুঝি কিন্তু কোথায়
পালাইয়া থাকে তাহার ঠিক পাওয়া যায় কি? পঞ্চাশ বৎসর
পূর্বে বাল্যকালে একটা প্রাচীন গান শুনিয়াছিলাম। তাহার
পর আর গানগী কেহ গাহিতে শুনি নাই। গানের পদগুলি
মনেও ছিল না বলিয়াই বিশ্বাস। আজ হঠাৎ এক ভিক্ষুক ঐ
গানটি গাহিল। তৎক্ষণাৎ পূর্ব স্মৃতি জাগ্রত হইল। স্মৃতি
কোথায় ছিল। দেহেতে ত নয়ই; কারণ সেই সময়ের দেহের
কোন অংশই বর্তমান দেহে নাই। বাস্তবিক শৈশব হইতে
বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে কতবার আমাদের জড়দেহের আমূল

পরিবর্তন হইয়াছে ; স্মৃতিটি কিন্তু তাহার পূঁজি বাড়ান ভিন্ন কোন দিকে এক কণামাত্রও ছাড়িয়া দেয় নাই। দেহতাগের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির কি কখনো তাহার তহবিলসহ আত্মত্যাগ করা সম্ভব ?

বাস্তবিক মুমূর্ষু লোকের দেহ ত্যাগ করার কিছু পূর্ব সময় হইতে বিষয়টা নিবিষ্ট চিন্তেলক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, যেমন কোন এক রাজকর্মচারী রাজকোপে পতিত হইলে অগ্ন্যাগ্ন সহকর্মীগণ রাজপক্ষ অবলম্বন করতঃ তাহাকে বর্জন করে, ঠিক সেইরূপ দেহের মালীক (জীবাত্মা) যখন অক্ষম ও অকর্মণ্য জড়দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় তখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কস্মেন্দ্রিয় আদি সমস্ত সহকর্মীগণ সজ্জবদ্ধ হইয়া দেহের রাজা জীবাত্মার পক্ষ সমর্থন করতঃ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া থাকে। পতনোদ্যত দেহের সঙ্গে কেহই যাইতে সম্মত হয় না। মৃত্যুর পূর্ব সময় সময় এরূপ অবস্থা হয় যে দেহে শ্বাস চলিতেছে, কিন্তু চৈতন্য নাই। তখন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, স্মৃতি, আদি কিছুই দেহেতে নাই। আবার কতক্ষণ পরে হয় ত চৈতন্য আসিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সবই আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে দেহীই হইতেছেন আসল মানুষটি। তাহার কতগুলি যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্রগুলি লইয়া তিনি কিছুকালের জন্য একটি দেহরূপ ঘরের ভিতরে থাকেন। যতদিন ঘরে থাকেন ততদিন ঐ ঘরের প্রতি তাহার মায়া মমতা থাকে এবং কোন স্থান নষ্ট হইলে মেরামতও করাইয়া লন।

যখন দেখেন যে ঐ ঘরে থাকা অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি যন্ত্রগুলি গোছাইয়া লইয়া অগ্নি ঘরে চলিয়া যান। দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ঐ ঘটনাকে মৃত্যু বলে। কিন্তু প্রকৃত বলিতে গেলে ইহাকে মৃত্যু না বলিয়া দেহত্যাগ বলাটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

প্রসঙ্গাধীন এই স্থলে রাইট রেভারেণ্ড সি, ডবলিউ লিডবিটার সাহেব মহোদয়ের স্বহস্তলিখিত বিবৃতির একাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করা যাইতেছে :—

“In India it was my privilege to meet some of the great teachers and from them and from their pupils I learnt much more than I had had known before and began to gain a fuller grasp of the system. Presently I received hints as to how to raise my consciousness to higher planes. I had no expectation of this as I supposed that one needed to be born with special faculties in order to attain success along that line; but I was told that such powers were latent in every human being and that if I worked at them with sufficient energy, I might develop them. Naturally I took the hint, went to work at once and in process of time found that all that had been told me was true—that it was

possible to develop astral and mental sight and by their means to verify at once the principal teachings of Theosophy.

Any one who is willing to work at it as I worked may come to know as I know that the planes of nature are definite facts ; he may know the truth of the teaching as to states after death, for he will see and speak to the so-called dead and meet them on their own plane , and it is far more satisfactory for him thus to rise to their level than to drag them down again to his own by materialization. He may know the great facts of re-incarnation for he may learn to look back to his own past lives spread before him as the pages of a book. He may verify for himself without shadow of doubt the action of the mighty laws of evolution and of Divine justice. All these things I know for myself by personal observation and so may any man who is willing to take the trouble and to tread the path.

[The Other Side of Death P. 90.]

ভাবার্থ :—সৌভাগ্য বশতঃ ভারতে আমি অনেক তত্ত্বজ্ঞ ধর্মোপদেষ্টার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহাদের নিকট ও

তাহাদের শিষ্যগণের নিকট পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর শিক্ষা লাভ করিয়াছি। নিজের অনুভূতিকে কিরূপে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর স্তরে লইয়া যাওয়া যায় তাহার সংস্কৃত আমি তখনই অবগত হই। আমি তখন ঐরূপ ক্ষমতা অর্জন করার আশা পোষণ করিতে পারি নাই, যেহেতু আমার ধারণা ছিল যে ঐ ক্ষমতা অর্জন করিতে হইলে যে বিশেষ গুণ লইয়া জন্মিতে হয়—তাহা আমার ছিল না। তখন আমার প্রতি বলা হইয়াছিল যে ঐ সকল গুণ মানব মাত্রেই অন্তরে লুক্কায়িত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, কেহ উৎসাহ সহকারে সাধনা করিলেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারে। আমি চেষ্টা করিলে কৃতকার্য হওয়ার কোন বাধা নাই ;

স্বভাব বশে আমি সেই উপদেশ ধরিলাম এবং অবিলম্বে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে, আমাকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রত্যক্ষ পাইলাম যে মানুষ চেষ্টা করিলে পরলোক দর্শন করার শক্তিও অর্জন করিতে পারে এবং সেই শক্তিবলে তত্ত্বজ্ঞান সমিতির প্রচারিত সত্য সকল উপলব্ধি করিতে পারে।

কাজ করিতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি আমার স্থায় কাজে অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইবে যে স্থিতিতে ভূ, ভুব, স্ব প্রভৃতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লোক সকল বর্তমান রহিয়াছে। মানুষ মরার পরে কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাও জানিতে পারিবে। কারণ সে নিজে তখন সেই রাজ্যে যাইতে পারিবে এবং মৃতের সঙ্গে

আলাপ করিতে পারিবে। সে তখন জন্মান্তর সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা লাভ করিতে পারিবে, কারণ তাহার নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের বিবরণ তাহার নিকট পুস্তকের পৃষ্ঠার গায় স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। ঐ সুবিচার এবং ক্রমোন্নতির নিয়ম ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে তাহার কোনরূপ সন্দেহের ছায়াও থাকিবে না। এই সকল বিষয় আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং যে কেহ যত্ন করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

জীবাশ্ম ও তাহার জন্ম মৃত্যু ।

আমার হাত, আমার পা, আমার দেহ ইত্যাদি বাক্যে “আমার” শব্দ দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হয় তিনিই জীবাশ্ম । এই জীবাশ্ম মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেই বাবহারিক ভাবে স্থূল জগতের মানুষ হইল । এই “আমি” কে, কোথা হইতে আসিল, কোথায় আসিল, কোথায় যাইবে এই সকল বিষয় জানিবার জ্ঞান কৌতূহল হয় । ঐ কৌতূহলটীও আবার জীবাশ্মারই বটে । জীবাশ্ম নিজেকে নিজে দেখিতে ও জানিতে চায়, কিন্তু তাহা পারিয়া উঠে না বলিয়াই অতৃপ্ত ও আত্মহারা হইয়া আছে । প্রভূত শারীরিক বল থাকা সত্ত্বেও নিজ দেহটীকে যেমন নিজের ঘাড়ে উঠান যায় না, ঠিক সেইরূপ জীবাশ্মও নিজেকে নিজে চিনিয়া উঠিতে পারে না । দেহের মধ্যে অদৃশ্য ভাবে আবদ্ধ থাকায় দেহকেই নিজে বলিয়া ভুল করে । এই কারণেই দেহ পরিগ্রহ করাকে জন্ম বলে এবং দেহ ত্যাগ করার ব্যাপারকে মৃত্যু বলে । বাস্তবিক কিন্তু—

ন জায়তে মৃয়তে বা কদচিৎ

নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ততোয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে । গীতা ২।১০ ।

[এই আত্মা কখনও জন্মেন না ও মরেন না । জন্ম গ্রহণ দ্বারা ইহার অস্তিত্বের উদ্ভব হয় না । ইনি সর্বদাই আছেন । ইনি জন্ম রহিত, নিত্য, শাস্ত এবং পুরাণ । শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না]

জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক প্রকারের দার্শনিক বিচার ঋষি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে । ঐ সকল খুটিনাটি ব্যাপার আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নহে । আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, আমার যে “আমি”—যে “আমির” রক্ষা দারৈরপি ধনৈরপি পর্যান্ত করিবার জন্ম চাণক্য পণ্ডিত বাবস্থা দিয়াছেন, এবং যে “আমি”র রক্ষার জন্ম আমরা “পৃথিবীং তাজেৎ” তে ও প্রস্তুত, মৃত্যুর পরে সেই অতি সাধের “আমি”র কি হইবে । ঋষিগণ কিন্তু এই “আমি”টাকে চির তরে বিদায় দেওয়ার জন্ম আজীবন চেষ্টা করিতেন এবং কৃতকার্য হইতে পারিলে ধন্য হইবেন বলিয়া মনে করিতেন । আমরা যে ভয়ে ভীত ঐ ভয়টিকে, তাঁহারা সর্বাস্তঃকরণে আকাঙ্ক্ষা করিতেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামী পরশ মণি পায়ে ঠেলিয়া দিলেন ! ঐ সকল বুদ্ধির কাষ কি মনের দুর্বলতা তা আমার মত লোকে নাও বুঝিতে পারে, কিন্তু সে যা হউক, ঐ সকল ব্যাপার দ্বারা আমার ন্যায় লোকের মনে বিশেষ ভরসা পাওয়ার সুবিধা হয় । ইহলোক, পরলোক, সংসার, পুনর্জন্ম ইত্যাদি

ত্যাগ করা যখন মুনি ঋষিদের পক্ষেও কঠিন তখন আমাদের এই অতি সাধের সংসার আমাদের মৃত্যুর পরও আমাদেরিগকে ছাড়িবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

আর্য্য ঋষিগণ পরলোক প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা মানুষের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সমূহ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ের আয়ই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করার কোন প্রয়োজনই তাঁহারা দেখিতেন না এবং কোন যুক্তির অবতারণা করেনও নাই। “অচ্ছোভোয়মদা-
হোয়মক্রেত্বোহশেষা এবচ” “নৈনং হিন্দতি শশ্বেন.....”
“ঋবং জন্ম মৃতশ্চ” “ন জায়তে মর্যতে বা...” ইত্যাদি অগণিত ঋষি বাক্য দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাঁহারা এই সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে নিঃসন্দেহ ছিলেন। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা হেতু তাঁহাদের কোন সন্দেহের কারণই হইত না। এ বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করারও কোন প্রয়োজন নাই। গীতাত্তে শ্রীভগবানের বাক্যই রহিয়াছে :—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাশ্চিতম্।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১৫।১০

[জীবাত্মার দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার ব্যাপার এবং দেহে থাকিয়া বিষয় ভোগ করার ব্যাপার জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্পষ্টই দেখিতে পান কিন্তু মোহগ্রস্ত লোকেরা তাহার কিছুই দেখিতে পায় না।]

বাস্তবিক পরলোক ও জন্মান্তর সম্বন্ধে ঋষি বাক্যের

সংখ্যা। এত অধিক এবং ঐগুলি এতই নিশ্চয়াক্ষরিক ও দৃঢ়তা-
বাজক যে পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আরও
কতগুলি উদ্ধৃত করার প্রলোভন হয়। কিন্তু বাহুলা ভয়ে
আপাততঃ ক্ষান্ত হওয়া গেল।

আমি জানি যে আমার ন্যায় লোকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জ্ঞান
হইতেও ঋষি বাক্যের প্রামাণ্য অনেক বেশী। আমাদের দেখা
শুনাতে অনেকরকম ভুল ভ্রান্তি হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এবং
ভুল ভ্রান্তি হইয়াও থাকে, কিন্তু প্রকৃত ঋষিগণ অভ্রান্ত ছিলেন।
তাহারা সাধনা বলে বুদ্ধি বৃত্তিকে এমন উন্নত স্তরে স্থাপন করিয়া
রাখিতেন যে, সেখানে কোনরূপ মিথ্যার প্রবেশ দ্বার পর্যাস্ত
থাকিত না।

যাহারা ভ্রান্তি বশে ঋষিবাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে
এবং তদ্বারা পরলোক ও পুনর্জন্ম বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে সক্ষম
হইতেছেন না, তাহারা ইচ্ছা করিলে অল্প এক দিক হইতে ঋষি
বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন। এ কথা সকলেরই
স্বাকার্য্য যে শুনিয়া শেখা এবং দেখিয়া শেখা অপেক্ষা ঠেকিয়া
শেখাটা অধিকতর মূল্যবান এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।
সেই হিসাবে পরলোক ও জন্মান্তর সম্বন্ধে তাহাদের শিক্ষা যে
নেহাৎ ঠেকিয়া, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সমস্ত
উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা সংক্রান্ত
প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিদের সকলেরই
একমাত্র লক্ষ্য ছিল জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করা অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান

লাভ করা। তাঁহারা কেবল ইহাই জানিতে চাহিতেন “যজ্ঞ্দ্ৰাশ্রা
নেহ ভূয়োগজ্জ্জ্বাতবামবশিয়াতে” (যাহা জানিলে জগতে
জানিবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না) তাঁহারা কেবল
ইহাই লাভ করিতে চাহিতেন “যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে
নাধিকং ততঃ” (যাহা লাভ করিলে অন্য কোন লাভই অধিক
বলিয়া বিবেচিত হয় না) তাঁহারা এমন স্থানে থাকিতে চাহিতেন
“যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেণ গুরুণাপি বিচালাতে” (যেখানে
থাকিলে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই)।
এই সর্বোচ্চ আদর্শের দিকে ধাবমান হইয়া তাঁহারা সংসার ত্যাগ
করিতেন, ব্রহ্মচর্যা পালন করিতেন, মান অপমান, শীত, উষ্ণ,
সুখ দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সকল ত্যাগ করিতেন। অতি লোভনীয়
স্বর্ণ সুখকে পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে তুচ্ছ করিতেন। এইরূপে
অতি সাবধানে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ দেখিতে
পান যে একটু ক্রটি হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ দেহত্যাগ করিতে
হইল এবং পুনরায় কোন মহর্ষি বা রাজর্ষির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ
করিতে হইল। এইরূপ দেহত্যাগ ও পুনর্জন্মের দরুণ তাঁহাদের
স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। দেহত্যাগ ও পুনর্জন্ম প্রত্যক্ষ হইল
পূর্বাভাস বলে পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবারও শেষ
হইল না। এইভাবে বহু জন্ম অতীত হওয়ার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
হইল—পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইল। সাধনার শক্তির বলে
তাঁহারা ঐ সকল জন্ম জন্মান্তরের বিবরণ প্রত্যক্ষ দেখিতে
পাইতেন। শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি বলিয়াছেন যে, আজও

সহস্রাধিক লোক আছেন যাঁহারা তাহাদের বিগত তিন চার কি পাঁচ জন্মের বিবরণ বলিতে সক্ষম। এই ভাবে ভুগিয়া ভুগিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহাতে কোন রূপ ভুল ভ্রান্তি বা বঞ্চনা থাকার কল্পনাও হইতে পারে না।

ঋষিশাস্ত্রে আমরা পাই যে সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি কাল হইতে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। বাষ্টির কক্ষে বাষ্টি ঘুরিতেছে এবং সমষ্টির কক্ষে সমষ্টি ঘুরিতেছে। মানবের ক্ষণিক জীবনে যে সকল ক্ষুদ্র ঘূর্ণন দর্শনযোগ্য, মানব তাহা দেখিতেছে। আর কতকগুলি বৃহৎ ঘূর্ণন সাধারণ মানবের দৃষ্টিশক্তির বাহিরে। ব্রহ্মবিদ ঋষিগণ তাহা দেখিতে পাইয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র আদি যে ঘুরিতেছে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ। তাহারা প্রত্যেকেই নিজে নিজে গড়াইয়া গড়াইয়া ঘুরিতেছে এবং সঙ্কে সঙ্কে অপর এক সুবৃহৎ বৃত্তের পরিধি পরিভ্রমণ করিতেছে। এই পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। কেন ঘুরিতেছে—কাহার বলে ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানি না। আমরা আরও প্রত্যক্ষ পাইতেছি যে বৎসর ঘুরে, ঋতু ঘুরে, দিন ঘুরে, রাত্রি ঘুরে, তিথি ঘুরে, নক্ষত্র ঘুরে, পক্ষ ঘুরে মাস ঘুরে। শুধু কি তাই? শীত ঘুরে, গ্রীষ্ম ঘুরে, সূর্য্যদিন ঘুরে, বর্ষা ঘুরে, আম ঘুরে জাম ঘুরে, ধান ঘুরে, সরিষা ঘুরে। তা ছাড়া আমাদের মন ঘুরে, স্মৃতি ঘুরে, বুদ্ধি ঘুরে ইত্যাদি। একটু অনুধাবনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়; শৈশবের পর কৈশোর, তৎপর যৌবন, ক্রমশঃ প্রৌঢ়

ও বার্কিকা এই ছয়টি অবস্থাও বৃত্তাকারে ঠঠাপড়া করিয়া দেহপাত পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর। ইহা দেহের পরিক্রমণ। ইহা ছাড়া বর্তমান জড়-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে আমাদের দেহের প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত এমন কি সৃষ্টির প্রত্যেকটি পরমাণু অনবরত ঘুরিতেছে।

এই বিরাট রাসলীলার সর্বোচ্চ ঘূর্ণন আমরা দেখিতে পাই না—যে ঘূর্ণনের বেগে অনন্ত কোটি সূর্য্য কল্পনাভীত কাল বাবত অবিশ্রাম ঘুরিতেছে। তদ্বদর্শী ঋষি বলেন,—

“আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্যতু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ৮:১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।

রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তেহহোরাত্র বিদো জনাঃ ॥ ৮:১৭

অব্যক্তাদ্ বাক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংস্কৃতে ॥ ৭:১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়াং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ! ৮:১৯

[মহর্ষি ব্যাস কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীভগবানের বাক্য এই সকল। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন :—

“হে অর্জুন ভুলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোক হইতেই জীব ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। একমাত্র আমাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সেই পুনর্জন্মের নিবৃত্তি। ১৬

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগকে একযুগ ধরিয়া ঐরূপ এক হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। এবং তৎপর ঐরূপ সহস্র যুগ পরিমাণ সময় ব্যাপিয়া এক রাত্রি হয়। ঐরূপ দিবারাত্রি অনন্তকাল ঘুরিতেছে। ঐরূপ দিবারাত্রির জ্ঞান যাহাদের আছে তাহাদিগকেই প্রকৃত অহোরাত্রিবেত্তা বলিয়া গণ্য করা যায়। ১৭

দিবার আগমনে অব্যক্ত (প্রকৃতি) হইতে সম্পূর্ণ সৃষ্টি ব্যক্ত হয়। যত সময় দিবা থাকে তত সময় সৃষ্টিও প্রকটিত থাকে। আবার রাত্রি আসিলে ঐ সৃষ্টি অব্যক্তে বিলীন হয়। ১৮

হে পার্থ, এই সেই ভূতগণই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয়প্রাপ্ত হয় দিবা সমাগমে আবার অবশ ভাবে (অর্থাৎ স্ব স্ব কর্মফলের বশীভূত হইয়া) প্রাভুভূত হয়। ১৯]

কি বিরাট ঘূর্ণন লক্ষ্য করুন। সত্যযুগ ১৭২৮০০০ বৎসর ত্রেতাযুগ ১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর যুগ ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগ ৪৩২০০০ বৎসর। এই চারিযুগ একত্রে ৪৩২০০০০ বৎসর। এইরূপ এক হাজার চতুর্যুগে ৪৩২০০০০০০ বৎসর। অতএব ব্রহ্মার একটী মাত্র দিবা হইতে আমাদের প্রচলিত পরিমাণে চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসর। ইহাকেই কল্প বলা হয়। তারপর প্রলয় হইয়া সব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। সেই বিলীন অবস্থায় অব্যক্ত থাকা সময়কে ব্রহ্মার রাত্রি বলে। সেই রাত্রির পরিমাণ ও দিবার সমান। এইরূপে

দিবার পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবা অনন্তকাল যাবত চলিতেছে।

বর্তমানে যে দিবা চলিতেছে তাহার পরিমাণের একটা হিসাব বরা যাক। প্রতি কল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার ১ দিনে ১৪টি মন্বন্তর হয়। এক হাজার চতুর্যুগে এক দিন; কাজেই $১০০০ \div ১৪ = ৭১\frac{৩}{৭}$ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। বর্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ইহাতেও ১৪টি মন্বন্তর শেষ হইলে কল্প শেষ হইবে। এখন সপ্তম বৈবস্বত মন্ত চলিতেছে। ইহার অন্তর্গত $৭১\frac{৩}{৭}$ চতুর্যুগ আন্দরে ২৭ চতুর্যুগ চলিয়া গিয়াছে। ২৮শ চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে। এই কলিযুগ চলিয়া গেলে এই মন্বন্তরেই আরও ($৭১\frac{৩}{৭} - ২৮$) ৪৩ $\frac{৩}{৭}$ চতুর্যুগ বাকি থাকে। মন্বন্তর বাকি থাকে আরও ($১৪ - ৭$) ৭টি। ৭ মন্বন্তর $= ৭১\frac{৩}{৭} \times ৭ = ৫০০$ চতুর্যুগ। তাহার সঙ্গে বর্তমান মন্বন্তরের ৪৩ চতুর্যুগ একত্র করিলে মোট ৫৪৩ চতুর্যুগ হয়। এক চতুর্যুগে ৪৩২০০০০ বৎসর। অতএব $৪৩২০০০০ \times ৫৪৩ = ২৩৪৫৭৬০০০০$ বৎসর অর্থাৎ বর্তমান কলিযুগ শেষ হওয়ার পর আরও দুইশত চৌত্রিশ কোটি সাতান্ন লক্ষ ষাট হাজার বৎসর পর প্রলয় হইবে। কত প্রকাণ্ড চক্র লক্ষ্য করুন।

ঋষিগণ বলেন যে জীব জগতের অবস্থাও ঠিক একই প্রকারের। কল্পারম্ভে জীবসমূহ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উদ্ভিত হইয়া প্রথমতঃ হিরণ্য বা আমন্দময় কোষ পরিগ্রহ করতঃ তাহাতে অবস্থান করে। তৎপর জ্ঞানময় কোষ তাহাতে সংযুক্ত

হয় এবং তখন জ্ঞানরাজ্যে বাস করে। পরে যথাসময়ে ক্রমশঃ মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ যোগ হইয়া যথাক্রমে স্বর্গরাজ্যে, প্রেতরাজ্যে ও ভুলোকে বাস করে। এইরূপে চক্রাকারে উর্দ্ধ হইতে নামিয়া আসিয়া পুনরায় প্রথমতঃ অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করতঃ অপর কোষগুলি লইয়া প্রেতলোকে যায়। পৃথিবীর লোকে ইহাকেই মৃত্যু বলে। কালক্রমে আবার প্রাণময় কোষটি পরিত্যাগ করে। তাহাকে প্রেতলোকের মৃত্যু বলা যাইতে পারে। ঋষিশাস্ত্র মতে ইহাকে প্রেতত্ব পরিহার বলা হয়। তখন কেবল মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ লইয়া স্বর্গলোকে থাকে। তথায় কিছুকাল থাকার পর পুনরায় মনোময় কোষ পরিত্যাগ করতঃ তদূর্দ্ধ লোকে যায়। এইভাবে চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূ, ভুব, স্ব, প্রভৃতি লোক-সমূহে উঠানামা করিতে থাকে। প্রত্যেক কল্পে এইরূপ কতবার ঘুরিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কল্পশেষ হইলেই যে সব শেষ হইল তাহাও নহে, কল্প শেষ হইলে পরবর্তী এক কল্প পরিমাণ সময় বিশ্রাম মাত্র ; বিলুপ্তি নহে। বিশ্রাম সময়টাতে সমস্ত জীব নিজ নিজ কর্মফলের বীজ লইয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া থাকে। তখন কোনরূপ সাড়াশব্দ নাই। সেই সুদীর্ঘ রজনীর অবসান হইলে পুনরায় বিশ্ব প্রকট হওয়ার সময় ঐ সকল বীজ নিজ নিজ কর্মফলানুযায়ী অবস্থা লইয়া আবির্ভূত হয় এবং পুনরায় অগণিত জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করতঃ কল্পক্ষয়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপচ্চতে ।

বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা শুদ্ধলভঃ ॥”

বহু জন্ম পরে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই অর্থাৎ সবই জগদীশ্বর এই জ্ঞানের প্রকৃত উপলব্ধি হইলেই মুক্তি হইবে। এইরূপ জ্ঞান লাভের উপযুক্ত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। জ্ঞানলাভ ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায়ও নাই। পুণ্য কাজে পুণ্যফল ভোগ করার জন্য থাকিতে হয়। পাপ কাজে পাপের ফল ভোগ করার জন্য থাকিতে হয়। জ্ঞান হইলে পাপ পুণ্য উভয়ই বিদূরিত হয়। সেই জ্ঞান লাভ করার প্রণালী নানা প্রকার। ধ্যানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিয়োগ, জ্ঞানযোগ আদি নানা প্রকারে বহু কালের চেষ্টায় জ্ঞানলাভ হয়। তজ্জন্মই আর্য্য ঋষিগণের সঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এমন কি নাস্তিকতার পর্য্যন্ত বিরোধ নাই। নাস্তিকেরা কর্মযোগী। তাঁহারা সংকাজ করেন। জগতের হিত হয় এমত কর্ম্ম তাঁহারা অবিরতই করিতেছেন। বহু জন্ম পরে এই প্রণালীতেই তাঁহাদের জ্ঞান হইবে। খ্রীষ্টান, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ই ভক্তিয়োগ অবলম্বন করিয়া আছেন। ভক্তির চরম অবস্থাটাই জ্ঞান। ঐ পথে অগ্রসর হইতে পারিলে আপনা হইতেই জ্ঞান আসিবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন “মত পথ” অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত মুক্তিলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। ভক্তরাজ পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব্ব বিশ্বনাথের স্তুতি করা উপলক্ষে বলিয়াছেন,

“রুচিনাং বৈচিত্রাদজুকুটীল নানা পথযুগাং ।

নৃনামেকো গমাস্তমসি পয়সামৰ্ণব ইব ॥”

জলশ্রোতসমূহ যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইলেও চরমে গিয়া মহানাগরেই পতিত হয় সেইরূপ রুচির বৈচিত্র্য বশতঃ লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে উপাসনা করিলেও সেই উপাসনা একনান্ন জগদীশ্বরেই উপনীত হয়। ভাবের উদারতা প্রশংসনীয়।

যা হউক আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করা যাক। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি সেই মৃত্যুতে জড় দেহটি অর্থাৎ অন্নময় কোষটি মাত্র চলিয়া যায়। এই জড় দেহ ভাগের পরও জীব থাকিয়া যায়। এই জীবের উপাদান সম্বন্ধে পঞ্চদশীতে এরূপ বর্ণিত আছে :—

“চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গ দেহশ্চ যঃ পুনঃ ।

চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংজ্ঞা জীব উচ্যতে ॥”

[তিনটি জিনিষের সম্বন্ধ (একত্রিত) অবস্থাকে জীব বলা হয়। (১) অধিষ্ঠিত চৈতন্য, (২) লিঙ্গদেহ, (৩) লিঙ্গদেহস্থিত চিচ্ছায়া ।]

(১) অধিষ্ঠিত চৈতন্য হইতেছে পরা প্রকৃতির (সাংখ্যোক্ত-পুরুষের) স্কুলিঙ্গবৎ ক্ষুদ্র অংশ, যাহা জীবদেহের প্রভু বা কর্তা।

(২) লিঙ্গদেহ হইতেছে ১৮ টা তত্ত্বের সমষ্টি ।

(ক) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ... ৩

(খ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় :— (সূক্ষ্ম) চক্ষু, কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা ও হৃৎ ... ৫

(গ) পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় :— (সূক্ষ্ম) বাক্, পাণি,
পাদ, বায়ু, উপস্থ ... ৫

(ঘ) পঞ্চ তন্মাত্র :— ক্ষিতি তন্মাত্র (গন্ধ)
অপ তন্মাত্র (রস), তেজ তন্মাত্র (রূপ)

মরুৎ তন্মাত্র (বর্ণ) এবং ব্যোম তন্মাত্র (শব্দ) ৫

১৮

উপরি-উক্ত অষ্টাদশ তত্ত্ব সজ্জবদ্ধ হইয়া যে দেহে থাকে তাহাতেই আনন্দময়, জ্ঞানময়, মনোময় এবং প্রাণময় কোষ থাকে। এই কোষগুলি জড়দেহযুক্ত সাধারণ মানবের অদৃশ্য। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ এই লিঙ্গদেহ দেখিতে পান। ইহার চেহারা অবিকল স্থূল দেহের ন্যায়।

(৩) লিঙ্গদেহের সঙ্গে চেতনার ছায়াস্বরূপ আর একটা জিনিষ আছে। ইহা আসলে জীবচৈতন্য নয়। ইহার কোনরূপ জ্ঞান বুদ্ধি নাই অথচ অভ্যাস মতে কাজ করিয়া যায় বলিয়া চেতনার ন্যায় দেখায়। ইহাকে চিচ্ছায়া বলা হয়। নিদ্রাবস্থায় অধিষ্ঠিত জীবচৈতন্য দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় কিন্তু তদবস্থায়ও স্থূলদেহে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, রক্ত সঞ্চালনাদি চলে, পরিপাক

ক্রিয়াদিও চলিতে থাকে। যে শক্তি ঐ সব কাজ চালায় তাহা জীবাগ্নির চেতনা নহে। ইহাকেই চিচ্ছায়া বলা হইয়াছে।

প্রত্যেক মানুষেতেই যে উপরি-উক্ত লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহ রহিয়াছে তাহা অনুভব করা খুব কঠিন নয়। একটু অনুধাবনা দ্বারাই ইহার প্রতীতি হইতে পারে। কিন্তু স্থূল দেহের আশ্রয় ভিন্ন এই সূক্ষ্ম দেহটি পৃথকভাবে থাকিতে পারে কিনা এ বিষয়েই সচরাচর আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার কারণ হইতেছে এই যে আমরা ঐ সূক্ষ্ম দেহটি সাধারণ চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহার কথা শুনিতে পাইনা, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—ইহা পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সহজ ভাবে নিতান্তই অসম্পূর্ণ। আমরা দ্রষ্টব্য বিষয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিতে পাই, শ্রোতব্য বিষয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র শুনিতে পাই, আত্মাতব্য বিষয়ের একটা ক্ষুদ্র অংশের মাত্র ভ্রাণ পাই ইত্যাদি। ইহা জড়-বিজ্ঞান সম্মত এবং অবিশ্বাস করার কারণ নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও বস্তুর অস্তিত্ব লোপ হইতে পারেনা। তদ্রূপ আশঙ্কা করাও অর্যোক্তিক। আমরা ক্ষুদ্র জিনিষ দেখিতে পাইনা আবার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইলেই দেখিতে পাই। অতি দূরবর্তী বৃহৎ জিনিষও দেখিতে পাইনা, আবার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিলেই দেখিতে পাই। সহজ চক্ষে সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক একটু সূক্ষ্ম ধরণের স্থূলবস্তুই

আমরা দেখিতে পাইনা। আমরা বরফ দেখিতে পাই, জল দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ জল বাষ্পাকার ধারণ করিলেই আর দেখিতে পাই না। আমরা বায়ু দেখিতে পাই না, উত্তাপ দেখিতে পাই না, আরও কত কিছুই দেখিতে পাই না।

ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছি যে মানুষ সুদৃঢ় পুরুষকার প্রয়োগে সাধনা করিয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে অসাধারণরূপে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। যদিও আমরা তাহা করিতে পারি নাই, বর্তমানে ও অতীতে অনেক মহাপুরুষ তাহা করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় নিশ্চিতরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। এ অবস্থায়—

“দেহীনোন্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহতি ॥”

ইত্যাদি ঋষিবাক্যে সন্দেহ হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে?

নিজ কস্মদৌষে নিশ্চিন্ত হওয়ার বা শান্তিলাভ করার অনধিকারী বলিয়া ঋষিবাক্যেও যদি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস না হয় তবে হৃদমনীয় পুরুষকার দ্বারা কস্মৎক্ষয় করিতে হইবে। একাগ্রতা ও ব্যাকুলতার সহিত অনুধাবনা করাও পুরুষকার। চলুন আমরা একাগ্রতার সহিত আমাদের নিদ্রাবস্থা সম্বন্ধে অনুধাবনা করি। স্বপ্নগুলি সব সময় অমূলক চিন্তা মাত্র নয়। আর যদি অমূলক চিন্তা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায় তথাপি স্বপ্ন হইতে আমরা কয়েকটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। দেহটী

বিজ্ঞানায় পড়িয়া রহিল। স্বপ্নে দেখিলাম এক হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে গিয়াছি। বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল—আলাপ আলোচনা হইল, ত্রয়ত সন্দেশ খাওয়া হইল, মিষ্ট লাগিল। মনে রাখিবেন, দেহটী বিজ্ঞানায়ই আছে। চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, ইহারাও বিজ্ঞানায়। বন্ধু বান্ধবকে দেখিলাম কিরূপে? এদের কথা শুনিলাম কিসের দ্বারা? মুখ ছাড়া খাইলাম বা কিরূপে? জিহ্বা ছাড়া মিষ্ট লাগিল কিসে? ধরিয়া লওয়া গেল মূলতঃ ঐ সকলই মিথ্যা, কিন্তু স্বপ্ন থাকা সময়ে ঐ সকল অনুভূতি যে আসিয়াছিল তাহা ত মিথ্যা হইতে পারেনা। স্বপ্ন থাকা পর্য্যন্ত দেখা, শুনা, আলাপ, সন্দেশ খাওয়া, মিষ্ট লাগা ইত্যাদি সবই সত্য ছিল। ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে স্বপ্নসময়ে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এই আঠারটি তত্ত্ব সঙ্গে লইয়া সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ ছাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে স্থূল দেহের আশ্রয় ছাড়াও সূক্ষ্ম দেহ টিকিয়া থাকিতে পারে। কাজেই দেহত্যাগের পর সূক্ষ্ম দেহ বর্তমান থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ নাই।

নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম দেহ চলিয়া গেলেও জড়দেহ রক্ষা করার জন্য “চিহ্নায়া” নামক একটি আভাসচৈতন্য দেহে থাকে কিন্তু মৃত্যু হইলে সেই চিহ্নায়া পর্য্যন্ত চলিয়া যাওয়ায় দেহটী আর টিকিয়া থাকিতে পারেনা। পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। তখন দেহী অর্থাৎ জীব জড়দেহহারা হইয়া জীবিত লোকের জড় দেহের

উপর কোনরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না। জীবিত লোকের সূক্ষ্ম দেহকে দেখিতে পারে, তাহার সূক্ষ্ম দেহ সংক্রান্ত কথা শুনিতে পারে, সূক্ষ্ম দেহকে স্পর্শও করিতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ জড়দেহধারী জীবিত লোকের সূক্ষ্ম দেহটী জড়দেহ বিজড়িত অবস্থায় জড় জগৎ লইয়া নিতান্ত বিভ্রান্ত ও বিবর্ত থাকায় মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম দেহের ইঙ্গিত অনেক স্থলেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রিয় পরিচালনার জ্ঞান জড় দেহের উপযোগী যে কয়েকগু ইন্দ্রিয় যন্ত্র ছিল, জড়-দেহের সঙ্গে তাহা চলিয়া যাওয়ায় মৃত ব্যক্তি জড়দেহধারী লোককে কোন কথা শুনাইতে পারেনা, দেখা দিতে পারে না, কোন কিছু বুঝাইতে পারেনা। অপরদিকে মৃত ব্যক্তি জীবিত লোকদিগকে দেখিতে পায়, তাহাদের কথা শুনিতে পায়, তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে, জড় বস্তুর স্বাদ পায়, গন্ধ পায়—মোটের উপর জড় দেহ চলিয়া যাওয়া হেতু তাহার নিজের কিছুই অভাব হয়না। জড় দেহ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রোগসমূহ এবং সর্বপ্রকারের ব্যথা বেদনা চলিয়া যায়। তখন ভুলোক ও প্রেতলোকের যে কোন স্থানে অবাধে যাতায়াত করিতে পারে। স্থানের বা কালের দূরত্ব থাকে না। ইচ্ছা মাত্রে মহাসাগর পার হওয়া যায়। দরজা জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দেওয়াল ভেদ করিয়া দালানে প্রবেশ করা যায়। তখন কেবল স্ব বা স্বর্গ, মহ, জন, তপ ও সত্যলোকে যাইতে পারে না। অর্থাৎ ঐ সকল লোকের অনুভূতি পায় না।

কারণ প্রেত দেহটা ঐ সকল লোকের হিসাবে নিতান্ত স্থূল দেহ।

মৃত ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রীতি, ভালবাসা, হিংসা, ঘৃণা আদি সবই বর্তমান থাকে। মোটের উপর প্রেত দেহটা স্থূল দেহ অপেক্ষা অনেক অংশে সুখ ও সুবিধাদায়ক। সেখানে আত্মীয় স্বগণ ও বন্ধু বান্ধবের অভাব নাই। আমোদ আহ্লাদের উপকরণ যথেষ্ট আছে। মারীভয়, রাজভয়, চৌরভয় বা অগ্নিভয় আদি কিছুই থাকে না। নৌকা ডুবি, জাহাজ ডুবি, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ আদির কোন ভয় নাই। বাঘ, ভল্লুকাদি কোনরূপ হিংস্র জন্তু হইতেও কোন উৎপাতের আশঙ্কা নাই। যন্ত্রণার মধ্যে কেবল নিজের কুকর্মে'র ফলস্বরূপ কতগুলি যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। যেমন মদ্যপায়ীর মদ্যপানের অসামর্থ্য জনিত যাতনা, ইন্দ্রিয়পরায়ণদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করার অক্ষমতা প্রযুক্ত যাতনা, হিংস্রদের প্রতিহিংসা প্রাপ্তিজনিত যাতনা ইত্যাদি। অল্প ভোগেই আবার ঐ সকল কুকর্মে'র ফলগুলিও ক্ষয় হইয়া যায়। পার্থিব জীবন ধারণোপযোগী সমস্ত আয়োজন জগদাশ্বরই করিয়া রাখিয়াছেন, পরলোকও তাঁহারই রাজ্য; সেখানেও তাঁহারই করুণা অবিরাম বর্ষিত হইতেছে।

প্রেতলোকের উপযোগী নিজ কর্মফলানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেত দেহটাও অন্তর্হিত হয়। সাপের খোলস ত্যাগ করার ণায় ইহাতে কিছুই যন্ত্রণা নাই। তখন পিতৃলোকের দেহ লইয়া অধিকতর সুখ শান্তির সময় যাপন করে।

তাহার পর আবার পিতৃলোকের উপযোগী দেহ তাগ হইয়া স্বর্গীয় দেহ অর্থাৎ মহোন্নয় কোষ উন্মুক্ত হয়। ইহা আরও অনির্বচনীয় সুখশান্তিদায়ক। স্বর্গ সুখ হইতে অধিক সুখ কি হইতে পারে তাহা ধারণা করিতে পারি না কিন্তু ঋষিগণ বলেন যে তদূর্দ্ধ লোকে আরও অধিকতর সুখশান্তি আছে যাহার সঙ্গে স্বর্গ সুখের তুলনাই হয় না।

মহাত্মা গান্ধীর ১৯৩৩ইং ৮ই মে হইতে ক্রমাগত একুশ দিন বাপী অনশন সংকল্প প্রচারিত হওয়ামাত্র সমস্ত পৃথিবী উদ্বেগাকুল হইয়া উঠে এবং মহাত্মাজীর ঐ নিদারুণ সংকল্প পরিত্যাগ করার জন্ত করুণ আবেদনপূর্ণ অজস্র টেলিগ্রাম ও চিঠি আসিতে থাকে। ঐ সকল চিঠি পত্রের উত্তরে মহাত্মাজী “হরিজন” পত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করা যাইতেছে। ইহাতে দেহত্যাগ ও পরলোক সম্বন্ধে মহাত্মাজীর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

“আমল অনশন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্ত জেনারেল স্মাট্‌স্ আমাকে এক করুণ আহ্বান জানাইয়াছেন। ডাঃ আনসারী ইতিপূর্বেই আমাকে অবিচ্ছেদ্য স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। একজন সহকর্মীরূপে ও একজন চিকিৎসকরূপে আমাকে আমার পণ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আমারই বিবেক ও চিন্তাধারার অনুবর্তী শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারী এক খানা তारे আমার উপবাসের ভিত্তিমূলকে আক্রমণ করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিগত কাতর আবেদন নিবেদনের

সঙ্গে আমার কনিষ্ঠ পুত্র ও শক্তিমান সহকর্মী দেবীদাস গান্ধীর অশ্রুধারা সংযুক্ত হইয়াছে। এই সকল তীব্র আকর্ষণ যখন আমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই—তখন পাঠকগণ অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারিবেন যে এমন একটা শক্তির উদ্ভব হইয়াছে যাহা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে এবং এই সকল প্রবল আকর্ষণ হইতে আমাকে টানিয়া রাখিতেছে। এই অনশন যে ভগবৎনির্দিষ্ট, আমার এই দাবীতে বিগ্নাসশীলতার অভাবই যে এই সকল আবেদন নিবেদনের মূল, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি এ কথা বলি না যে উঁহারা আমার কথা বিশ্বাস করেন না।.....অনশন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমি অনশন গ্রহণ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করি নাই। ভগবৎনির্দেশ শ্রবণের যে দাবী আমি করিয়া থাকি, উহা নূতন নহে—আমার ঐ দাবী সপ্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় হইল উহা কার্যের মারফৎ সপ্রমাণ করা। ভগবানের অস্তিত্ব যদি ভগবৎসৃষ্ট জীবের প্রমাণ সাপেক্ষ হয় তাহা হইলে ভগবানের আর ভগবানত্ব থাকে না। ভগবান তাঁহার অনুগত সেবককে কঠোর পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি দান করিয়া থাকেন। অন্যান্য অর্ধ শতাব্দী যাবত আমি এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রভুর অনুগত সেবক হইয়াই আছি। যতই দিন যাইতেছে তাঁহার বাণী আমার কর্ণে অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আমার অতি ছুঃসময়েও তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নাই। অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে বহুবার তিনি আমাকে রক্ষা করিয়া-

ছেন এবং আমার মধ্যে অহংজ্ঞানের লেশমাত্র রাখেন নাই। যত বেশী পরিমাণে নিজেকে আমি তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দিতে পারিয়াছি ততই অধিকতর আনন্দের আশ্বাদ আমি পাইয়াছি। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, কালে আমার এই সকল প্রিয় বন্ধুগণ আমার এই সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।.....

এ কথা মনে করিতেও কষ্ট হয় যে সাময়িক আবাসস্থল পঞ্চভৌতিক দেহ বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে মানবের সেবা-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে যে, রামকৃষ্ণ, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ ও রামতীর্থ প্রভৃতি পরলোকগত মহাত্মাদের বিদেহ-শক্তি এখনও আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছেন? পঞ্চভৌতিক দেহে যখন উঁহারা আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছিলেন হয়ত বা তখন অপেক্ষা এখন অধিকতর শক্তিমানরূপেই উঁহারা আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সংজনের কৃতকর্ম কখনো তাহার পঞ্চভৌতিক দেহ বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় না।.....আমি জেনারেল স্মার্টস্ বা অপরাপর বন্ধুগণকে আমার এ কথা বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি যে কোন মতিবিভ্রমের বশবর্তী হইয়া আমি কাজ করিতেছি না। আমি তাঁহাদিগকে ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা জানাইতে অনুরোধ করিতেছি যে ভগবান যেন আমাকে এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সামর্থ্য দান করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই জগতের অন্তিমাত্র সেবার জন্ত যদি আমার বাঁচিয়া থাকার

প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে আমার চিকিৎসক বন্ধুগণের এত উদ্বিগ্ন আশঙ্কা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই তিনি আমার জীবন রক্ষা করিবেন।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরলোকের সন্ধান

আমরা জন্মাবধি পৃথিবীর জল বায়ুতে জীবন ধারণ করিতেছি। পার্থিব বিষয় বাসনাতে মত্ত। মৃত্যুর পর পরলোকে যাইতে হইবে বলিয়া শুনি। জন্মের পূর্বে আমরা ছিলাম কি না জানি না—অন্ততঃ মনে নাই। মৃত্যুর পর থাকিব কি না তাহাও নিশ্চয় বুঝিতেছি না। আমাদের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যেই আমাদের যা কিছু চেষ্টা চরিত্র। সেই মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ পার্থিব বিষয়ের অতিরিক্ত কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছে না। এ অবস্থায় পরলোকের সন্ধান পাওয়ার আমাদের কোন উপায় আছে কি ?

প্রশ্নটি নূতন নয়। অনাদি কাল হইতে এই গুরুতর সমস্যা মনুষ্য সমাজকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছে, এবং পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল সময়ের মনিষীগণের যুগযুগান্তকালব্যাপী প্রচেষ্টায় ঐ প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে। শুধু সমাধান নয়, পরলোক দেখা গিয়াছে—পরলোকবাসীর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে—পরলোকে যাতায়াত করাটা নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে বিষয়টা এত সোজা হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সর্বসাধারণের মনে পরলোক সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হয় না

কেন ? একটা সাধারণ ব্যাপার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। অনূন ২০ বৎসর হইল গ্রামোফোন—যাহাকে প্রচলিত ভাষায় কলের গান বলা হয়—আবিষ্কৃত হইয়াছে। অর্থশালী লোকে ক্রয় করিয়া দুঃখফেননিভ শয্যায় স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পরিবৃত হইয়া মনের সুখে গান শুনিতেছে। দরিদ্র লোকে বাহিরে থাকিয়া জানালার দিকে উকি দিয়া দুই একটা গান শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কি কারণে বা কি সন্ধানে কলেতে ঐরূপ গান হয় সেই তথ্যের সন্ধান কেহ করে কি ? অনেকে সেইটা আবশ্যক বলিয়াই মনে করে না। অল্প কয়েকজন কৌতূহলাক্রান্ত হইলেও তাহাতে যে পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ এবং সাধনার প্রয়োজন হয় তাহা করিতে নারাজ। ধনী থাকে ধনের চিন্তায়, দরিদ্র থাকে দারিদ্র্যের চিন্তায় ব্যস্ত। জ্ঞান লাভের চিন্তা কে করিবে ?

পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। জ্ঞানীগণ উচ্চৈঃস্বরে পরলোক তত্ত্ব প্রচার করিয়া যাইতেছেন। ধনীগণ চোখে চশমা দিয়া এবং হাতে রিষ্ট্-ওয়াচ বাঁধিয়া, দরিদ্রগণ কাঁধে ভার লইয়া গান শুন্যার মত শুনিয়া যাইতেছেন। বাড়ীতে কাহারো হয়ত স্ত্রী-পুত্রের অসুখ কিম্বা উপযুক্ত কণ্ঠা পাত্রস্থা করার অসামর্থ্য-প্রযুক্ত গৃহিণীর গঞ্জন ! পরলোকের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ কোথায় ?

দার্শনিক খুটিনাটির ভিতরে প্রবেশ না করিয়াও আমরা যদি কেবল মোটামুটি ভাবে মনুষ্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য করি তবে

অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারি যে একটু চৈতন্য—একটু অনুভূতি লইয়াই আমাদের বান্ধিত। এই চৈতন্যটুকুর—এই অনুভূতি-টুকুর মূল কোথায় তাহা ভাবিবার বিষয়। গীতাতে শ্রীভগবানের উক্তি রহিয়াছে, “ভূতানামস্মি চেতনা”—আমিই সর্বভূতের চেতনা। শুধু কি তাই? “অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে”—সমস্ত উৎপত্তির কারণ আমি, আমি হইতে সব হইতেছে। সহজ বুদ্ধিতেই কথাটা সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা আবশ্যক।

এখন দেখা যাউক, ঐ চেতনা, ঐ অনুভূতি কোথায় কোথায় থাকে। আমরা শৈশবে পড়িতাম, “পদার্থ তিন প্রকার ;—চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ।” ঐ পড়ার দ্বারা বিদ্বান হইয়া আৰ্য্য ঋষিগণের প্রবর্তিত নৈবেদ্যের পূজা, মধুপর্কের পূজা, আসনের পূজা ইত্যাদি অচেতন পদার্থের উপাসনা ও অর্চনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতাম এবং ঐগুলিকে তাক্সিলোর সহিত অবজ্ঞা করার পক্ষে আমার তৎকালিক অর্জিত বিদ্যাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানার্চা স্মরণ অলিভার লজ্জ ও ফ্রেডারিক মায়ার্সের মন্তব্য শুনিয়া লজ্জিত হইয়াছি। তাঁহারা যখন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চেতনা আছে—অনুভূতি আছে, পৃথিবীর চেতনা আছে, অনুভূতি আছে, আমরা যাহাকে অচেতন পদার্থ বলি তাহারও চেতনা আছে, অনুভূতি আছে, এমন কি প্রাত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত চেতনা আছে, অনুভূতি আছে, তখন আর অবজ্ঞাভরে কথাটা উড়াইয়া দেওয়ার সাহস

হইল না। বর্তমানে লজ্জা ভয়ের কারণ সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছে। অচেতন বলিয়া কোন পদার্থ নাই তাহা সভ্য জগতে সর্ববাদী-সম্মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা যাইবে না যে চেতনা ও অনুভূতির বিকাশ সর্বত্র সমান। একটা ধূলিকণার চেতনা ও একটা গাছের চেতনায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। আবার একটা গাছের সঙ্গে একটা পাখীর তুলনা হইতে পারে না। পাখীর সঙ্গে আবার মানুষের চেতনার তুলনা নাই। মানুষে মানুষে আবার চেতনা ও অনুভূতি বাপারে পর্বত প্রমাণ পার্থক্য রহিয়াছে। রামা শ্যামার চেতনা ও অনুভূতির সঙ্গে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের চেতনা ও অনুভূতির তুলনা হইতে পারে না। এই সকল বিষয় আমাদের সহজ বুদ্ধির গোচর।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যিক যে মানুষ মাত্রেই জ্ঞান বুদ্ধির বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু ঐ সকল সহজাত বীজসকলের মধ্যে হিমালয় প্রমাণ পার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শীতা লইয়া, কেহ গণিত শাস্ত্রের কেহ বা দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ সংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষই দেখা যায়। পূর্বজন্ম সহস্রে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক আপাততঃ এইটুকু জানিয়া রাখা আবশ্যিক যে ঋষিগণ বলেন পূর্ব জন্মের উপার্জিত জ্ঞানই ঐ পার্থক্যের হেতু।

আর একটা বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণনা করা গিয়াছে। স্মরণার্থ পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে যে আমাদের অনুভূতির দ্বারস্বরূপ চক্ষু কণ্ঠ আদি ইন্দ্রিয়গুলি উদ্দেশ্যানুরূপ শক্তিশালী নহে। রক্ত

মাংসের চাপে পড়িয়া ঐগুলি যেন মলিন কাচখণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন হইয়া আছে। আমরা দ্রষ্টব্য বিষয়ের অর্দ্বৈক্যও দেখি না—শ্রোতব্য বিষয়ের অর্দ্বৈক্যও শুনি না, এইরূপ সর্বত্র।

ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন হইলেও যথোচিত চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা ইহাদের শক্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত করা চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ—কাস্মীরের ও পাঞ্জাবের তন্তুবায়গণ তাহাদের তন্তু-গুলিকে নানা প্রকার সূক্ষ্ম বর্ণে রঞ্জিত করার অভ্যাস করতঃ দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর করিয়াছে যে বর্ণের অতি সামান্য পার্থক্য পর্য্যন্ত অতি সহজেই তাহাদের চক্ষে ধরা পড়ে, কিন্তু অনভ্যস্ত লোকে তাহা ধরিতে সক্ষম হয় না। একজন সুদক্ষ চিত্রকর একটা লোককে একবার দেখিয়াই তাহার অবিকল চেহারা অঙ্কিত করিতে সক্ষম হয়। যথোচিত সাধনা ব্যতীত সাধারণ চিত্রকর তাহা করিতে অক্ষম। প্রস্তর খুদিয়া যাহারা প্রতিকৃতি নিম্নাণ করে তাহাদের মধ্যে সুদক্ষ ব্যক্তির প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ডের ভিতরে তাহাদের অভিস্পিত প্রতিকৃতি দেখিতে পায়। সেই প্রতিকৃতির বহির্ভূত প্রস্তরাংশ তাহাদের চক্ষে আবর্জনার ন্যায় প্রতিভাত হয়। আবর্জনাস্বরূপ অতিরিক্ত প্রস্তরাংশ তাহারা ক্ষিপ্ততার সহিত খুদিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। এই সমস্তই সাধনার ফল। শ্রবণ শক্তি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। একজন সুবিখ্যাত গায়কের শ্রবণ শক্তি ও একজন সাধারণ লোকের শ্রবণ শক্তিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ ; যদিও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েরই এক প্রকার। একটু

অনুধাবনা করিলেই দেখা যাইবে যে আমাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়-কেই সাধনা দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী করা যায়।

মনও আমাদের একটা ইন্দ্রিয়। সে সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা। সাধারণ বুদ্ধিতে অনেক সময় মনকেই আসল মানুষ অর্থাৎ ‘আমি’ শব্দবাচ্য বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মন ‘আমি’ নহে। কথায় বলে যে আমার মন অর্থাৎ “আমি” শব্দ বাচক আর একটা বৃহৎ শক্তি রহিয়াছে, যে মনটাকে তাহার মালিকী বলিয়া দাবী করে। ঐ শক্তির এমন ক্ষমতা রহিয়াছে যদ্বারা মাহত হস্তী পরিচালনা করার ন্যায় সে মনকে পরিচালনা করিতে পারে।

উপরের লিখিত সহজবোধ্য বিষয়গুলি স্মরণ রাখিয়া চলুন আমরা একটু নিবিষ্ট চিন্তে মূল বিষয়টা অনুধাবনা করি। এখানে মূল বিষয়টা লওয়া হইতেছে এই যে ‘আমি’ শব্দদ্বারা যে অনুভবকর্তা অর্থাৎ জ্ঞাতার ধারণা হয়, সেই ‘আমি’র জ্ঞান বা অনুভূতি কি ভাবে উৎপন্ন হয়। বিষয়টা খুব কঠিন কিম্বা দুর্বোধ্য নয়। কোন একটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ের যদি সংযোগ হয় এবং ঐ সংযোগে ইন্দ্রিয়ের রাজা মন যদি লিপ্ত হয়, তবেই ঐ বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের অনুভূতি জন্মে। যেমন, চক্ষু একটা ইন্দ্রিয়, বটবৃক্ষ তাহার বিষয়। বটবৃক্ষটী চক্ষুর সামনে পড়া চাই। ঐ ব্যাপারে মনেরও লিপ্ততা চাই। তাহা হইলে ‘আমি’র মধ্যে বটবৃক্ষ দর্শন জ্ঞানের অনুভূতি জন্মিবে। কর্ণ কিম্বা নাসিকার সম্মুখে বটবৃক্ষ থাকিলেও সেই জ্ঞান হইবে না, কারণ বটবৃক্ষ শ্রবণেন্দ্রিয় বা স্রাণেন্দ্রিয়ের

বিষয় নয়। আবার মন যদি অণু বিষয়ে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞান হইবে না। কারণ মনের মারফত ভিন্ন অণু কোন ইন্দ্রিয় নিজ ক্ষমতায় ‘আমি’র নিকট কোন সংবাদ পৌছাইতে পারে না। আবার চক্ষু যদি না থাকে মনের এমন সাধ্য নাই যে সে বটগাছটি দেখিতে পারে কিম্বা বটগাছ কেমন তাহা ‘আমি’কে বুঝাইতে পারে। এই প্রণালীতে আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতি বাহির হইতে ভিতরে আসে। কারণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সবই বাহিরে। আমরা পৃথিবীর জীব। আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয় সবই পার্থিব বস্তু। বলিয়া রাখা আবশ্যক যে এইরূপ জ্ঞানকে মেধস্ মুনি “বিষয় গোচর” জ্ঞান বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান মানুষ এবং পশু পক্ষীতে তুল্য রকমে আছে। স্থলবিশেষে পশুপক্ষীর বেশী থাকাও দৃষ্ট হয়। আসল জ্ঞান হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা বিষয় নিরপেক্ষ। “যে কিছু সবই ব্রহ্ম” এই নিশ্চিত জ্ঞান হওয়ার নামই ব্রহ্মজ্ঞান। সেই জ্ঞান হইলে জগতে জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বহু জন্মের সাধনার পর ভগবানের কৃপা হইলে কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান ঐ জ্ঞান লাভ করেন বলিয়া ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আছে। যা হউক, আমাদের যা সম্বল সেই বিষয়গোচর জ্ঞান লইয়াই চলুন আমরা অগ্রসর হই।

এ পর্য্যন্ত আলোচনায় আমরা পাইতেছি যে জ্ঞান আছে আমাদের ভিতরে এবং জ্ঞানের বিষয়গুলি রহিয়াছে বাহিরে। বর্তমানে আমরা জড়জগতে আছি, কাজেই জড়জগতের উপাদান

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোমের গঠিত একটা জড়-দেহ পরিধান করার আবশ্যক হইয়াছে এবং জড়পদার্থ নিম্নিত ইন্দ্রিয় ভিন্ন জড়পদার্থকে ধরিতে পারা যায়না বলিয়া যথাযোগ্য আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট জড়পদার্থ নিম্নিত ইন্দ্রিয় ধারণ করিতে হইতেছে। এই সকল ইন্দ্রিয় ভিন্ন আমরা জড়-জগতের কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, নাসিকাহীন বান্ধি স্বাণ পায় না, যদিও তাহাদের ভিতরে মনও রহিয়াছে ‘আমি’ও রহিয়াছে। তাহারও কারণ হইতেছে এই যে ‘আমি’ নিজে জড়-জগতের বস্তু নহে যদিও তাহার স্মূল দেহটী জড়-জগতের বস্তু। দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গুলিও জড়-জগতের বস্তু নিম্নিত। ‘আমি’ যাহাকে বলা হয় তিনি স্বর্গের বস্তু। স্বর্গ হইতে স্মূল Astral plane বা প্রেতলোক। প্রেতলোক হইতে স্মূল জড়-জগৎ, অর্থাৎ ভূলোক। ভূলোকের জ্ঞানলাভ করার জন্য ‘আমি’কে কত কল কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে দেখুন। দেহেতে পরস্পর অন্তপ্রবিষ্ট ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী লোকের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, অতি সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম পদার্থ-গঠিত ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী কোষ রাখিতে হইয়াছে। কোষ হইতে কোষান্তরে অনুষ্ঠিতি পাঠাইবার জন্য মনকে রাখিতে হইয়াছে। মনের মধ্যে পাঁচটী কোষের পাঁচ রকম পদার্থই বর্তমান আছে। বটবৃক্ষের প্রতিবিম্বটী চক্ষে পড়িল। মন তাহার জড়-পরমাণুর সাহায্যে প্রাণময় কোষের এবং মনোময় কোষের পরমাণুর সাহায্যে মনোময় কোষের জীব। মনোময় কোষে অর্থাৎ ‘আমি’র স্বধামে

সেই জড়-জগতের প্রতিবিশ্ব পতিত হওয়া মাত্র ‘আমি’ তাহা ধরিতে পারিলাম এবং তখন ‘আমি’র বটবৃক্ষ দর্শন জ্ঞান হইল। শ্রবণ, আশ্রয়, স্বাদগ্রহণ ও স্পর্শজ্ঞানও ঠিক একই ভাবে প্রভাবিত হয়।

আমাদের দেহে যে পাঁচটি কোষ আছে তাহার প্রত্যেকটিই আকৃতিতে আমাদের স্থূল শরীর অর্থাৎ অল্পময় কোষের অনুরূপ এবং প্রত্যেকটি কোষেই স্থূল দেহের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের চিহ্ন বা প্রতিকৃতি বিद्यমান আছে। কিন্তু প্রাণময় বা মনোময় কোষে ইন্দ্রিয়ের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও ঐ ঐ কোষের জ্ঞানলাভ করার কার্য সম্পন্ন হয়। থিয়সফিকেল সোসাইটির অনেকানেক সভাগণ বর্তমানে ঐ সকল কোষ বা দেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এখন মূল প্রশ্ন আসিতেছে যে আমাদের শরীরে যখন ভূ, ভুব, স্ব আদি প্রত্যেক লোকের সূক্ষ্ম পদার্থ নিশ্চিত এক একটা কোষ আছে, তখন এক এক লোকের কোষের সাহায্যে সেই সেই লোকের পদার্থসকলের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না কেন? অর্থাৎ আমাদের এষ্ট্রেল বডি বা প্রৈতদেহ দ্বারা এষ্ট্রেল প্লেনের বস্তু দেখিতে পাওয়া উচিত—এষ্ট্রেল প্লেনের শব্দ শুনা উচিত। তাহা হয় না কেন? এষ্ট্রেল প্লেনই যখন আমাদের অব্যবহিত পরলোক, এষ্ট্রেল প্লেন দেখিতে পাইলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। তাহা হয় না কেন?

উত্তরে বলিতে হইতেছে যে এই প্রশ্নটিই নিরর্থক। ‘হয় না’

ত নয়ই পক্ষান্তরে অনবরতই হইতেছে। এষ্টেল প্লেন বা পরলোকের বস্তুসমূহ সর্বদাই আমাদের দেহে ধাক্কা দিতেছে, অল্প সংখ্যক লোকে সেই ধাক্কা অনুভব করে। অনেকে সামান্য অনুভব করিয়াও অবহেলা করে এবং বহু লোকে ঐ ধাক্কা মোটেই অনুভব করিতে পারে না। মহর্ষি ব্যাসদেব গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন :—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাশ্রিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

যতন্তো যোগীনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মবস্থিতম্ ।

যতন্তোহ্যপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেষতঃ ॥ ২১

[জীব ক্রিপে সদ্ধ, রজ, তম এই তিন গুণে আবদ্ধ অবস্থায় দেহে অবস্থিত থাকিয়া বিষয়সমূহ ভোগ করেন, অথবা ক্রিপে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না ; কিন্তু জ্ঞানীগণ জ্ঞান নেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। ১০

সাধনে যত্নশীল যোগীগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন কিন্তু যাহারা অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী তাহারা যত্ন করিলেও ইহাকে দেখিতে পায় না। ১১]

এখন একটু চিন্তা করিয়া দেখুন সেই সংসারত্যাগী সর্বতো-
ভাবে স্বার্থত্যাগী, একমাত্র পরহিতাকাজক্ষী ঈশ্বরপরায়ণ মহাপুরুষ
ত্রৈলোক্যেশ্বরী, কাঠিয়া বাবা, রামকৃষ্ণ পরমহংস, লোকনাথ ব্রহ্মচারী
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভোলানন্দগিরি প্রভৃতি মহাত্মাগণের কথা।
তাহারা সকলেই পরমোক দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ

করিয়াছেন। তা ছাড়া মেডেন রেভেন্সি, রেভারেণ্ড লিড্‌বিটার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণও একবাক্যে ঐরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীজীর আকার ইঙ্গিতেও তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। শুধু আকার ইঙ্গিত কেন, ইদানীং তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন যে দেহত্যাগ বিষয়টা কিছুই নয়। মানুষের তাহাতে কিছুই পরিবর্তন হয় না। উপরের প্রেরণাবশে তিনি উপবাসাদি কস্মে প্রবৃত্ত হন বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইহা দ্বারাও বুঝা যাইতেছে যে ইহলোকের বহির্ভূত বিষয় তিনি জানিতে সক্ষম হইতেছেন। এই সকল মহাপুরুষের পক্ষে কোন অভিসন্ধিমূলে অযথার্থ বলার কল্পনাও হইতে পারে না। তাঁহাদের কথাবার্তা ও কার্যাকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাও নিঃসন্দেহরূপে অবধারণা করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের বাক্যে ভ্রান্তধারণা মূলকও হইতে পারে না। ভ্রান্ত ধারণাগুলি সাধারণতঃ এক এক ব্যক্তির এক এক রকমের হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের শতাধিক ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা এক প্রকারের হইতে পারে না। অধিকন্তু ইহাদের কথা ব্যাস, বাল্মিকী, মনু, অত্রি, অঙ্গিরা, মার্কণ্ডেয়, মেধসু, যাজ্ঞবল্ক্য, ওশনা, হারীত, বশিষ্ঠ, পরাশর, অপস্তুস্ত, জৈমিনি, কপিল, কাत्याয়ণ প্রভৃতি অগণিত ঋষিগণ ও বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম প্রবর্তকগণ কর্তৃক সমর্থিত হইতেছে। তথাপি যদি সন্দেহ হয় যে তাঁহারা কিরূপে পারলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে তাঁহাদের আচার ব্যবহার, কাজকর্ম ও জীবনযাত্রা নির্বাহ প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য

করিলেই সেই সন্দেহ দূর হইতে পারে। ত্রৈলোক্য স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কাঠিয়া বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং লোকনাথ ব্রাহ্মচারীকে অনেকেই দেখিয়াছেন। সত্যই একমাত্র ইহাদের অবলম্বন ছিল না কি? ইহারা সাংসারিক কোন ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন কি? পরহিংসা, পরপীড়া প্রভৃতি গর্হিত কার্য ইহারা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন না কি? ইহারা জীবনের অধিকাংশ সময় জগদীশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন না কি? ইন্দ্রিয়শক্তি যখন অসামর্য্যে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর, তখন এই সকল ব্যক্তির যদি ইন্দ্রিয়শক্তি বন্ধিত না হয়, তবে কাহার হইবে? তা ছাড়া জ্ঞানচক্ষু নামক আর একটা দর্শনেন্দ্রিয় সকলেরই আছে। সাধারণ লোকের ঐ ইন্দ্রিয়টা মলিন হইতে হইতে একেবারে নীমিলিত হইয়া রহিয়াছে। সদৃশ্যের পরিচালনা দ্বারা মহাপুরুষদের ঐ জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়। তখন আর তাঁহাদের অজানা কিছুই থাকে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। লেখাপড়া অতি সামান্যই জানিতেন। কিন্তু ভক্তিপথের সাধনা দ্বারা তাঁহার মন এত উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিল যে তাঁহার শ্রীমুখের সহজ সহজ কথাগুলি (যাহা “কথামৃত” নামে প্রচারিত আছে) পড়িয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক ব্যক্তিগণও বিস্ময়ে অভিভূত হন।

মহাপুরুষদিগের কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিয়া যদি আমাদের শ্রায় সাধারণ সংসারী ব্যক্তিদের বিষয়ে অনুধাবনা কর। যায়, তাহাতেও দেখা যাইবে যে আমাদের শ্রায় লোকেরও পার-

লৌকিক অনুভূতি যে একেবারে না হয় তাহা নহে। আমাদের প্রত্যেকের দেহের ভিতরেই পারলৌকিক দেহ বা এথ্রেল বডি রহিয়াছে যাহাকে প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ বলা হয়। আমাদের স্থূল জগতের অন্তরে বাহিরে পরলোক অর্থাৎ এথ্রেল প্লেন রহিয়াছে। স্থূল জগতের স্থূল পদার্থের স্পন্দনগুলি আমাদের স্থূল শরীরের স্থূল ইন্দ্রিয়গুলিকে স্পন্দিত করিতেছে। সূক্ষ্ম পরলোকের সূক্ষ্ম পদার্থের স্পন্দনসমূহ আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের পরমাণুগুলিকে স্পন্দিত করিতেছে। এই প্রকারে স্থূল শরীর দ্বারা স্থূল জগতের অনুভূতি আসিতেছে এবং সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ অর্থাৎ পরলোকের অনুভূতি আসিতেছে। ঢাক, ঢোল, কাঁস, মুদঙ্গ আদির কঠোর কোলাহল যেমন নারেন্দের কোমল তানকে ডুবাইয়া রাখে, সেইরূপ ঐহিক স্মৃতিসম্পদের বাসনাজনিত শারীরিক ও মানসিক বিকোভ আমাদের সূক্ষ্ম দেহকে অনবরতই বিব্রত করিয়া রাখিতেছে। শান্তি জিনিষটী আমাদের ভিতরে থাকিবার স্থান পায় না। মিথ্যা প্রবঞ্চনা আমাদের চিরসঙ্গী। হিংসা রেষ আমাদের সহচর। শম, দম, সাধুসঙ্গ, বৈরাগ্য প্রভৃতি শান্তির দরজাগুলি আমরা একেবারে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের মন অহোরাত্রই ঐহিক ব্যাপার নিয়া মত্ত। এ অবস্থায় স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার বা স্বর্গীয় বাণী শুনিবার দাবী আমরা কিরূপে করিতে পারি? তথাপি জগদীশ্বরের অপার করুণায় এবং আমরা অমৃতের সন্ধান বলিয়া—এই দুর্দশার ভিতর থাকিয়াও স্বর্গের মূলনিত গীতি শুনিতে

পাইয়া থাকি। আমরা যখন স্বার্থপরতার দাস হইয়া কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার উদ্যোগ করি, তখন তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য স্বর্গের বাণী শুনিতে পাই না কি? কবি গাহিয়াছেন :—

“ (প্রভো) আমি ত তোমারে, চাইনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।

* * * * * *

ওপথে যাস্নে, ব'লে বারে বারে

কাণে কাণে কত ব'লেছ।

(আমি) তবু চ'লে গেলে, ফিরায়ে আনিতে, —

পিছু পিছু কত ধেয়েছ। ”

আমরা যাহাকে বিবেকের বাণী বলি, তাহা স্থূল জগতের জিনিষ নয়। স্থূল জগতের বস্তু যদি হইত তবে তাহা স্থূলদেহের কর্ণপথে প্রবেশ করিত। কিন্তু বিবেকের বাণী স্থূল শরীরের মারফত প্রবেশ করে না। তাহা সূক্ষ্ম শরীর ও মন দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের অনুভূতিগুলি বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া থাকে। তাহা হইলে বিবেকের বাণী বাহিরের বস্তু হইতে পাবে না। ইহা বাহিরের বস্তু অথচ স্পষ্টতঃই স্থূল জগতের নয়, কাজেই সূক্ষ্ম জগতের বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে।

পাঠক মহাশয়কে ডিজ্ঞাসা করি, আপনি কি জীবনে কখনা বিঘন সঙ্কটে পড়িয়া নিরুপায় হইয়া অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা দ্বারা বিপন্ন হন নাই? এরূপ অনুভূতি কি আপনার জীবনে

কখনো হয় নাই যে কোন অজ্ঞাত শক্তি যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করতঃ সর্বদা আপনাকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করিতেছে ? অনেকেরই এইরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। অনুমান হয় আপনারও কোন না কোন সময় হইয়া থাকিবে। এই সব ইহলোকের বাপার নয়। একটু অনুধাবনা করিলে নিজ মনেই প্রবোধ পাউবেন।

নিদ্রা এবং স্বপ্নরাজ্যের বাপারগুলি অনুধাবনা করিলেও আমরা প্রায় স্পষ্ট আভাসই পাওয়া থাকি যে আমরা অনবরতই পরলোকের সংস্পর্শে আছি। নিদ্রা ও মৃত্যুতে তদাৎ এই যে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমরা পুনরায় স্থূল দেহে ফিরিয়া আসিতে পারি কিন্তু মৃত্যু হইলে পর পুনরায় স্থূল দেহে ফিরিয়া আসিবার কোন উপায় থাকে না ! নিদ্রিতাবস্থায় আমাদের সূক্ষ্মদেহ স্থূল দেহকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ঐ সময়ে সূক্ষ্মদেহ পরলোকে বিচরণ করে এবং পরলোকগত আত্মীয় স্বগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের সঙ্গী হয়। নিদ্রিতাবস্থায় বিছানায় পতিত স্থূল দেহের শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন আদি দৈহিক ক্রিয়া নিকর্ব্যার্থ ঐ দেহেতে চেতনার একটা ছায়ামাত্র বর্তমান থাকে। তাকে চিচ্ছায়া বলা হয়। ইহা প্রকৃত চেতনা নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করার ক্ষমতা ইহার নাই। ইহা কেবল তাহার অবধারিত কর্তব্য কাজগুলি যথানিয়মে করিয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত আর একটা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ নিশ্চিত আতিবাহিক দেহ আছে, ইহা নিদ্রিত স্থূল দেহের সহিত প্রস্থিত সূক্ষ্ম দেহের সংযোগ সূত্র

রক্ষা করে। ইহার একরূপ অসাধারণ ক্ষমতা যে আবশ্যিক হইলে নিমেষ মধ্যে দশ হাজার মাইল দূরবর্তী সূক্ষ্ম দেহটীকে তন্মূলেতে দেহে আনিতে সক্ষম হয়।

শারীরিক ব্যায়াম যেমন স্থূল শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট ও অমিত বলশালী করে সেইরূপ মানসিক ব্যায়াম মনকে এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যায়াম ইন্দ্রিয়কে প্রভূত বলশালী করিতে সক্ষম। ধ্যান, ধারণা ও নিদিধ্যাসন মনের ব্যায়াম। নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশের সহিত পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় পরিচালনাই ইন্দ্রিয়ের ব্যায়াম। যে, যে বিষয়ে ব্যায়াম করে, সে, সে বিষয়ে শক্তিশালী হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। এই ধ্যানের নামই সাধনা। থিয়সফিকেল সোসাইটীর কোন কোন সদস্য সাধনা দ্বারা এমন শক্তি লাভ করিয়াছেন, যে, ইচ্ছামাত্রেই তাঁহারা নির্দিষ্ট হইতে পারেন এবং দেহটীকে বিছানায় রাখিয়া অভিষিক্ত রাজ্যে বাইয়া অভিপ্রায় সিদ্ধ করতঃ ঐ সকল কার্যের সম্পূর্ণ স্মৃতিসহ পুনরায় স্থূল দেহে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা একাধিকবার উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁহারা জীবিত এবং সহজলভ্য। তাঁহারা জগতের হিতেই নিযুক্ত। কেহ আগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করেন এবং উৎসাহের সহিত পরামর্শ ও উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

কৃষক যেমন তাহার হালের গরুগুলি দ্বারা ৪৫ ঘণ্টা সময় হাল চাষ করিয়া পরে বিশ্রাম দেয় এবং আহাৰ্য্য পানীয় আদি

দিয়া তাহাদের শক্তি রক্ষা করে, মানুষ সেই প্রকার দিনের বেলায় দেহটিকে খাটায়, আবশ্যকমত খাওয়া পানীয় আদি দেয়, এবং রাত্রে বিশ্রাম করিতে দিয়া নিজে স্বধামে চলিয়া যায়। চিরভাস্ত নিজের বাসস্থানে যাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ যাহারা সবেমাত্র প্রথম বিদেশে যান, তাঁহারা ঘন ঘন নিজ বাসস্থানে যাইতে চেষ্টা করেন ও যাইয়া থাকেন। সেই কারণেই পৃথিবীতে নবাগত মনুষ্যগণ ভূমিষ্ট হওয়ার পর দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময়ই নিদ্রিত থাকে। ক্রমশঃ যতই পৃথিবীর জল বায়ুতে অভ্যস্ত হইতে থাকে, ততই নিদ্রা কমিতে থাকে।

হিষ্টিরিয়া, মৃগী আদি নামে অভিহিত মূর্ছারোগের কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রণালীর চিকিৎসকগণের নিকট বিশেষ সন্তোষজনক বিবৃতি পাওয়া যায় না। অথচ ঐ রোগের প্রকোপের সময় ডাক্তারগণ বিশেষ কোন প্রতীকার করিতেও সক্ষম হন না। মহামুনি চরকের সংগৃহীত আয়ুর্বেদ গ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ভূত, প্রেত কিম্বা অন্য কোন প্রকার উদ্ধলোকবাসী জীবের আবেশই ঐ রোগের কারণ। হোম, অর্চনা, মন্ত্র আদি দ্বারা ঐ রোগের প্রতীকার করার ব্যবস্থাও আছে। আমি নিজে ঐরূপ অনেক রোগী দেখিয়াছি। হিন্দু ওয়া এবং মুসলমান ফকিরের ঝাড়া দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল হইতেও দেখিয়াছি। অনেক স্থলে মূর্ছিত ও জ্ঞানহীন অবস্থায় রোগী নিজে শ্রীলাপ স্বরূপে প্রতীকারের উপায় বলিয়াছে এবং তাহার কথামত প্রতীকার করামাত্র মূর্ছা বিদূরিত হইয়াছে। মূর্ছিত অবস্থায়

রোগী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে—অবশ্য তাহার রোগ সম্বন্ধে, এবং ঐ বাণী বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছে। ইহাও আমি বিশেষ-রূপে অবগত আছি যে কতকগুলি অসাধু প্রকৃতির লোক সাধারণলোকের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করতঃ ছুরভিসন্ধি অভিপ্রায়ে গোপনে ভৌতিক ক্রিয়ার অনুকরণ করিয়া সাধারণ লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। একস্থলে আমি নিজে ঐরূপ একটা প্রবঞ্চনার কার্য ধরিয়া কুকর্মীদের সাজা করাইয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত ভৌতিক ঘটনার অস্তিত্ব না থাকা সিদ্ধান্ত হয় না। জগতে ভৌতিক ঘটনা অহরহ সংঘটিত হইতেছে। নানা দেশের ভৌতিক ঘটনার বিশ্বস্তরূপে প্রমাণিত কয়েকটা বিবরণ এই পুস্তকের শেষভাগে বর্ণিত হইল। হিষ্টিরিয়া, মূর্ছা আদি রোগের কারণ এই যে, যৌবনের উত্তমে অনেকস্থলেই মানুষের স্থূল দেহটী অত্যধিক উৎসাহশীল ও বলশালী হইয়া সূক্ষ্ম দেহটীকেও প্রভাবান্বিত করে। তখন কাম, ক্রোধ আদি রিপুগুলি অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করায় সূক্ষ্ম দেহের দয়া, দান্ধিয়া, ধর্ম্মানুরাগ আদি সদগুণসমূহ খানিকটা জড়তা প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম দেহের ঐরূপ দুর্বল ও দৈন্যাবস্থায় অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী ও দুষ্টি প্রকৃতির পরলোকবাসী ভূত প্রেতাди ও সূক্ষ্মদেহী মনুষ্য ঐ দুর্বল সূক্ষ্মদেহকে পরাভূত করতঃ নিজে তাহার স্থূল দেহকে আশ্রয় করিয়া বসিতে সক্ষম হয়। স্থূল দেহটী সূক্ষ্ম দেহের যন্তরূপ বলিয়া তখন ইহা যাহার অধিকৃত থাকে তাহারই আজ্ঞাবহ হইয়া তাহা দ্বারা

পরিচালিত হয় ! রোগীর তখন নিজ পূর্ববক্তিত্ব থাকে না। সম্পূর্ণ পৃথক বক্তির ত্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার সাবেক বিবেচনা-শক্তি, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় আদি কিছুই থাকে না। শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আক্রমণকারী ভূতকে অপসারিত করা নাত্র রোগীর বিবেচনা-শক্তি, স্বাভাবিক লজ্জানীলতা আদি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ যুবক যুবতী-দিগকেই ঐ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

বশীকরণ, মেস্মেরিজম্ হিপ্নটিজম্, আদি সম্মোহনবিদ্যার প্রক্রিয়াও আজকাল স্থানে স্থানেই আলোচিত ও সংঘটিত হইতেছে। ঐ সকল প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিলেও সূক্ষ্ম দেহের পৃথক অস্তিত্ব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। যে হেতু ঐ সকল প্রক্রিয়া একের সূক্ষ্ম দেহের উপর অন্যের সূক্ষ্ম দেহের প্রভাব বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

স্বপ্ন জগতের ব্যাপারসমূহ পর্যালোচনা করিলেও পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক তদন্ত ও পরীক্ষা হইয়া নানারূপ মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডিউ. প্রেল্‌স্ সাহেবের ফিলজফী অব্‌ মিটিসিজম্ নামক পুস্তকে স্বপ্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণালব্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রফেসর ক্রুক্‌স্, ডক্টর মায়ার্স প্রভৃতি স্বপ্ন সম্বন্ধে তদ্বিৎ পাশ্চাত্য মনীষীগণের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা প্রকার মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। এ

ক্ষুদ্র পুস্তকে ঐ সকল বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। মায়াস সাহেব একস্থলে লিখিয়াছেন যে এক ব্যক্তি কোন একটা দুরূহ বিষয় বুঝিবার জন্য বাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়; পরে একদিন স্বপ্নে এক পাত্রী সাহেব উপস্থিত হইয়া বিষয়টা তাহাকে বুঝাইয়া দেন। লোকটা জাগ্রত হইয়া দেখে যে বিষয়টা ঠিক বুঝা হইয়াছে। আসন্ন বিপদের সংবাদ ও সতর্ক বাণী স্বপ্নে পাওয়ার বিবরণও তিনি অনেক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অল্প দিনের একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে :—ওয়ারাটা নামক একটী সমুদ্রগামী জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া হইতে সমুদ্রপথে ইংলণ্ড রওয়ানা হইয়াছিল। ঐ জাহাজের একজন যাত্রী এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিল যে একটা লোক একখণ্ড রক্তাক্ত বস্ত্র ও একটী তরুণী লইয়া তাহার প্রকোষ্ঠে আসিয়া তরুণীটিকে ঐ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জড়াইয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়াছে। যাত্রীটী ঐ স্বপ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইল এবং পুনরায় অবিকল সেই স্বপ্ন দেখিল। ঐরূপ ক্রমশঃ তিনবার স্বপ্ন দেখায় তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল এবং গন্তব্যস্থানে জাহাজ পৌঁছিবার ৫৭ দিন পূর্বেই ডার্কান নামক স্থানে লোকটী নামিয়া গেল। ইহারও ৪ দিন পরে ঐ লোকটী স্বপ্নে দেখিল যে ওয়ারাটা জাহাজ সমুদ্রের উপরে প্রবল ঝড়ে পড়িয়া নিতান্ত বিপন্ন ও ডুবু ডুবু অবস্থা ঘটিয়াছে। পরদিন খবর আসিল যে ওয়ারাটা জাহাজ মহাসাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হওয়ায় বহু যাত্রী প্রাণ হারাইয়াছে।

এই স্থলে দেখা যায় যে প্রথম স্বপ্নটী খুব স্পষ্ট না হইলেও তদ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। কারণ, লোকটী ভীত হইয়া নামিয়া যাওয়ায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্বপ্নটী সুস্পষ্ট। ইহাও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহজগতের কেহ তরওয়াল বা বস্ত্রখণ্ড লইয়া স্বপ্ন দর্শন করায় নাই। কারণ, জাহাজ যে ডুববে তাহা ঐ সময় পর্য্যন্ত ইহলোকের কেহ জানিতে পারে নাই।

তারকেশ্বরের শিবালয়ে দেখিয়াছি অনেকগুলি লোক উপবাসী অবস্থায় নাটমন্দিরে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কেহ এক দিন, কেহ দুই দিন, কেহ বা ৩৪ দিন যাবত এই ভাবে আছে। কেহ রোগ-মুক্তির জন্ত, কেহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্ত, কেহ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত এরূপ ধন্না দিয়াছে। এরূপ ধন্না দিয়া অনেকেই নাকি বাবা তারকনাথের আদেশ পাইয়া কৃতার্থ হয়। তখন আমার বয়স ২২।২৩ বৎসর। লোকগুলি নিতান্তই মূর্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু একাগ্রতা, উপবাস এবং বাবা তারকনাথের প্রতি বিশ্বাস এই তিনটী জিনিষ একত্রিত হইলে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও মানুষের সূক্ষ্ম দেহটী খানিকটা নিঃশ্ল হওয়া স্বাভাবিক। সূক্ষ্ম দেহ পরিস্কৃত ও নিঃশ্ল থাকিলে তাহাতে অপার্থিব সূক্ষ্ম ব্যাপারের ছাপ লাগা খুবই স্বাভাবিক।

পরলোক পৃথক কোন স্থান নয় এবং পরলোক একটি মাত্রও নয়। ইহলোক ও পরলোক সমস্ত ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বদা

সর্বত্র অবস্থিতি করিতেছে, একই বস্তুর স্থূল অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, তৎপর অধিকতর সূক্ষ্ম, তৎপর তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম এইরূপে সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত সাতটি অবস্থাকে ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য, এই সাত নামে অভিহিত করিয়া মোটে সপ্তলোক ধরা হয়। ভুলোকের প্রত্যেক জীবদেহে এবং প্রত্যেক বস্তুতে ঐ সাত লোকের সাতটি কোষ বা দেহ আছে। তন্মধ্যে সর্বোপরিস্থ দুইটি এত সূক্ষ্ম অণু দ্বারা গঠিত যে ঐ দুইটির অস্তিত্ব অনুভব করা অত্যন্ত দুঃকর। সেই হেতু মোটামুটিভাবে পাঁচটি কোষই ধরা হয়। এষ্ট্রেল প্লেন বা এষ্ট্রেল প্লেনের বস্তুসমূহে ভুলোকের কোন পরমাণুও নাই এবং ভুলোকের পরমাণু গঠিত জড়দেহ বা অন্নময় কোষও নাই। কাজেই এষ্ট্রেল প্লেনের বস্তু বা ব্যক্তিতে মাত্র ৪টি কোষ। বুঝিবার ভুল হওয়ার আশঙ্কা নিবারণার্থ এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভূ, ভুব, ও স্ব লোক পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে মিলিত থাকায় ভুলোকের একটি বস্তু বা মানুষকে ভুবলোকের বস্তু বা মানুষও বলা যাইতে পারে এবং তাহাকে আবার স্বলোকের বস্তু বা মানুষও বলা যাইতে পারে। এখন ৫ কোষযুক্ত ভুলোকের বস্তু কিরূপে ৪ কোষযুক্ত ভুবলোকের হইতে পারে? বিষয়টা হইতেছে এই যে বর্ত্তমানে আমাদের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ আছে এবং আমরা পঞ্চকোষযুক্ত ভুলোকের মানুষ। ভুবলোকের অধিবাসীগণ আমাদের অন্নময় কোষটি দেখিতে পায় না। তাহারা কেবল অবশিষ্ট ৪টি কোষ দেখে এবং আমাদেরকে

ভূবল্লীকেই অবস্থিত দেখে। ভুলোকের কোনরূপ সংস্রব তাহারা রাখিতে পারে না এমন কি ভুলোক সংক্রান্ত আমাদের জড় দেহটা ও তাহাদের অদৃশ্য।

তা বলিয়া পরলোক বা ভূবল্লীকে একটা অস্পষ্ট অপ্রকৃত ছায়ালোক বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ, স্বর্লোক বা স্বর্গলোক হইতেছে মূল প্রকৃত জিনিষ। ইহাই জীবের প্রকৃত বাসস্থান। তন্নিম্নবর্তী ভূবল্লীকে স্বর্গলোকের কতক সাদৃশ্য আছে। তন্নিম্নবর্তী ভুলোকে সাদৃশ্য আরও কম। কারণ, যতই নিম্নলোকে নামা যায়, ততই আসল জিনিষটা জড়ের আবরণে ঢাকা পড়ে। আমরা ভূবল্লীকে ও স্বর্লোক দেখিতে পাই না। কাজেই ভুলোককেই নিতান্ত মনোরম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি। যাহারা জ্ঞানেন্ত্রে দেখিতে পান তাঁহারা ভুলোকের যা কিছু সবকেই তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। আমরা ভুলোকের প্রতিষ্ঠা লাভ করার উদ্দেশ্যে স্বর্গের বিঘ্নস্বরূপ পাপকে আশ্রয় করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, “প্রতিষ্ঠা শূকরীর বিষ্ঠা।”

ভুলোকের সকল বস্তুরই এণ্ট্রেল বডি বা প্রাণময় ও মনোময় কোষ পরলোকগত ব্যক্তি দেখিতে পায়। তা ছাড়াও পরলোকের নিজস্ব আরও অনেক মনোরম বস্তু তাহারা দেখিতে পায়, যাহা আমাদের অদৃশ্য। অদৃশ্য হওয়ার কারণ এই যে, ঐ সকল বস্তুতে ভুলোকের পদার্থ নির্মিত অন্নময় কোষ (Physical body) নাই। সেই লোকে অবস্থা এমন

মনোরম ও চিত্তাকর্ষক যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিতেন — “কাহাকে বা বলি, আর কেই বা প্রত্যয় করিবে।” কুকুর যেমন কুকুরজীবন লইয়াই সমুদ্র তামরাও তেমন ভুলোকের জীবন লইয়াই মুক্ত আছি। মেডাম্ এনি বেসান্ মহাশয়া বলেন— “মাছরাঙ্গা পাখী যেমন মাছ খাইবার জন্য জলে ঝাপ দেয়, এবং মাছ লইয়াই পুনরায় উঠিয়া গিয়া ডালে বসে, ঠিক সেইরূপ আমরা স্বর্গের জীব, পাখিব অভিজ্ঞতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছি, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আবার স্বর্গে চলিয়া যাইব।”

এ পর্য্যন্ত যতটা আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অনুধাবনা করিয়া মনে পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিলে মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সহজেই নিশ্চিত ধারণা করা যাইতে পারে। মৃত্যুতে অস্থিমাংস নিষ্পিত দেহটী চলিয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ সত্য কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ বিনষ্ট হইতে পারে না— বিনষ্ট হওয়ার উপায় নাই। ইহার ভিতরে অক্ষয়, অজর, অমর আত্মা বাস করেন। ভুলোকের কোন পদার্থ যখন ভুলোকের কোন পদার্থকে দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে বা কিছু করিতে অক্ষম তখন ভুলোকের কোন অস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারিবে না। ভুলোকের আগুণ ইহাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না—ভুলোকের জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারিবে না—ভুলোকের বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

এখন চলুন আমরা গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করি।

শ্রীভগবানের বাক্য,—

“অহমাত্মা গুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়াস্থিতঃ ।

মমৈবাংশ জীবলোকে জীবতুতঃ সনাতনঃ ॥”

ইত্যাদি পাঠ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীষ্টান সাধু মহাপুরুষ ডক্টার মিলার মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—“হিন্দুশাস্ত্র জগৎকে দুইটা মহাবস্তু দান করিয়াছে। একটা হইতেছে—সৰ্বভূতে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান, অপরটা মানুষের চিরস্থায়ীত্ব।” এ মহাপুরুষ অন্য ধর্মাবলম্বী হইয়াও হিন্দুধর্মশাস্ত্রের প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে হিন্দুধর্মের গৌরব যতটা বৃদ্ধি হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে এ সাধুর গৌরব এবং তাঁহার অবলম্বিত শ্রীষ্ট ধর্মের গৌরব। হিন্দুধর্ম অন্য কোন ধর্মের প্লাবিত করেই না পক্ষান্তরে অন্য সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহা হিন্দুধর্মের গৌরবের বিষয়। ভগবদ্গীতার বাক্যগুলি ভগবানের শ্রীমুখ নিঃশ্রিত না হইয়া যদি সাধারণ লোকের বাক্যও হইত তথাপি এ বাক্যগুলি নিজগুণেই পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত সন্দেহ নাই। কারণ, এ বাক্যগুলি সত্য—স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্য। নিবিষ্ট চিত্তে একটু অনুধাবনা করিলেই এ সকল কথার সত্যতা আপনা হইতে উপলব্ধি হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা ঋষিসম্মান হইয়াও আজ কুক্কুটের আয় মনিমুক্তা পায় ঠেলিয়া গোবরের পোকা সংগ্রহ করিতেছি। আর পাশ্চাত্য মনীষীগণ আমাদের বেদ, বেদান্ত,

উপনিষদাদি হইতে অমৃত নিষ্কাশন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।
আমরা তাহার খবরই রাখি না।

দেহ বিষয়ে যাহা আলোচনা হইয়াছে তাহার পর চলুন আসল মানুষটী সঙ্ক্ষেপে চিন্তা করি। আমরা দেখিয়াছি মানুষ দেহ নয়, কর্ণ নয়, পাকস্থলী নয়, ফুসফুস নয়—অর্থাৎ জড়দেহের কোন অংশই মানুষ নয়। প্রকৃত মানুষটী দেহের অতিরিক্ত। সেইটী কি তাহাই চিন্তা করিবার বিষয়। ভগবদগীতায় মানুষের বোধক যে শব্দটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা হইতেছে “দেহী”—দেহের বাসিন্দা ও পরিচালক, যেমন নায়ের পরিচালকের ন্যায় “নেয়ে”। এর চেয়ে ভাল অর্থবোধক শব্দ ভাষাতে আছে বলিয়া মনে হয় না। পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করি দেহস্থিত দেহী সঙ্ক্ষেপে একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করুন, অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিবেন। ইতিপূর্বে আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে জীবাত্মা সবই ভগবানের অংশ—ভগবানের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ সাংজ্ঞ্যার পুরুষের অংশ। গীতায় তাহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। “তত্ত্বমসি”, “সোহং”, “অহং ব্রহ্মাস্মি”, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”—চারি বেদের এই চারিটি মহাবাক্যও এই একই সত্য প্রচার করিতেছে। আমাদের ন্যায় সহজজ্ঞানসম্পন্ন লোকের বুদ্ধিতে ইহা হইতে অধিকতর সঙ্গত সিদ্ধান্ত স্থান পায় না। গীতাতে কথাটা কি সুন্দরভাবে ও অত্যন্ত জোরের সহিত বলা হইয়াছে দেখুন :—

“গামাবিশ্চ ভূতানি ধারয়ামাহমোজসা ।

পুষ্যামিচৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমোভূহা রসাহকঃ ॥ ১৫ অঃ ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপান সমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুर्वিধম্ । ১৫ অঃ ১৪

সৰ্ব্বশ্চাচ্চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞাননপোহনঞ্চ ।

বেদৈশ্চ সৰ্ব্বৈরহমেব বেত্তো

বেদাস্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম ॥ ১৫ অঃ ১৫

[শ্রীভগবান বলিতেছেন :—আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের বলের দ্বারা ভূতসকল ধারণ করিয়া আছি । আমি অমৃত রসযুক্ত চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ঔষধিগণকে পোষণ করিতেছি । আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণীগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া চৰ্ব্বা চোষাদি চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করি । আমি অন্তর্গামীরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি । আমি হইতে প্রাণীগণের জ্ঞান ও স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আমি হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপও সম্পাদিত হয় । আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য । আমিই বেদান্তের অর্থপ্রকাশক ও আমি বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বেদার্থ পরিজ্ঞাতা হই । ”

দেখিলেন বিষয়টা ! অচেনাকে প্রায় চিনাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ভাষায় বলা যায় না কথা প্রায় বলা হইয়া গিয়াছে ।

এখন নিজে চিন্তা করুন। একরূপ সহস্রাধিক কথা গীতায় রহিয়াছে। প্রত্যেকেরই পুনঃ পুনঃ নিজে গীতা পাঠ করা আবশ্যক।

নিরাকার ও নির্বিবকার জগদীশ্বরকেই দেহী বলা হইল : একরূপ দেহী নানা কাজ কর্ষে এবং সুখ দুঃখে লিপ্ত হন কিরূপে ? ইহার উত্তর এই, পরাপ্রকৃতির অংশ জীবনরূপ ধারণ করিতে হইলেই অপরাপ্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

“সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সন্তবাঃ।

নিবদ্ধস্তি মহাবহো দেহে দেহীনমবায়ম ॥”

এই গুণ তিনটিই যত বন্ধনের মূল। এই গুণ হইতে বুদ্ধি হয়, অহঙ্কার হয়, মন হয়, ইন্দ্রিয় হয়। মনে রাখা আবশ্যক, এই ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। জড়দেহের ইন্দ্রিয় যন্ত্রের কথা বলা হয় নাই। ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে দেহ পঞ্চ কোষযুক্ত দেহেতেই থাকুক বা দুই তিন কি চার কোষযুক্ত দেহেতেই থাকুক ঐ গুণত্রয়ের দ্বারা আবদ্ধ থাকিবেই। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই দেহীকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্বর্গবাসীর স্বর্গীয় দেহ আছে এবং ঐ দেহের দেহীর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সূক্ষ্ম পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র আছে। ঐ স্বর্গবাসী যদি প্রেতলোকে বা Astral plane এ নামিয়া আসে তবে স্বর্গে থাকাকালীন যাহা যাহা ছিল তাহা সবই থাকে অধিকন্তু আর একটা প্রাণময় কোষ বা

Astral body তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ঐ Astral body বা প্রেতদেহ Astral plane এর সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা নিশ্চিত,— স্থূল জগতের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম দ্বারা নয়। আবার ঐ প্রেতদেহবাসী যখন স্থূল জগতে নামিয়া আসে তখন তাহাতে আবার স্থূল জগতের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম নিশ্চিত স্থূলদেহের সংযোগ হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয়। জীবের স্বপ্ন স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিবার এই প্রণালী।

পৃথিবী হইতে স্বর্গধামে পুনরায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রণালীটি ঠিক বিপরীত। প্রথমতঃ পাখির স্থূল শরীরটি ত্যাগ করিল। তখন রহিল কি? প্রেতদেহ (Astral body) ও স্বর্গীয় দেহ (Mental body) এবং সেই দেহী। সেই তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়, সেই তাহার কর্মেন্দ্রিয়, সেই তাহার পঞ্চ তন্মাত্র, সেই মন, সেই বুদ্ধি, সেই অহঙ্কার। মনটি থাকিয়া যাওয়ায় তাহার স্মৃতি রহিয়া গেল। চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভবশক্তি সবই রহিয়া গেল, বিছা, বুদ্ধি, সরলতা, কপটতা, হিংসা, শত্রুতা, মিত্রতা, ঘৃণা, ভালবাসা আদি যে যাহা অর্জন করিয়াছিল সবই রহিয়া গেল।

আমরা অবিছা দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকায় কোন কিছু চক্ষের অন্তরাল হইয়া গেলে জিনিষটা ধ্বংস হইয়া গেল বলিয়া মনে করি। আমাদের এই রোগ দূর করার জ্ঞান মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছেন। আজকাল জড়-বিজ্ঞান আমাদের শিখাইয়াছে যে ধ্বংস বলিয়া কোন

বিষয় সৃষ্টিতে নাই। কিন্তু এই জড়-বিজ্ঞানের উৎপত্তির অনূন ৩৪ হাজার বৎসর পূর্বের মহর্ষি বলিয়া গিয়াছেন, —

নাসতো বিদ্যতে ভাবো ন ভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোত্তমস্তনয়োস্তত্তদর্শিতঃ ॥ ২ অ ১৬

[অসৎ বস্তুর বিদ্যমানতা নাই এবং সৎ বস্তুরও অভাব বা বিনাশ নাই। তত্তদর্শীগণ অর্থাৎ যাঁহারা সাধনা দ্বারা জ্ঞানেন্ত্র উন্মালিত করিয়া সহজ চক্ষুর অদৃশ্য চতুর্বিংশতি তত্ত্ব দেখিতে সমর্থ, তাঁহারা সতেরও কিনারা অর্থাৎ শেষ দেখিয়াছেন এবং অসতেরও শেষ দেখিয়াছেন। কাজেই এ বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ নাই।]

বাস্তবিক যাহা আছে তাহা চিরকালই ছিল এবং ভবিষ্যতেও চিরকালই থাকিবে। আর যাহা নাই তাহা কোন কালে ছিলও না ভবিষ্যতেও হইবে না। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। অজর, অমর, অবায় জীবাণু অনন্তকাল হইতেই আছে ও থাকিবে। এই জীবাণুকে স্থূলদেহ বিবর্জিত অবস্থায় বহু সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। প্রেতদেহধারী পরলোকগত সহস্র সহস্র মানব অনেক ক্রেশ স্বীকার করিয়া পৃথিবীর সর্বদেশের স্থূলদেহধারী মানবকে দেখা দিয়াছেন ও দিতেছেন। চতুর্দিকে ইহার অকাটা প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত ধর্মশাস্ত্র, সব দেশের, সকল ধর্মের অবতার স্বরূপ মহাপুরুষগণ, পৃথিবীর সকল দেশের প্রধান প্রধান কবি ও বৈজ্ঞানিকগণ, এবং সকল ধর্মের সাধু মহাপুরুষগণ

সম্বরে বলিতেছেন যে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। অনেক
স্বাধু মহাপুরুষগণ দেহত্যাগ করার বহুকাল পরে পুনরায় সাধক
দেহের অনুরূপ দেহ ক্রমেকের তরে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে
প্রতিষ্ঠিত শিষ্য, সেবক ও আত্মীয়স্বজনকে দেখা দিতেছেন —
এইরূপ সত্য ঘটনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও কয়েকটি বর্ণিত হইতেছে।
সর্বোপরি শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ

নাযং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শবীরে ॥ ১য় অঃ ২০

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-

ণাণ্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২য় অঃ ১২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২য় অঃ ২৩

[এই আত্মা কখনো জন্মেন না বা মরেন না। ইনি অকৃত্রিম
জাত বস্তুর ন্যায় জন্মিয়া অস্তিত্ব লাভ করেন না। ইনি সংরূপে
নিত্য বিद्यমান। ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাস্বত এবং পুরাণ।
শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না। ২০।

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ

করে সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অল্প নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ২২।

শস্ত্রসকল ইহাকে (আত্মাকে) ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দাহ করিতে পারে না। জল ইহাকে আদ্র করিতে পারে না। বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। ২য় অঃ ১৩।]

উপরোক্ত কথাগুলি শ্রীভগবানের বাক্য এবং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের লিখিত। ঐ সকল বাণী হিন্দুর জন্ম অল্প প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা অনাবশ্যক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও মনস্বীগণের মতামত জানিবার কৌতূহল নিবারণার্থ প্রফেসার জেম্‌স্‌এর মন্তব্যের সারাংশ এইস্থলে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। প্রফেসার জেম্‌স্‌ বলিতেছেন :—

“It is impossible for the scientist to ignore the testimony of the religious consciousness. It has been ignored too long by science. If you ignore the testimony of the Mystics, the Prophets, the saints, witnessing to their own experience, and, apart from these highly developed people, if you ignore the normal religious experiences of the ordinary person in touch for the time being with the higher world, whether by prayer or by meditation, then you may as well throw aside the testimony of consciousness altogether, for there

is no rationality in rejecting these testimonies and accepting others. But if you throw aside the testimony of consciousness to its own experiences, then you have nothing on which to build, for your whole knowledge of matters is based upon the experience of consciousness.”

[ভাবার্থ : - ধার্মিক মহাপুরুষেরা তাঁহাদের নিজ অনুভূতি সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন ঐ সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অসম্ভব। বহু পূর্বেই এই অসঙ্গত উপেক্ষার ভাবটা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত ছিল। আওয়ালিয়া ফকিরগণ, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তিগণ, এবং সাধু মহাত্মাগণ তাঁহাদের নিজ অনুভূতি সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেন, অথবা আত্মোন্নতির উচ্চ শিখরে আরুঢ় ঐ সকল মহাপুরুষের কথা ছাড়িয়া দিয়া যে সকল সংসারী লোক প্রার্থনা কিম্বা ধ্যানধারণা দ্বারা নিজকে সাময়িকভাবে উদ্ধলোকে অধিষ্ঠান করতঃ ঐ লোকের অনুভূতি লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, ঐ সকল সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করিতে হইলে মানুষের অনুভূতির সাক্ষ্য মাত্রকেই পরিত্যাগ করিতে হয়। যোহেতু ঐ সকল সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া অল্প সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার সম্বন্ধে ত্রায়সঙ্গত কোন যুক্তি নাই। মানবের অনুভূতির অভিজ্ঞতার প্রমাণ পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতে হইলে পৃথিবীতে বিশ্বাস করার মত আর কিছুই থাকে না। কারণ মানুষের কাণ্ডজ্ঞান তাহার নিজ অনুভূতি হইতেই উৎপন্ন।]

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জেম্‌স্‌ সাহেবের মন্তব্য ত বুঝা গেল। এখন একটু চিন্তা করিয়া নিজের মত গঠন করুন। মহাশয় শিশির কুমার ঘোষের ‘অমিয় নিমাই চরিত’ পাঠ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেবের কথা ভাবুন। ‘কথামৃত’ গ্রন্থখানা আগাগোড়া পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা ভাবুন। কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী এম, এ, বি, এল (বর্তমান নাম শ্রীমহাদাস কাঠিয়া) মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া কিম্বা রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবন-চরিত পাঠ করিয়া কাঠিয়া বাবার কথা ভাবুন। প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার বিষয় ভাবুন। যখন বুঝিতে পারিবেন যে সত্যি এই সকল মহাপুরুষগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরলোকগত ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ করিয়া-ছিলেন, তখন অজ্ঞতাজনিত অবিশ্বাসের ভাব দূরে পলায়ন করিবে। তখন স্পষ্ট ধারণা হইবে যে মৃত্যুটা কিছু নয়। দেহ-ত্যাগ ব্যাপারটা ছুংখের নয়। প্রিয়জনের দেহত্যাগ হেতু শোক করারও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নাই। দেহ ত্যাগ ব্যাপারটাকে ভয় করিবারও কোন কারণ নাই। আপনিও তখন সাধক কবির সুরে সুর মিলাইয়া, সাহসে বুক বাঁধিয়া কবির ভাষায় বলিতে পারিবেন :—

যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে
লোলুপ নিয়ত মম মন মধুকরে,

যে নিত্য উদ্ভানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যো, তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত।
কোমরূপে অতিক্রম করিলে তোমায়,
সফল হইবে আশা যাইব তথায়।

তত্ত্বজ্ঞান সমিতি (Theosophical Society) এবং পারলৌকিক আত্মা সংক্রান্ত চর্চা সমিতি (Society for Psychical Research) বহুকালের ঐকান্তিক চেষ্টা দ্বারা বর্তমানে পরলোকের অবস্থা অনেকাংশে মানববুদ্ধির সীমানার ভিতরে আনিয়া পৌছাইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অনাদিকাল হইতেই কোন কোন পরলোকগত আত্মা (প্রেতাত্মা) তাহাদের ঐচ্ছিক কামনা বাসনার তীব্রতাপ্রযুক্ত সাময়িকভাবে স্থলদেহের অনুরূপ একটা ভাষাদেহ ধারণ করিয়া মানুষের দৃষ্টিগোচর হইয়া আসিতেছিল। কোথাও বা একটি জীবিত লোকের দেহ আশ্রয় করতঃ তদ্বারা নিজ অভিপ্রায় বাক্য করিয়া কিম্বা উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল। প্রাচীনকালে মানবের নিম্নস্তর অপেক্ষাকৃত সরল ও অজ্ঞ থাকায়, ঐ সকল ভৌতিক ঘটনা রীতিমত সংগৃহীত বা আলোচিত হয় নাই। সেই আদিম কাল হইতেই ভূতের গল্প পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পরে মানুষ কিছু কিছু শিক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত লোকেরা আধ্যাত্মিকতা ছাড়িয়া পার্থিব সুখ সম্পদের জন্যই লালায়িত হইয়া পড়ায়, অজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহারা অপার্থিব বিষয়ের চিন্তা করা পছন্দ করে নাই। সেইজন্য

প্রোততত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান প্রায় সব দেশেই অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সঙ্কীর্ণতার একটি মহৎ দোষ এই যে সঙ্কীর্ণ লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ ধারণার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিতে চায় না। বিরুদ্ধ মতটা যুক্তিসঙ্গত কি না তাহা বিচার করিতেও প্রস্তুত নহে। এমন কি বিচার করার ক্ষমতাই হারাইয়া বসে। তাহারা কেবল নিজ নিজ প্রচলিত প্রথানুযায়ী সংস্কারের বশবর্তী হইয়া চলে এবং সে প্রথা বা সংস্কারের মূলে ঘোরতর অন্তায় অত্যাচার থাকিলেও তৎপ্রতি লক্ষ্যই করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ :- বাঙ্গালী হিন্দুর একটা সংস্কার আছে যে তাহার পানীয় জলের ভাণ্ড অথবা যে কোন জাতীয় লোকে ছুইলেই তাহার পক্ষে সেই জল অপেয় হইয়া গেল। কেন অপেয় হইবে—সেই জল পান করিলে কি ক্ষতি হইবে, এই সব বিষয় সাধারণ একজন হিন্দু ভাবিবেই না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অথবা সব জাতিই এই বিষয়টা দেখিয়া হতবুদ্ধি হয়। এমন কি হিন্দু ঘরের কোমলমতি শিশুরা পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারে না এবং স্বভাবতঃ তাহারা এই প্রথা ভাঙ্গিতেই উদ্যত হয়। এইরূপ অদ্ভুত রকমের সংস্কার সব দেশে, সব জাতিতেই একভাবে না এক ভাবে বর্তমান আছে।

মানুষের মধ্যে যাহারা সাধুতা ও বহুদর্শিতাদি দ্বারা মানবের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন সংস্কার তাহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারে না। তবে ইহা অনেক স্থলেই দেখা যায় যে অর্ধশিক্ষিত লোকেরা এক কুসংস্কার ছাড়িয়া অথবা কুসংস্কারের

নাসক করে। ইহার মূলে থাকে তাহাদের অজ্ঞতা ও একদেশ-
দর্শিতা।

হিন্দুর ঋষি, মুসলমানের দেওয়ানা দরবেশ, খৃষ্টানের সেইন্ট
একত্রিত হইলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ বা মনোমালিন্য
হয় না। কারণ ইহারা সকলেই উচ্চ স্তরে।

প্রচলিত বিজ্ঞাশিক্ষার ফলে যাহারা শিক্ষাভিমানী, তাহারা
সকলেই উচ্চ স্তরে নহেন। একদেশদর্শিতার আমল হইতে
তাহারা অনেকেই অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। অনেকেই
ঐহিক ভোগ সুখে মত্ত হইয়া বিবেক হারাইয়া বসেন। অনেক
স্থলেই দেখা যায় যে শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও কোন এক বিষয়ে
ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রচার করেন।

উপরোক্ত কারণে প্রেতাঙ্গার আবির্ভাব সংক্রান্ত ঘটনাগুলির
প্রতি সকল দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বহুকাল
অজ্ঞতামূলক উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। ঘটনা চক্রে
কোন ভৌতিক ঘটনা কোন শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির দৃষ্টিতে পড়িলে,
এবং তিনি ইহার বাস্তবত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেও সমাজে
উপহাসাস্পদ হওয়ার আশঙ্কায় প্রকাশ করেন নাই এবং কোন
স্থলে বা প্রচলিত নিয়ম মতে তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করিয়াছেন।
তদ্রূপ প্রেতাঙ্গার আবির্ভাব সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি লিপিবদ্ধও
হয় নাই, বিবেচিতও হয় নাই।

ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের কয়েকজন উদারচেতা
ঋষিকল্প লোকের চেষ্টায় তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেতাঙ্গার আবির্ভাব

সংক্রান্ত ব্যাপারের চর্চাসমিতি গঠিত হইয়া বিগত শতাধিক বৎসরের চেষ্টায় প্রেতাচার আবির্ভাব সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিকে অমৃততঃ উপহাসের গণ্ডীর উর্দ্ধে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আজকাল ঐ সকল ঘটনাকে উপহাস বা তাচ্ছিল্য করা হয় না। পক্ষান্তরে ইহারা বিশেষ অনুধাবনার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

উপরি-উক্ত সমিতিদ্বয় নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে মানুষ দেহ ত্যাগ করিলেও তাহার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে। সমিতির সদস্যগণ মধ্যে অনেকেই প্রেতাচার সঙ্গে দেখা শুনা ও আলাপ করিতে পারেন এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন।

এখন চলুন আমরা আর্য্যঋষিগণের প্রচারিত মতের প্রতি লক্ষ্য করি। ব্যাস, বাল্মিকী বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণ ঐহিক সুখ ভোগে মত্ত ছিলেন না এবং ইহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও বিবেকশালী ব্যক্তি ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। হিন্দুর চারি বেদ, চৌদ্দ শাস্ত্র, বেদান্তাদি ষড়্ দর্শন, বৃহদারণ্যাকাদি সকল উপনিষদ্, মহাভারত, রামায়ণ, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, আগম নিগম, তন্ত্র, পুরাণ, গীতা, শ্রাদ্ধতর্পনাদির বিধি বিধান ও মন্ত্র আদি, এবং সম্পূর্ণ বৈষ্ণব শাস্ত্র তদন্ত করিলে দেখা যায় যে ঐ সব গ্রন্থ পরলোককে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শাক্যমুনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতঃ বেদের ঐ অংশের নিন্দা করিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন ঐ ধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে পরলোকের ভিত্তির

উপরেই সংস্থাপিত। ইতিপূর্বে আলোচনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে মুসলমান, খৃষ্টান আদি প্রসিদ্ধ ধর্মমত সমস্তই এক বাক্যে এক ভাবে না এক ভাবে পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

তত্ত্বজ্ঞান সমিতির ইউরোপীয় ও আমেরিকান সভাগণ মাফা নিতেছেন যে ভূলোক (Physical plane) ভুবলোক ও স্বলোকের কতকাংশ (Astral plane) স্বলোক ও মহলোকের কতকাংশ (Mental ও Causal plane), এই কয়টা লোকের অস্তিত্ব তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন। এবং তদুর্দ্ধে আরও লোক যে রহিয়াছে তাহার প্রমাণও তাঁহারা পাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সাধনার বর্তমান অবস্থায় তাঁহারা শেষোক্ত লোকগুলিতে পৌছিতে বা উহাদের খবর আনিতে সক্ষম হন নাই। উক্ত সভাগণ আরও বলেন যে ভূলোক যেমন কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত, অগ্ন্যাগ্ন লোকগুলিকেও সেইরূপ তিন, চার বা ততোধিক প্রধান ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক লোকেই সেই লোকের উপযোগী বাসিন্দা জীব বর্তমান আছে এবং তদতিরিক্ত অগ্ন লোক হইতে আগত জীবও আছে।

স্থানের হিসাবে লোকগুলি পরস্পর পৃথক নয়। পক্ষান্তরে সব লোকই একত্রে এক স্থানে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে।

এখন আর্য্যঋষিগণের প্রদর্শিত পথে আসুন। তাঁহারা বলেন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সতাম্ এই সাতটা লোক। ভূলোক হইতেছে পৃথিবী। ভুবলোক হইতেছে প্রেতলোক ও

পিতৃলোকের কতকাংশ। স্বর্লোক হইতেছে পিতৃলোক ও স্বর্গলোক, মহঃ জনঃ, তপঃ, সত্যম্ এইগুলি বিষ্ণুলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি।

ভুলোক হইতে একটু সূক্ষ্ম স্তরেই প্রেতলোক অবস্থিত। প্রেতলোকের বাসিন্দাগণ ইচ্ছা করিলে ভুলোকের বাসিন্দাগণের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন কিন্তু তাহা খানিকটা কষ্টসাধ্য। সাধারণভাবে তাঁহারা ভুলোকের বাসিন্দাগণের অদৃশ্য। ভূত, প্রেত, পিশাচ আদি নামাকরণ প্রাপ্ত জীবগণ এই লোকের অধিবাসী, প্রেতলোক অনেক বিষয়ে ভুলোক অপেক্ষা সুবিধাজনক বটে, কিন্তু উন্নতিকামী ব্যক্তির পক্ষে প্রেতলোক বাঞ্ছনীয় নহে, কারণ ইহাতে থাকাকাল পর্য্যন্ত পার্থিব বাসনা কামনা আদি প্রেতাত্মাকে অধোগামী করার চেষ্টা করিয়া থাকে।

সূক্ষ্মতা হিসাবে পরবর্তী লোক হইতেছে পিতৃলোক। তাহা আবার সূক্ষ্মতার হিসাবে সাত ভাগে বিভক্ত। যথা :— (১) অগ্নিষাত্তা, (২) সৌমা, (৩) হবিষ্যন্ত, (৪) উষপা, (৫) শুকালীন, (৬) বর্হিষদ, (৭) আজাপ। এই সাত স্তরে সাত প্রকারের বাসিন্দা আছেন। তাঁহারা পিতৃশব্দবাচ্য। তাহাদের পিতৃলোকের উপযোগী শরীর আছে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা মানবের অদৃশ্য। মানুষ বা পার্থিব জগৎ তাঁহাদের অদৃশ্য নহে। সুখ দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব তাঁহাদের আছে। তাঁহারা মানুষ হইতে অনেক উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত এবং মানুষ হইতে অত্যধিক ক্ষমতাশীল। তাঁহারা মানুষের সুখ দুঃখের আনুকূল্য ও প্রতি-

কৃত্য করিতে সক্ষম। এই জন্মই তর্পন ও শ্রাদ্ধ দ্বারা তাঁহা-
দিগকে তুষ্ট করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। শ্রাদ্ধর ভাব পোষণ করা
মাত্রই ঐ ভাব রেডিওর দ্বারা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া
তৃপ্তি বিধান করে। যে কোনরূপে শ্রাদ্ধ করিলেই হইল। কিন্তু
বিষয়াসক্ত লোক প্রতি বৎসর স্মরণ করিতেও ভুলিয়া যায়। নাম
পর্যন্ত মনে রাখে না। তজ্জন্ম দূরদর্শী ঋষিগণ শ্রাদ্ধ করার জন্ম
বাঁধা নিয়ম করিয়াছেন। পিতৃলোকেরা শ্রাদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করেন।
কারণ তাহাতেই তাঁহাদের পোষণ হয়। প্রতিবৎসর আশ্বিন
মাসে পিতৃপক্ষে তাঁহারা নিজ নিজ বংশধরগণের নিকট আসিয়া
শ্রাদ্ধ তর্পনের জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকেন। দীপায়িতা
পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে অভিশাপ করিয়া চলিয়া যান।
পিতৃলোক সন্তুষ্ট হইয়া মোক্ষ দিতে পারেন না বটে কিন্তু ঐহিক
সুখ শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং মোক্ষ অর্জন করার
উপযোগী ক্ষমতা লাভের সহায়তা করিতে পারেন। শ্রাদ্ধ করিয়া
পিতৃলোকের নিকট নিম্নলিখিতরূপ আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়:—

“ওঁ দাতারো নোহভিবর্দ্ধন্তাং বেদাং সমুত্তিরেবচ,
শ্রদ্ধা চ নো মা বাগমং বহুদেয়ঞ্চ নোহস্তিতি ।
অন্নঞ্চ নো বহুভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মাচ যাচিস্ম কঞ্চন ।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু
যেভ্য সংকল্পিতা দ্বিজাস্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু ।
এতাঃ সত্যা আশীষঃ সন্তু, পিতৃবর প্রসাদোহস্তু ॥

অর্থ :—আমাদিগের মঙ্গো দাতা ও জ্ঞানী লোকের সংখ্যা এবং সম্ভান সম্ভতির সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। শ্রদ্ধা অর্থাৎ পিতৃগণের প্রতি বিশ্বাস স্থায়ী হউক। আমাদের যেন প্রভূত পরিমাণ খাদ্যবস্তু হয় এবং আমাদের গৃহে যেন অতিথিগণ আগমন করেন। যাচকগণ যেন আমাদের নিকট আসেন এবং আমরা যেন কখনো যাক্ষা না করি। নিতাই আমাদের অন্নবৃদ্ধি হউক এবং আমাদের বংশের দাতাগণ শত বৎসর জীবিত থাকুক। যাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা করা হইল তাহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হউক। এই সমস্ত আশীর্বাদ ফলযুক্ত হউক। আমাদের প্রতি পিতৃগণের বরদানের অনুগ্রহ হউক।

পিতৃলোকের পরবর্তী লোক হইতেছে দেবলোক বা স্বর্গ। তাহা পিতৃলোক হইতেও সূক্ষ্মস্তরে অবস্থিত। সেখানের বাসিন্দা দেবতা। তাঁহাদের দেহ মানুষের দৃষ্টিগোচর নয় কিন্তু মানুষ ও ভূলোক, পিতৃলোক আদি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর। পিতৃলোকের যেমন শ্রেণী বিভাগ আছে দেবলোকেরও ঠিক সেইরূপ। দেবতা উচ্চ স্তরেরও আছে নিম্ন স্তরেরও আছে। তাহাদেরও সুখ দুঃখ, মান অপমান আদি হ্রদ বোধ আছে। মানুষ সাধনার বলে তাহাদের সমকক্ষ হইতে ত পারেই তাহাদিগকে অতিক্রম করাও মানুষের অসাধ্য নয়। স্বভাবতঃ তাহারা মানুষ হইতে অধিক ক্ষমতাশালী এবং সন্তুষ্ট হইলে সহায়তা করে ও অসন্তুষ্ট হইলে প্রতিকূলতা করে। তাহারা মানুষের ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে সক্ষম।

তৎপরবর্তী উচ্চ স্তরের লোক হইতেছে শিবলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি। ইহারা দেবতারও উচ্চে কিন্তু তাঁহারাও সুখ, দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতির দায় হইতে মুক্ত নহেন।

সর্বোপরি পরব্রহ্ম। তিনি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিরাকার, অচিন্ত্য অব্যাক্ত। আবার ক্রিয়াশীল অবস্থায় সবই হইতেছেন। তিনি সুখ দুঃখের অতীত। তাঁহার সন্তোষ অসন্তোষ নাই। কঠোর ধ্যান দ্বারা তাহাকে বৃষ্টিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং তাহাই করা হয়। ব্রহ্মকে সর্বতোভাবে বৃষ্টিতে পারার নামই সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। ইহাই জীবের চরম আদর্শ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ বা মুক্তি হইয়া গেল। তাহাতে এমন শান্তি ও আনন্দ হয় যে তাহার কোন ধারণা করাই অমুক্ত জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু জ্ঞানলাভের পথে খানিকটা অগ্রসর হইলেই ক্রমশঃ ব্রহ্মানন্দের 'আভাস' পাওয়া যায়। সেই আংশিক আনন্দকে অসীম মাত্রায় বদ্ধিত করার উপায় দেখিয়াই মহর্ষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ অসীম, অতুলনীয় ও অনির্বচনীয়, সেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ঐষ্টানগণ বলেন যে মুখ্যভাবে গডের (God) উপাসনা করা মানুষের সাধ্য নহে। প্রভু যীশুর উপাসনা করিলে তাঁহার মারফতে গড্ এর কৃপা পাওয়া যায়। হিন্দু ঋষিগণের প্রচারিত পন্থাও অনেকটা তদ্রূপ। ব্রহ্মোপাসনা করা সাধারণতঃ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি দেবগণের উপাসনা

দ্বারা তাঁহাদিগের সহায়তা লাভ করিতে পারিলে ক্রমশঃ ব্রহ্মো-
পাসনা করার ক্ষমতা হয় এবং সর্বশেষে ব্রহ্মরূপা লাভ ও সঙ্গে
সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। গীতাতে শ্রীভগবান বলেন :—

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তুঃ চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তু চ রমন্তু চ ॥ ১০ অঃ ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তিতে ॥ ১০ অঃ ১০

এখন দেখা গেল যে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে আৰ্য্য
ঋষিগণ যাহা বলেন, তত্ত্বজ্ঞান সমিতির সদস্য মনীষীগণের সাক্ষ্য
তাহার বিরোধী ত নহেই, বরং অনুকূল। তাঁহারা পরের কথা
উপর নির্ভর করিয়া কিম্বা কোন গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া
তাঁহাদের মত প্রকাশ করেন না। তাঁহারা এতদূর গ্ৰায়পরাণ, সাধু
এবং বুদ্ধিমান যে তাহাদিগের সম্বন্ধে অসত্য প্রচারের আশঙ্কা
বা তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার আশঙ্কার কিছুমাত্র
কারণ নাই।

ঘটনাক্রমে আজ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামীজী এখানে উপস্থিত
আছেন। তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় তিব্বত দেশে দলই
লামার রাজধানী লাসা নগরীতে বাস করেন এবং অনেক সময়
কৈলাস পর্ব্বতে ও মানস সরোবরে বিচরণ করেন। অনেকেই
জানেন তিব্বতের রাজার উপাধিই দলই লামা এবং দলই লামা
মাত্রই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। স্বামীজীর নিকট দলই লামার বৃত্তান্ত

শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ভূতপূর্ব দলই লামা অত্যন্ত সাধু লোক ছিলেন। তিনি দেহত্যাগ করার পূর্বে বলিয়া যান যে দেহত্যাগের অল্পকাল পরেই অমুক স্থানে অমুকের গর্ভে এবং অমুকের ঔরসে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং ঐ জীবনের স্মৃতি লইয়াই জন্মিবেন। তদবধি তাঁহার আদেশে রাজকীয় ব্যয়ে তাঁহার কথিত পরবর্তী জীবনের মাতাপিতার পরিবারের তত্ত্বাবধান চলিতে লাগিল। তিনি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় দলই লামার সিংহাসনে অধিকৃত হওয়া সাব্যস্ত হইল। দেহত্যাগের পর হইতে পুনর্জন্ম হওয়া এবং নাবালক থাকাকাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালিত হওয়ার বন্দোবস্ত হইল। যথাকালে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। কথিত সময়ে কথিত স্থানে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। ঐ শিশু রাজকীয় ব্যয়ে প্রতিপালিত হইয়া ৩ বৎসর বয়স্ক হওয়ামাত্র রাজ প্রাসাদে নীত হইল। পূর্ব দলই লামার নিজের ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ ও অগ্ন্যাগ্নি জিনিষপত্রাদির সহিত অনুরূপ আরও জিনিষপত্র মিলাইয়া শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করতঃ পূর্ব জন্মের ব্যবহৃত জিনিষগুলি দেখাইয়া দিতে বলা হইল। তিন বৎসরের শিশু ঠিক ঠিক ভাবে একটী একটী করিয়া ব্যবহৃত জিনিষ দেখাইয়া দিল।

স্বামীজী বলিতেছেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনেকেই পূর্ব জন্মের বিবরণ কিছু না কিছু বলিতে সক্ষম এবং তাহাতে অবিশ্বাস করার হেতু নাই।

কুমিল্লা জজকোর্টের উকীল ৩কৃষ্ণকুমার দে এম, এ. বি, এল,

মহাশয় একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং অত্যন্ত সজ্জন ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ৩৬কুণ্ড সাধু তাঁহার সহোদর ছিলেন। বহুকাল একই স্থানে ওকালতী করা এবং পরস্পরের মধ্যে মনের মিল থাকা হেতু কৃষ্ণ বাবুর বন্ধুত্বের দাবী করার সৌভাগ্য আমার ছিল। তিনি দেহত্যাগ করার পূর্বদিন নিয়মিতরূপে কাচারী হইতে আসিয়া সন্ধ্যার পর নিজ আসনে বসিয়া সান্ধা উপাসনা শেষ করতঃ তাঁহার বিধবা ভগ্নীকে বলেন, “ওগো আমার জল খাওয়ার জন্য তুমি নাকি কি প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা আজই আমাকে দাও। ঘটনাচক্রে কাল কি হয় তাহার ঠিক নাই।” বাস্তবিক কিন্তু পরদিন দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভগিনী কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীও সরল প্রকৃতির লোক। কিছু না ভাবিয়া সরল ভাবে দাদার আদেশ পালন করিলেন এবং কৃষ্ণ বাবু (যদিও এমন সময়ে জল খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না) তাহা আহার করিলেন। তৎপর রাত্রির আহার শেষ করিয়া যথা নিয়মে শুইয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া অভ্যাসমতে মলমূত্র ত্যাগ ও হাত মুখ প্রক্ষালন আদি শেষ করতঃ উপাসনা মন্দিরে আসনে বসিয়া প্রাতঃকালীন নিত্যক্রিয়া করিতে থাকাবস্থায় পুনরায় ঐ ভগ্নীগীকে ডাকিয়া বলেন, “কোনরূপ হৈ চৈ, গোলমাল বা চিৎকার করিয়া আমার কাজ নষ্ট করিও না। এখন আর না বলিলেও নয়। নিকটবর্তী কয়েকজন আত্মীয় ডাকাইয়া আন। আমার আর বেশী সময় নাই।” ভগ্নীটি ব্যাকুলা হইয়া

কথাটা প্রচার করিয়া দিলেন। লোকজন আসিয়া দেখিল, কৃষ্ণবাবু আসনে বসিয়া কাজ করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন, “বাহির করার বন্দোবস্ত কর। আমার হট্টু পর্য্যন্ত অবশ্য হইয়া গিয়াছে। সময় নিকটবর্তী।” তদনুসারে বাহিরে তুলসী তলায় নেওয়ার অনতিকাল মধ্যেই সুস্থ চিত্তে তিনি দেহত্যাগ করেন ১৩৩৮ বাং ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমা দিনে।

উপরি-উক্তরূপ ঘটনা পৃথিবীতে অহরহ সংঘটিত হইতেছে। তাহা ছাড়া মৃত ব্যক্তির প্রেতাঙ্গা অবিকল দেহটা ধারণ করিয়া দেখা দেওয়ার ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া অনেক ভাল লোকে বলেন। বোধ হয় অনেকটাই ঐরূপ ঘটনার বিষয় জানিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা দেখিয়া গছেন। ঐ সকল বিবৃত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করায় কোন লাভ নাই। কারণ যাহারা বিশ্বাস করিবেন না তাঁহারা ঐরূপ ঘটনা নিজ চক্ষে দেখিলেও ধাঁধা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন অথচ কোনরূপ তদন্ত বা বিচার করিয়াও দেখিবেন না।

পৃথিবীতে অনেক লোকই দেহাত্মবোধ সম্পন্ন। তাঁহারা দেহটাকেই মানুষ বলিয়া মনে করেন। দেহাতিরিক্ত কিছু থাকিতে পারে কি না তাহার চিন্তাই করেন না। তাঁহারা পার্থিব বিষয়ে এতই লিপ্ত যে এই বিষয় ছাড়া অণু কোন বিষয় অনুধাবন করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। এই সব ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মনোবৃত্তির মূলে রহিয়াছে প্রত্যেকের পূর্বজন্ম বা ইহ-জন্মের পূর্বকর্মে। তদ্রূপ হতাশ হওয়ারও প্রয়োজন নাই।

কৰ্মফলের ভোগও অনিবার্য্য নহে। যথোচিত পুরুষকার প্রয়োগে ইহজীবনে ভাল কৰ্ম করিলে তাহা পূৰ্ব্বকৃত কুৰ্ম্মের ফলভোগ বারণ করিতে সমর্থ হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে ইহজন্মের সংকৰ্ম্ম বলশালী হইলে তাহার ফলে পূৰ্ব্বকৃত যে কোনরূপ জঘন্য কুৰ্ম্মের ফলও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। পূৰ্ব্বকৃত কুৰ্ম্মের দরুণ ভীত হইয়া বর্জনমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে জড়তা আনা নিতান্তই মূৰ্খতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, কোনও অট্টালিকার প্রাকোষ্ঠে ৫০০ বৎসরের মধ্যে আলো জ্বালান না হইয়া থাকিলেও আজ মুহূর্ত্তমধ্যে আলো জ্বালাইয়া যেমন তাহা দীপ্তিময় করা যায়, সেইরূপ মহাপাপীও অকপট ভগবৎ শরণাগতি দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে নিষ্পাপ হইতে পারে।

এ যাবত সংসারের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া আসিতে থাকিয়াও যদি আপনার মন অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাসনা খর্ব করিতে ও নিজের অনন্ত ভবিষ্যতের সুখশান্তির উপায় নির্দেশ করিতে অগ্রসর না হয় তবে জানিবেন যে ইহা আপনারই পূৰ্ব্বকৃত কুৰ্ম্মের ফল। ইহার প্রতীকার করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। আজও পথ প্রদর্শকের অভাব নাই। রৌরব নরক হইতে আমরাগিকে টানিয়া তুলিবার জন্য ঐ দেখুন আজও ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আৰ্য্যঋষিগণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ইদানীন্তন যুগাবতারগণ, কাঠিয়া বাবা, ভোলানন্দ গিরি, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, শ্রীমতী মেডেম ব্লেভেন্সি

শ্রীমতী এনি বেসান্ট, মহামতি স্যার উইলিয়াম টেড্‌, কর্ণেল আলকট, রাইট রেভারেণ্ড্‌ সি, ডাবলিউ, লিড্‌বিটার প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঋষিগণ, আগ্রহের সহিত হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমরা মূর্থতা হেতু দুর্গতিকে আকড়াইয়া ধরিয়া না থাকিলেই তাঁহারা আমাদিগকে টানিয়া তুলিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের বাণী সংগ্রহ করুন, তাহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে চেষ্টা করুন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের বাণীতে যদি বিশ্বাস স্থাপন না হয়, তবে তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করতঃ সাধন-রাজ্যের দিকে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া নিজে প্রত্যক্ষ করুন। কথিত মহাপুরুষগণ শুধু যে তাঁহাদের নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া পরলোকের অস্তিত্ব প্রচার করেন তাহা নহে। তাঁহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া বলেন। এমন কি সাধনা করিলে প্রত্যেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন বলিয়াও বলেন। এবং সেই সাধনার প্রণালীও সর্বসমক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

প্রাপ্তকৃত বিশেষজ্ঞ ঋষিগণের প্রচারিত উপদেশসমূহ সম্বন্ধে নিবিষ্ট চিন্তে চিন্তা করিলে মনে হয়, তাঁহারা সকলে যেন এক বাক্যে বলিতেছেন :—

হে স্বার্থান্ধ মানবগণ, তোমরা বিষয়মগ্নে মত্ত হইয়া তোমাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে পারিতেছ না। তোমাদের বর্তমান জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, তোমরা অনেকের কোটী কোটী বৎসর যাবত আছ এবং অনেকেরই আরও কোটী কোটী বৎসর থাকিতে

হইবে। এই অনন্ত সময়-সমুদ্র মধ্যে তোমাদের বর্তমান জীবন-কাল এক কণা মাত্র। এই অতাল্প সময়ের অলীক সুখ শান্তির প্রলোভনে পড়িয়া অনন্ত ভবিষ্যতের সুখ শান্তি নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। তোমাদের সুখ দুঃখ নিজেদের কক্ষ-ফলের উপর নির্ভর করিতেছে। জগতের হিতই এক মাত্র কর্তব্য। অহিত চিন্তা পর্যাস্ত সর্বথা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। তাহা হইলে অহিংসা, সত্য, প্রেম প্রভৃতি সদগুণসমূহ আপনা হইতে আসে। জগতের হিতই যাহার ব্রত, তাঁহার পক্ষে জপ, তপ, উপাসনা প্রভৃতিরও প্রয়োজন হয় না। সংকার্যো মনকে দৃঢ় রাখিবার জন্যই দৈনিক উপাসনার প্রয়োজন হয়। নিজকে জগতের নিকট বিলাইয়া দেওয়ার নামই মুক্তি। তাহা হইতে দেবী হওয়াই স্বাভাবিক। তজ্জন্ম ভীত হওয়ারও কোন কারণ নাই। বর্তমান জীবন যদি পরহিতে ব্যয়িত হয় তবে মৃত্যুর পর বহুকাল পর্যাস্ত অতি সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পুনরায় এমন স্থলে জন্ম হয় যেখানে আরও অনেক অধিক পরিমাণ পরোপকার করার সুযোগ, সুবিধা, ক্ষমতা, এবং প্রবৃত্তি হয়। এই ভাবে কয়েক জন্ম পর্যাস্ত আত্মার ক্রমোন্নতি হইয়া সর্বশেষে জন্ম-মৃত্যুর দায় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায়।

আপন জনের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়ারও কিছুমাত্র কারণ নাই। শোক করিলে পরলোকগত আত্মার ক্লেশ হয়। বাস্তবিক মৃত্যু বিষয়টা কষ্টের নহে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা ঐহিক অবস্থা হইতে বহু গুণে আনন্দদায়ক। পাপাত্মাদেরও

ভয়ের কারণ নাই। ধর্মরাজ ক্রোধপরবশ নহেন—পাপীদের প্রতি তাঁহার কোন আক্রোশ নাই। পক্ষান্তরে পাপীর পরিত্ৰাণ করার জগুই তিনি বাস্তব। শিশুর পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হইলে জননী যেমন স্নেহভরে তাহা উন্মূলন করেন ধর্মরাজও ঠিক সেইরূপ পাপীর আত্মা হইতে পাপ বিদূরিত হওয়ার সহায়তা করেন মাত্র। ভীত হওয়ার কোন কারণ নাই।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেহত্যাগের পরও জীবের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে

নানা ধর্মের মত এবং মহাপুরুষের সাক্ষ্য।

ঠাকুর শ্রী শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি।

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত । (শ্রীম কথিত) । দ্বিতীয় ভাগ । ৬ষ্ঠ সংস্করণ ।

দশম খণ্ড । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৬৩ পৃষ্ঠা ।]

“ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে (কেশবচন্দ্র সেনকে) দেখিবার জন্য অধৈর্য হইয়াছেন। কেশবের শিষ্যেরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি একটু বিশ্রাম করছেন : একটু পরে আসছেন।

কেশবের সঙ্কটাপন্ন পীড়া। তাই শিষ্যেরা ও বাড়ীর লোকেরা এত সাবধান। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিতে উদ্ভারোত্তর বাস্তু হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রতি) । হ্যা গো ! তাঁর আসবার কি দরকার ? আমিই ভিতরে যাই না কেন ?

প্রসন্ন (বিনীত ভাবে) । আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন।

ঠাকুর। যাও ; তোমরাই অমন কোরছো ? আমিই ভিতরে যাই !

(প্রসন্ন ঠাকুরকে ভূলাইয়া কেশবের গল্প করিতেছেন ।)

প্রসন্ন। তাঁর অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে।
আপনারই মত মার সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন শুনে হাসেন
কাঁদেন।

কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন : হাসেন, কাঁদেন এই
কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে
সমাধিস্থ।

ঠাকুর সমাধিস্থ। শীতকাল, গায়ে সবুজ রঙ্গের বনাতের
গরম জামা। জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ, দৃষ্টি
স্থির। একেবারে মগ্ন! অনেকক্ষণ এই অবস্থায়। সমাধিভঙ্গ
আর হইতেছে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ। পার্শ্বের বৈঠক-
খানায় আলো জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাইবার
চেষ্টা হইতেছে।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বৈঠকখানায় লইয়া যাওয়া হইল।
ঘরে অনেকগুলি আসবাব।—কৌচ, কেশারা, আলনা, গ্যামের
আলো। ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসান হইল।
কৌচের উপর বসিয়াই আবার বাহশূন্য, ভাবাবিষ্ট। কৌচের
উপর দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন।
বলছেন—“এই যে মা এসেছো! আবার বারণসী কাপড় প’ড়ে
কি দেখাও! মা, ছাঙ্গাম কোরো না! বোসো গো বোসো।”

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে। ঘর আলোকময়।

ব্রাহ্মভক্তেরা চতুর্দিকে আছেন। লাটু, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা আপনি বলিতেছেন—

“দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে ও আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারী ; পাকা সুপারী ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে। কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহবুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।”

[কেশবের প্রবেশ]

(কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন) পূর্বদিকের দ্বার দিয়া আসিতেছেন। যাহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়াছিলেন তাঁহার অস্থিচর্মসার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না ও দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কোঁচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কোঁচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া ভূমিষ্ট হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তর উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায়। আপনা আপনি কি বলিতেছেন। ঠাকুর মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন।’

[ঐ ত্রয়োদশ খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ। ১১১ পৃষ্ঠা।]

“প্রাণকৃষ্ণ। মহাশয়, পরলোক কি রকম ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন ও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ হয় নাই, ততক্ষণ তা গ্রহণ কর্ত্তে হবে। কিন্তু জ্ঞান হলে আর এসংসারে আসতে হয় না। পৃথিবীতে বা অন্য কোন লোকে যেতে হয়না।

“কুমোররা হাড়ি রোড়ে শুকুতে দেয়। দেখে নাই, তার ভিতর পাকা হাড়িও আছে, কাঁচা হাড়িও আছে? গরু, টরু চলে গেলে হাড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে কেলে দেয়। তাই দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয়; নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়। নূতন হাড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে। অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।”

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (পরিশিষ্ট) ১১০ পৃষ্ঠা ।]

[শ্রীযুক্ত বঙ্কিম (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ও পরকাল ।]

[Life after death : argument from analogy.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি)। আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত; আর কত বই লিখেছ; আপনি কি বলো, মানুষের কর্ত্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে? কি সঙ্গে যাবে?

বঙ্কিম।—পরকাল! সে আবার কি?

রামকৃষ্ণ।—হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না। পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়,

ততক্ষণ সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকাল আছে। জ্ঞানলাভ হ'লে—ঈশ্বরদর্শন হ'লে মুক্তি হয়ে যায়। আর আসতে হয় না। সিধোনো ধান পু'লে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাকে নিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না; তার তো কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই! সিধোনো ধান আর ক্ষেতে পতলে কি হবে?”

মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে ইসলামীয় মত

মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে মানুষের মৃত্যু নাই। মৃত্যু অর্থে মুসলমানগণ “এন্তেকাল” শব্দ ব্যবহার করেন। ঐ আরবী শব্দের অর্থ “বদলী” মাত্র। ইসলামীয় মতে মাতৃগর্ভস্থিত ক্রণটি জীবিত হইয়া উঠে। তখন অবধি অন্তঃকরণের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তখন অবধি দেহটি কেবলমাত্র আত্মার আবরণ (কোষ) স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। আত্মা নিজেই তখন স্বাতন্ত্র্য হইয়া উঠে। আত্মা একবার সৃষ্ট হইলে আর কখনো বিনষ্ট হয় না। দেহটি নষ্ট হইলে আত্মা ঐ দেহ পরিত্যাগ করে এবং নূতন একটা অনুরূপ সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া ঐ দেহ দ্বারা ঐহিক জীবনের পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিতে থাকে। পার্থিব জীবনে যে যেরূপ কাজ করিয়াছে ঐ ঐ কৃতকর্মের ফল ভোগ করার উপযোগী তাহার যেরূপ দেহ গঠিত হয় এবং শেষ বিচারের (আখের) দিন

পর্যন্ত ঐ দেহতেই থাকে। ঐ দেহতে থাকাকালীন অবস্থাকে আরবী ভাষায় “বারজাখ্” বলা হয়। স্থূল শরীরী মানবগণ ঐ দেহ দেখিতে পায় না কিন্তু যাহারা কঠোর তপস্যা দ্বারা অলৌকিক দর্শনের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাহারা ইহজীবনেই ঐ সকল পরলোকগামী ব্যক্তিগণকে দেখিতে পান। ইহজীবনে যে কৌমার অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থা এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য অবস্থা আসে, ঠিক সেইরূপ পার্থিব অবস্থা হইতে “বারজাখ্” অবস্থা আসে। সেইটা নূতন কিছু নয়।

মুসলমানী শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশ আছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে লোক সব দেহত্যাগের পর “বারজাখ্” অবস্থায় আছে এবং চরম বিচারের পূর্বদিন পর্যন্ত সমস্ত মৃত ব্যক্তিগণ ঐ অবস্থায়ই থাকিবে। চরম বিচারের দিনে বিশ্বনাথ (আল্লাতাল্লা) প্রত্যেককেই তাহাদের নিজ নিজ পার্থিব জীবনের দেহটা লইয়া দাড়াইতে বলিবেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ আদেশানুযায়ী কাজ হইবে। এবং আল্লার সুবিচারে পুণ্যাত্মাগণ স্বর্গে যাইবেন এবং পাপাত্মাগণ নরকে যাইবে।

“তোমরা কি মনে কর যে তোমরা কেবল খেলনা স্বরূপে সৃষ্ট হইয়াছ, আর তোমাদের অনন্তজীবনও নহে এবং মৃত্যুর পর তোমাদের অনন্ত উন্নতির পথও উন্মুক্ত হইবে না? তাহা কখনই নহে; কারণ অতি মহান এবং প্রকৃত রাজরাজেশ্বর আল্লাতাল্লা স্বেচ্ছায় অভিপ্রায়ে যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় জগদীশ্বর এবং তাহার গুণাবলী বিশুদ্ধ ও সম্মানিত।”

“ঈশ্বরের দূত যখন কুক্রিয়াসক্ত লোকের মৃত্যু সংঘটন করে তখন তাহারা দূতকে শাস্তির সংবাদ জানাইয়া বলে যে “আমরা কুক্রিয়াসক্ত ছিলাম না”। তখন দূত উত্তর করেন “না তোমাদের আসক্তি কুক্রিয়াতেই ছিল। তোমরা কিরূপ কাজে রত ছিলে তাহা জগদীশ্বর উত্তমরূপে জানেন। নরকের দরজা দিয়া প্রবেশ কর এবং সেখানে বাস করিতে থাক। অহঙ্কারী-দিগের বাসস্থান অশ্রীতিকর।”

আবার

“জগদীশ্বরের দূত যখন পবিত্রাত্মা লোকদিগের মৃত্যু সংঘটন করেন তখন ঐ দূত তাহাদিগকে বলেন “তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক। তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার পুরস্কার স্বরূপ তোমরা স্বর্গে প্রবেশ কর।”

পবিত্র কোরাণ ১৬ অঃ ২৮।২৯।৩০।

“বিশ্বাসী এবং স্বকৃতি লোকগণকে এই সুসমাচার জ্ঞাপন কর যে তাহারা এমন সব বাগানের অধিকারী হইবে যাহাদের নিম্নভাগ দিয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত আছে। যে পর্য্যন্ত তাহারা ঐ বাগানের ফল খাইতে পাইবে সেই পর্য্যন্ত বলিবে “ইহা সেই ফল যাহা আমরাইগকে ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছিল।” কারণ, ইহলোকে তাহাদিগকে যে ফল দেওয়া হইয়াছিল পরলোকেও তাহারা তদনুরূপ ফলই পাইবে।

পবিত্র কোরাণ ২য় অঃ ২৩।

“স্বকৃতিগণ জানে না কি অনির্বচনীয় আনন্দ ও মঙ্গল

তাহাদের জন্য গোপনে সঞ্চিত রাখিয়াছে। মৃত্যুর পর জানিতে পারিবে।)’,

পবিত্র কোরাণ ৩২ অঃ ১৭।

“মানুষের কর্মফলগুলি ইহজীবনেই আমরা প্রচ্ছন্নভাবে তাহাদের গলায় জড়াইয়া রাখিয়াছি। মৃত্যুর পর চরম বিচারের দিনে ঐ সকল খোলা পুস্তকের আকার প্রকাশিত করিব।

পবিত্র কোরাণ ১৭ অঃ ১০।

দুষ্কৃতি লোকদের সম্মুখে কোরাণ বলিতেছেন :-

“তোমাদের বাসনা এবং রিপুগুলি আমরণ তোমাদিগকে ভাবী জীবনের অন্বেষণ হইতে দূরে রাখিয়াছে। তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে যে সংসারাসক্তি পরিণামে সফল প্রদান করে না। তোমাদিগকে আবার বলি সংসারাসক্তির কুফল তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে। তোমাদের যদি দিবাদৃষ্টি থাকিত এ জীবনেই তোমরা নরক দেখিতে পাইতে। কিন্তু মরণের পর “বার্জাখ্” অবস্থাতে তোমরা দিবাদৃষ্টিতে নরক দেখিতে পাইবে এবং চরম বিচারের দিনে নরক ভোগ করিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিবে।”

পবিত্র কোরাণ ১০২ অধ্যায়।

“মনে কর একটা সুবৃহৎ উদ্যান। তাহাতে বহুসংখ্যক নদী প্রবাহিত। কতকগুলিতে জল, কতকগুলিতে দুগ্ধ, কতকগুলিতে সুরা এবং কতকগুলিতে পরিচ্ছন্ন মধু প্রবাহিত হইতেছে। কথিত নদীগুলির জল, দুগ্ধ, সুরা, বা মধু কোন সময়েই নষ্ট বা বিকৃত

হয় না। ঐ নদীর স্রোত কখনো মলিনতা উৎপাদন করে না। পক্ষান্তরে পান করিলে বিমল আনন্দ উৎপন্ন করে। সদাশয় ধার্মিকদিগকে যে স্বর্গ প্রদান করা হইবে তাহার নমুনা এইরূপ।

পবিত্র কোরাণ ৪৭ অঃ ১৬।

জন্মান্তর সম্বন্ধে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

প্রশ্ন :—মৃত্যুর পরে কি হয়? পরলোক বলিয়া যে সকল স্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা সত্য কি না?

উত্তর :—মৃত্যুর পরে সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোকে প্রত্যেক বংশেরই এক একজন পিতৃপুরুষ থাকেন। তিনি যাহার যে অবস্থা তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেন। তথায় ক্রমে ক্রমে তাহার বাসনা জন্মে। বাসনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে জন্মের ইচ্ছা হয়। জন্ম যে কেবল এই পৃথিবীতেই হইবে এমন নহে, সৌরজগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানি ঐরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। বিষ্ণুলোক, চন্দ্রলোক প্রভৃতি স্থান আছে। তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে জন্মের অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে কোন স্থানে তাহার জন্ম হইবে পিতৃপুরুষ তাহা বলিয়া দেন। সে তদনুযায়ী প্রার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে অবস্থানুসারে নানা গৃহে তাহার জন্ম হয়। এই পৃথিবীতে এক জনের জন্ম না হইলে সে মুক্ত হইল এমন নহে। অগাশ্চ গ্রহে উপগ্রহে থাকিবার বাসস্থান আছে। তথায় স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক

এরূপ (এই পৃথিবীর স্ত্রী পুরুষের মত) নহে । কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন । সেখানেও বাসনা আছে । এইরূপে গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্ম গ্রহণ করে । বাসনা অনুসারে জন্ম হইলেও সকলের বাসনা এক রকম নহে । সেই এক গ্রহে হয় না ।’

আচাৰ্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১১ পৃষ্ঠা ।

“মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জননী ৩৯শ্রমণী দেবী দেহ ত্যাগ করার ক্রিয়াকাল পরে তদীয় পিতৃপুরুষ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাতাকে গঙ্গাতীরে গমন পূর্বক যোগ-জীবন গোস্বামী (৩বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুত্র) মহাশয় দ্বারা তাহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় আগমন পূর্বক ৯০।৫ নং মেছুয়াবাজার রোডস্থিত সোমড়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় হরিচরণ রায় মহাশয়ের বাসা বাড়িতে উপস্থিত হইলেন । ইহারা গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য, এই বাড়িতে থাকিয়া গোস্বামী মহাশয় শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয় দ্বারা যথা শাস্ত্র স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন । সম্মাস গ্রহণ করা হেতু নিজে অধিকারী ছিলেন না । কিন্তু মাতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলী গঙ্গাজল প্রদান করিয়াছিলেন । এই সময় তাঁহার মাতৃদেবী দিবাদেহে আবিভূতা হইয়া তৎপ্রদত্ত জল গ্রহণ করিয়াছিলেন । এতদ্ভিন্ন অপরোপর সময় পারলৌকিক তত্ত্বাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা গোস্বামী মহাশয়ের স্ব কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । —

“মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর পিতৃলোক মাতৃলোকদিগের সহিত আসিয়া বলিলেন যে একাদশ দিবসে যোগজীবন তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবে। অর্থাৎ তাঁহার নামে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও দুঃখীদিগকে দান করিবে। অপরপক্ষে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিবে। অপরপক্ষ আশ্বিন মাসে। দান যথাসাধ্য। কি কি দান করিবে? তণ্ডুল, বস্ত্র, জলপাত্র, ফলমূল খাদ্যবস্তু— ইত্যাদি। মাতার মৃত্যুতে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হয়। মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্বে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ঘুরিতে থাকে। ঘর হইতে বাহিরে আসিলে আত্মা উর্দ্ধে দৃষ্টি করে। তখন তাঁহার পূর্বপুরুষগণ আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। যদি পুণ্যাত্মা হয়, পিতৃলোক অথবা মাতৃলোক লইয়া যায় এবং তাহাকে লইয়া এক বৎসরকাল আনন্দ করে। এই এক বৎসর পরে তাহার যেরূপ কৰ্ম্ম সেইরূপ অবস্থা লাভ করে। এই এক বৎসর শ্রাদ্ধের ফল ভোগ করে। পাপাত্মা হইলে এই এক বৎসর উৎকট পাপ যন্ত্রণা ভোগ করে। এইরূপ অনেক কথা মাতা জানাইয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে আনন্দজনক ঘটনা।”

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। দ্বিতীয় সংস্করণ ৩২২ পৃষ্ঠা।

“কোন সময় গেল্লোরিয়া আশ্রমে অবস্থান কালে এক দিবস গোস্বামী প্রভু অসময়ে প্রচুর আহার করিলে জনৈক শিষ্য তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন “যে সকল মহাপুরুষ আতিবাহিক দেহে বাস করেন তাঁহারা ব্রহ্মবিদ

ব্রাহ্মণের মুখে আহার করিয়া থাকেন। ঈদৃশ একজন মহাপুরুষ অন্ন ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিই আমার মুখে ভক্ষণ করিয়াছেন।”

আচাৰ্য্য বিজয়রক্ষা গোস্বামী। দ্বিতীয় সংস্করণ ৪০৫ পৃষ্ঠা।

“এক সময়ে গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের ভজনস্থান নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে শান্তিপুর নিবাসী প্রভুপাদ জগদন্ধু গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাব্বলাতে গমন করেন। যাইবার সময় গৃহপালিত একটা কুকুর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। পথিমধ্যে অপরাপর কুকুরে ইহাকে দর্শন করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া প্রভুপাদ জগদন্ধু দুই তিন বার কুকুরটাকে বাটী ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। অবশেষে গোস্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইল। বাবলায় উপনীত হইয়া গোস্বামী প্রভু সহচর দিগের সঙ্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় উক্ত কুকুরটা মন্দিরের নিকটবর্তী একটা নির্দিষ্ট স্থান পদনখ দ্বারা আচড়াইতে আচড়াইতে পুনঃ পুনঃ ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। হঠাৎ কুকুরটির এবম্প্রকার আচরণ দর্শন করিয়া গোস্বামী প্রভু ঐ স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে স্থানটা খনন করা মাত্রই অল্প মুত্তিকার নীচে একখণ্ড কাষ্ঠ পাত্কা ও একটী পঞ্চপাত্রেব সহিত একটী পিস্তলের হাড়ী সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

দ্রবাগুলি দেখিয়া গোস্বামী প্রভু বলিলেন “এই সমস্তই অদ্বৈত প্রভুর বাবহার্য্য জিনিষ, বহু সৌভাগ্যে তত্ত্ব ইহা আবিষ্কৃত হইল।” পূর্বোক্ত কুকুরটার এই প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া উপস্থিত সকলে বিমুগ্ধ হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিদর্শন চিহ্নগুলি স্থানীয় মন্দিরের সেবায়েতের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া গোস্বামী প্রভু সঙ্গায় লোকসহ স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই কুকুরটা সম্বন্ধে গোস্বামী প্রভু একদিন বলিলেন যে এ পূর্বজন্মে সাধক ছিল। ইহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইবে। এই কথা বলিতেছেন এমন সময় কুকুরটা নিকটে আগমন করিল। তিনি তাকে দেখিয়া বলিলেন ‘আর কেন? বেশী দিন থাকিলে কষ্ট হইবে, দেহ ছাড়িয়া দাও। তাহার পরদিবস লোকে গঙ্গায় গিয়া দেখে যে উক্ত কুকুরের শব গঙ্গাতীরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দেহের অর্ধেক জলের ভিতর ও অপারার্ধেক তাঁরের উপর পতিত আছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া শান্তিপূরবাসীগণ গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক প্রভাব অনুভব করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।”

আচাৰ্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী : দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৫২ পৃষ্ঠা।

শান্তিপূর নিবাসী শ্রীধুক্ত কালীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ।

“সাধন পন্থায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে সাধকের জাতিস্মরণ নামে একটা অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি জাগরিত হয় এবং অপরের পূর্ব জন্মের কথাও অবগত হইবার ক্ষমতা জন্মে। গয়াধামে অবস্থান

কালে একদা রামগয়ার পাহাড়ে গোস্বামী প্রভুর হঠাৎ পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরিত হয়। ঘটনাটি জনৈক দর্শকের স্ব-কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যথা :—“গয়ার নিকটবর্তী এক স্থানে যাইবার ইচ্ছা মনে উদয় হয়। এই স্থানটি জঙ্গলময়। গয়া হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। নাম রামগয়া। সন্ন্যাসীরা তথায় অনেক সময় আসিয়া থাকেন। নিকটে লোকের ও বসবাস আছে। গৌসাই একটী লোক সঙ্গে ঐ স্থানে যান।

“তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল ‘আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নহি। অশ্রু কোন ব্যক্তি।’ তিনি বলিলেন—বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি মনের এই বিচিত্র ভাব দমন করিতে পারিলাম না। সেই স্থানে পৌছিবার পর মনের এই ভাব আরও প্রবল হইল। নিকটে একটী বৃক্ষতলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে যে দুইটি সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহার! কোথায় গেলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন ‘কিচ্চি বাত্‌ পুছ্‌তে হায়?’ অর্থাৎ কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? পরে বলিলেন ‘সো লোগ্‌ত্‌ বহুত্‌ পহিলে মর্‌ গয়ে।’ অর্থাৎ সেই লোক বহুপূর্বের মরিয়া গিয়াছে। গৌসাই জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এই স্থানে নৃসিংহ দেবের মন্দির আছে?’ ব্রাহ্মণ বলিলেন ‘হায়, মিলেগা’ অর্থাৎ আছে, মিলিবে। গৌসাই নৃসিংহ দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া

উঠিল। তিনি ও আর দুইটি সন্ন্যাসী এই মন্দিরে বাস করিতেন। যে ঘরে বাস, যে ঘরে শয়ন, যে ঘরে পাঠ, যে ঘরে আহার ইত্যাদি করিতেন সমুদয় মনে হইল। তত্রস্থ সমুদয় ঘরগুলি পর্য্যটন করিয়া দেখিলেন। তৎপরে মনে পড়িল নিকটে একটি পুষ্করিণীর তীরে তাঁহারা তিনজনে স্নান করিতেন। তিনি সেই পুকুর দেখিলেন আর মনে পড়িল একটি বৃক্ষের গায়ে তিনি কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি সেই বৃক্ষটি পাইলেন। বৃক্ষটি বটবৃক্ষ। যখন ছোট ছিল, তাহার ছাল কাটিয়া ‘ওঁ রামঃ’ এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। অক্ষরগুলি এখন বাঁকাটেরা হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন।”

আচাৰ্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫ পৃষ্ঠা।

(কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র লিখিত বিবরণ।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত।)

“এই সময়ে গয়াধামের ৩বিষ্ণুপাদপদ্মের অশেষ মহিমা ব্যঞ্জক একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি গোস্বামী প্রভুর স্ব-কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—“আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলাম, তখন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি। কোন এক বিলাত ফেরত ব্যক্তি গয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার পরলোকগত পিতা তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, ‘বাপু, যদি, গয়ায় এসেছ, তবে আমাকে একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।’ কিন্তু তিনি ওসব বিশ্বাস করেন না। তাই উহাতে

আস্থা দিলেন না। আরও একদিন স্থাপ্তে ঐরূপ দেখিলেন। আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম—‘আপনার পিণ্ড দেওয়াই উচিত।’ তিনি বলিলেন ‘আপনি আমায় কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে বলছেন?’ আমি বলিলাম ‘আপনি হু আর আপনার বিশ্বাস মত দিবেন না? তাঁহার বিশ্বাস মতে দিবেন।’ তিনি তাহাতেও সম্মত হইলেন না। পরে এক দিন দিনে শু্যে আছেন, একটু তন্দ্রার মত হয়েছে, তখন দেখিলেন তাঁহার পিতা জোড়হাত করিয়া বলিলেন—‘বাপু, আমায় একটি পিণ্ড দিবে যাও।’ পুনরায় ঐ ঘটনা আমাকে বলায় আমি বলিলাম—‘যদি অগত্যা আপনি নিজে না দেন তবে আপনার প্রতিনিধি ক’রে একজন দ্বারা পিণ্ড দেন।’ একজন পাণ্ডাকে প্রতিনিধি করিয়া পিণ্ড দেওয়া হইল। তাহাকে লয়ে পিণ্ডদান দেখিহে আমি বিষ্ণু-মন্দিরে গেলাম। যখন পিণ্ড দেওয়া হইল তখন বাবুগীর ছুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘যখন পিণ্ড দেওয়া হইল তখন আপনি কাঁদিলেন কেন?’ তিনি বলিলেন—‘যখন পিণ্ড দেওয়া হইল, আমি দেখিলাম আমার পিতা অঞ্জলি ক’রে পিণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং পিণ্ড গ্রহণমাত্র তাহার পূর্ববশরীর বদলে গেল এবং একটি অভিনব উজ্জ্বল মূর্তি ধারণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ জানিলে আমি নিজেই দিতাম। আমার বড় ছুর্ভাগ্য যে আমি নিজ হাতে পিণ্ড দিতে পারিলাম না। ইহা বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।’

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪৬১১৫৭ পৃষ্ঠা।
(ফরিদপুর সদরদি নিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল রায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত)

বোলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল কুলীনগ্রাম নিবাসী বসু রামানন্দ বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বসু মহাশয় তাঁহার সদগুরু লীলা নামক পুস্তকে তদীয় গুরুদেব মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর লীলা বর্ণনা উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষয়টা হরিদাস বাবুর নিজ চক্ষের সম্মুখে সংঘটিত হয়। ঘটনাটি এইরূপ :—

১৩০০ বাং সনে প্রয়াগে কুম্ভ-মেলা উপলক্ষে গোস্বামী প্রভু তাঁহার শিষ্যগণসহ প্রয়াগ যান। গোস্বামী প্রভুর গুরু পরম-হংসজী তখন মানস সরোবরে ছিলেন। গোস্বামী প্রভুর শিষ্যগণ পরমহংসজীকে দেখিবার আগ্রহ প্রযুক্ত গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

শিষ্যগণ—এই মেলায় ভারতের সর্বত্র হইতে লক্ষ লক্ষ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের পরমহংসদেব আসিবেন না ?

গোস্বামী—তিনি ত আসিয়াছিলেন। তোমরা কি দেখ নাই ?

শিষ্যগণ—না, আমরা ত দেখি নাই।

গোস্বামী—আমরা মেলায় আসিবার সময় পুল হইতে যখন চরায় উঠি ঠিক সেই সময় একজন লোক ধিনি চরার উপর দাড়াইয়াছিলেন, আমি যঁাহাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ দিলাম, তোমরাও প্রণাম করিলে, তিনিই পরমহংস দেব।

হরিদাস বাবু—পরমহংস দেব কেন আসিয়াছিলেন ?

গৌসাই—তোমাদিগকে লইবার জন্য ।

হরিদাস বাবু—আমি তাঁহার যে চেহারা দেখিয়াছি তাহাই কি তাঁহার প্রকৃত চেহারা ?

গৌসাই—এ চেহারা তাঁহার নিজের নয়, ইহা কল্লিত চেহারা । তিনি একটা কল্লিত দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন ।

হরিদাস বাবু—তাঁহার নিজের দেহ কোথায় ?

গৌসাই—মানস সরোবরে ।

হরিদাস বাবু—কি অবস্থায় আছে ?

গৌসাই—সমাধি অবস্থায় আছে ।

হরিদাস বাবু—মানুষ কি দেহ হইতে বাহির হইয়া অশ্রু দেহ পরিগ্রহ করিতে পারে ?

গৌসাই—হাঁ, পারে । এই কল্লিত দেহ দুই প্রকারে হইতে পারে । মহাত্মারা সাধারণতঃ পঞ্চভূতের সৃষ্টাবস্থা পঞ্চীকরণদ্বারা কল্লিত দেহ পরিগ্রহ করেন ।

হরিদাস বাবু—পরমহংস দেবের পায়ে হাত দিয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার রক্ত মাংসের শরীর ।

গৌসাই— তাহাও হয় । ইহা একটু আয়াসসাধ্য । তোমরাও চেষ্টা করিলে পারিবে । দেহ ভগ্ন হইলেই অনেক সাধু ভগ্নদেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটা নূতন দেহ গড়িয়া লয়েন । কেহ কেহ দুই তিনবারও এইরূপ করিয়া থাকেন ।

হরিদাস বাবু—পরমহংস কল্লিত দেহে কেন আসিলেন ?

গৌসাই—লোকে টের পাইলে কি আর রক্ষা আছে ? মানুষ

যে স্বার্থপর। স্বার্থের জ্ঞাত তঁাহাকে ছিড়িয়া খাইবে।

হরিদাস বাবু—মানুষ আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটা দেহে প্রবেশ করিতে পারে এ বড় আশ্চর্য্য কথা !

গৌসাই—পূর্ব্বে আমিও এ কথা বিশ্বাস করিতাম না। এক দিন কয়েকজন লোক একটা মৃত দেহ সংকার করিতে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। এ কারণ তাহারা ঐ মৃত দেহটাকে নামাইয়া রাখিয়া একটু তফাতে গেল। পরমহংসদেব ঐ মৃত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমার নিকট উঠিয়া আসিয়া বলিলেন ‘কেমন ? এখন বিশ্বাস হয় ?’ আমি অবাক হইয়া বলিলাম ‘মহাশয়, আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা !’

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানবের দেহত্যাগের পরের অবস্থা

মানুষ দেহত্যাগ করার পর কিরূপ অবস্থায় পতিত হয় তদ্বিষয়ে ইতিপূর্বে প্রসঙ্গাধীন কিছু কিছু আলোচনা করা গিয়াছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদসমূহে পরলোকগত মানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সব ঘটনাবলী বর্ণনা করা হইতেছে তদ্বারাও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা অনেকটা বোধগম্য হইবে। তথাপি পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল নিবারণার্থ এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

দেহত্যাগের পরবর্তী অবস্থা বুঝিতে হইলে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বৈচিত্র্যময়। ইহাতে দুইটী বস্তু এক রকম নাই—দুইটী মানুষের এক চেহারা নাই। দুইটী ঘটনা ঠিক এক রকম নাই। সবই পৃথক পৃথক রকমের। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বৈচিত্র্যময় হইলেও ঐ বৈচিত্র্য বিশৃঙ্খল নয়। সমস্তই ঠিক একই সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। একই মহাশক্তির শাসনাধীনে একই বিধির বিধানমতে সাত প্রকারের সপ্তলোক সুশাসিত হইতেছে। এই পার্থিব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আজ পর্য্যন্ত কোন দুইটী লোক ঠিক একই অবস্থাধীনে একই প্রকারের

সুযোগ সুবিধা নিয়া ভূমিষ্ঠ হয় নাই। মরণ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। এই বৈচিত্র্য থাকা সম্বন্ধে আবার মানুষ মাত্রেই জন্ম মৃত্যু ব্যাপারে বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে। ইতিপূর্বে আলোচনা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আমরা এই পৃথিবীতে বাস করা অবস্থাতেই প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবী, প্রেতলোক এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকেই বাস করিতেছি। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীতে বাসের অবস্থাটা যখন প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, দেহতাগের পরের অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন রূপই হইবে।

আমরা জানিতে পারিয়াছি যে মৃত্যুতে কেবল অস্থি, মাংস নিশ্চিত দেহটাই চলিয়া যায়, তা ছাড়া সবই পূর্ববৎ থাকে। কাজেই মৃত্যু হওয়ামাত্রই দেহ বিছানায় পড়িয়া থাকিবে। দেহী তখন দেহের যন্ত্রণা হইতে এবং রোগযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া আশেপাশেই বিচরণ করিবে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কেহ ২৪ মিনিট কাল, কেহ ২৪ ঘণ্টা কাল অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। তারপরই পূর্বের জ্ঞান উপস্থিত হয়। জ্ঞান আসিলেই দেখিতে পায় তাহার দেহ সুস্থ হইয়াছে। কোনরূপ দৈহিক যন্ত্রণা নাই। তখনকার দেহটা যে স্থূলদেহ নয়, তাহা সে হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কারণ দেখিতে স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে বিশেষ প্রভেদ নাই। বিশেষতঃ হঠাৎ একটা গুরুতর পরিবর্তন হেতু সাধারণ লোকের বুদ্ধিবৃত্তি খানিকটা চঞ্চল হইয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে কিনা তাহাই হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরে যখন দেখে যে পার্থিব জড়দেহটা নিশ্চল অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে

এবং আত্মীয়স্বজন শোকে অভিভূত হইয়া কান্নাকাটা করিতেছে, তখন বুঝিতে পারে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে :

মানবজাতির নিম্নস্তরে এমন কতগুলি লোক আছে, যাহারা কেবল নিজের খাওয়া দাওয়া, দৈনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন ক্ষুদ্র দ্বীপে এখনও নরমাংসভোজী লোক আছে, তাহারা নিজের স্ত্রীপুত্রকে বধ করিয়া মাংস খাইতেও দ্বিধা বোধ করে না। এক সাহেব তাহাদিগকে সভা করার উদ্দেশ্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং অনেক সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সেখানে থাকিতেন। একটা লোক তাহার স্ত্রীকে বধ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়াছে শুনিতে পাইয়া তিনি তাহাকে ডাকাইয়া নিয়া অনেক উপদেশ দেন এবং পত্নীকে বধ করা যে অত্যন্ত অন্তায় হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক কথা বলেন। প্রত্যুত্তরে লোকটা সাহেবকে বলিয়াছিল যে তাহার স্ত্রী খুবই ভাল ছিল কারণ তাহার মাংসেতে সে বড়ই স্বাদ পাইয়াছিল ! ইহাদের মনে সংবুদ্ধি বা সংপ্রবৃত্তি আদবেই অঙ্কুরিত হয় নাই। এইরূপ লোক মরিলে পার্থিব বস্তু হারাইবার ভয়ে নিতান্ত জড়মড় হইয়া পৃথিবীকে আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে ; কারণ পার্থিব বস্তু ছাড়া আর কিছু সে জানেও না এবং অত্ন কিছুতে তাহার আসক্তিও নাই। কিন্তু তখন পার্থিব ইন্দ্রিয় না থাকায় পৃথিবীকে আকড়াইয়া ধরাটাও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে মনটা সঙ্গে থাকায় মনের সাহায্যে সে পার্থিব বস্তুর চিন্তা করিতে পারে ও অনুভব করিতে

পারে। তখন সেই মনের সাহায্যে পাখি-ব্যাপারে আংশিক বিজড়িত থাকায় তাহার সূক্ষ্মদেহের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি পরিস্ফুট হইতে পারে না। তখন তাহার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং হস্তপদাদি কতক ইহলোকের ও কতক পরলোকের ভাব ধারণ করিয়া একপ্রকার অকর্মণ্য হয়। কাজেই তাহার প্রেতদেহটাই সখ্যঙ্গসুন্দর ভাবে গঠিত হইতে পারে না। এই অবস্থাটা হওয়ার কারণ তাহার ঐহিক জীবনের কর্মদোষ। মরিয়াও সেই জীবনের ভাবনায়ই সর্বতোভাবে জড়িভূত থাকায় ঐ ভাবনা হইতেই দুর্গতির উদ্ভব হয়। পুত্র কিম্বা আত্মীয় স্বজনগণের শুভাকাঙ্ক্ষা ও শুভ-ইচ্ছা দ্বারা ঐ প্রকারের মৃত ব্যক্তির দুর্গতির লাঘব হয়। তজ্জগুই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পূরকপিণ্ডক আদি দিয়া ঐরূপ লোকের প্রেতদেহটী সুন্দরমতে গঠন করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সাধারণ ভাবের সংসারী লোক যাহারা একেবারে পশুপ্রকৃতি বিশিষ্ট নহে তাহাদেরও প্রেতদেহ গঠিত হইতে পূরক পিণ্ডের আবশ্যক হয় না। তবে আশঙ্কার স্থল বলিয়া সকলের সম্বন্ধেই সামাজিক নিয়মে পূরকপিণ্ড আদি দেওয়া হয়।

সচরাচর সংসারী লোকের মধ্যে যাহাদের প্রকৃতি ভালমন্দ মিশ্রিত—কুকর্ম করার প্রবৃত্তিটা যাহাদের অস্থিমজ্জাগত নয়—হয়তঃ সাময়িক উত্তেজনাবশে দুই একটা কুকর্ম করিয়াও ফেলিয়াছে এবং পরে তজ্জগু অনুতপ্তও হইয়াছে—হয়তঃ দৈনন্দিন কার্যে নৈতিকবলের প্রাবল্য পরিলক্ষিত না হইলেও মোটের

টুপার আত্মাটী নিতান্ত কলুষিত নয়,—এইরূপ লোকেরও তৎক্ষণাৎ না হটুক অন্ততঃ ২৪ দিনের মধ্যেই প্রেতদেহটী আপনা হইতেই গঠিত হইয়া যায়। জগদীশ্বরে অন্ততঃ আংশিক বিশ্বাসী, কিম্বা সুদৃঢ় নৈতিকবল বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা দেশহিতৈষী, লোক-হিতৈষী ব্যক্তি, অথবা দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পবিদ্যা আদিতে রসজ্ঞ ব্যক্তিদের কোন ভাবনারই প্রয়োজন নাই। তাহাদের প্রেতদেহ অতি অল্পসময়ে সুন্দররূপে গঠিত হইয়া যায়। কারণ, তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিতেই একথা জানিয়া গিয়াছেন যে উদ্ধ-লোকের প্রকৃতিও উদ্ধ। প্রেতলোক ইহলোকের উর্দ্ধে, কাজেই সেই স্থান ইহলোক হইতে অধিকতর সুন্দর, সুবিধাজনক ও আরামদায়ক। তাঁহারা ইহাও জানেন যে প্রেতলোকে গিয়াও ভুলোকের আসক্তি রাখা নির্বুদ্ধিতা মাত্র। জীবের তাহা সাধ্যায়ত্তও নহে। অকারণ চেষ্টা করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করা মাত্র। প্রেতদেহ গঠিত হইয়া গেলেই পরলোকগত ব্যক্তির নানাবিষয়ে বহুপ্রকারের সুবিধা হইয়া যায়। দৈহিক যন্ত্রণার লেশও থাকে না। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে, দম্বা তস্করাদি হইতে, বিদ্যাৎ অগ্নি জল প্রভৃতি হইতে, কিম্বা রৌদ্রবৃষ্টি আদি হইতে তাহার আর কোনরূপ অনিষ্ট বা উৎপাতের আশঙ্কা থাকে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। বস্তুর বাহির ভিতর দেখিতে পায়। সেই দেখাও অপার্থিব এবং অতি মনোরম। অপার্থিব সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পারে। তাহার নিকট স্থানের দূরত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকে না। ইচ্ছামাত্র যে কোন

স্থানে যাইতে পারে। কাকনজ্জ্বা, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গসকলও তাহার ইচ্ছাধিগম্য হয়। পাকা দেওয়াল বা লৌহশৃঙ্খল তাহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় না।

স্বাভাবিক অবস্থায় খাও পানীয় আদির অভাবজনিত কোন কষ্ট পরলোকগত ব্যক্তির হইতে পারে না। কারণ সূক্ষ্মদেহের পরিপোষণ জন্ম পাথিব কোন খাও বা পানীয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। সূক্ষ্মদেহের খাওও সূক্ষ্ম। তাহা ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। পরলোকগত ব্যক্তির মানসিক তৃপ্তির জন্ম তাহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহার ঐহিক বাসনানুযায়ী পাথিব বস্তু উৎসর্গ ও দান করা হয়। তাহা নিরর্থক নহে। তদ্বারা মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হওয়া সুনিশ্চিত।

মরিবার সময়ে যেরূপ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, মনোভাব আদি লইয়া দেহত্যাগ করে মৃত্যুর পরও ঠিক তদ্রূপই থাকে। হঠাৎ নূতন কোনরূপ জ্ঞান হয় না। দেহত্যাগ করার কিছুক্ষণ পূর্ব হইতেই পরলোকগত আত্মীয়স্বজনেরা আসিয়া সঙ্গী হন। যাঁহার যেরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট আত্মীয় বা হিতৈষী পরলোকে থাকেন তিনি সেইরূপ উপদেশ, বল, ভরসা ও সহায়তা পাইয়া থাকেন। তদতিরিক্ত নিষ্কামভাবে পরহিতকারী ব্যক্তিও অনেক আছেন, তাঁহারা আসিয়াও অনেককেই নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। অঙ্ক নিশুদিগের দেহত্যাগান্তে কোনরূপ ভয় বা ভাবনার কারণই নাই। তাহাদের পিতামাতা ভাই বন্ধু আদি হিতৈষীগণই তাহাদের আবশ্যক যা কিছু সবই করিয়া থাকে। সেখানেও

তাহার পিতামাতা ভাই বন্ধু আদি তাহার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকে ; এমনই সুবন্দোবস্ত ! তাহাদের খেলার সাথী থাকে, বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত থাকে, যাহা কিছু আবশ্যিক মনে করে সবই তাহারা পায় ।

মৃত ব্যক্তি ইহলোকের সব বস্তু বা প্রাণীর সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পায় তদতিরিক্ত পরলোকের সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট প্রাণী এবং বস্তুও তাহারা দেখিতে পায় । ইহলোকের কোন বস্তু স্বাভাবিক ভাবে ধরিতে বা বহন করিয়া নিতে পারে না । কারণ, নিজে সূক্ষ্মদেহী । সম্ভাব্যতঃ স্থূলবস্তু ধরিবার ক্ষমতা রাখে না । সাময়িক ভাবে স্থূলদেহ অবলম্বন করার ক্ষমতা যাহারা অর্জন করিয়াছে তাহারা স্থূলদেহ ধারণ করিয়া তবে স্থূলবস্তু ধরিতে ও বহন করিতে পারে । অত্যধিক আগ্রহের বলেও সময় সময় কাহারো কাহারো আশিক স্থূলদেহ পরিগ্রহ হয় । ইহলোকের আত্মীয়-স্বজনগণের সুখ, দুঃখ, ভাল-বাসা আদির অংশ মৃত ব্যক্তি ভোগ করে । কারণ, ভাবগুলি সূক্ষ্মবস্তু । সূক্ষ্মদেহীও তাহা গ্রহণ করিতে পারে । দয়া, মায়া, প্রীতি, আশ্ৰয় প্রভৃতির ফলসকল পরলোকগত ব্যক্তি অতিশয় বর্দ্ধিত আকারে পাইয়া থাকে এবং তাহাতে অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করে । কারণ, এই স্থূল জগতে ঐ সকল সূক্ষ্মভাবের যেক্রপ অভিব্যক্তি হয় সূক্ষ্ম জগতে তদপেক্ষা অনেক অধিক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । তজ্জন্মই যাহারা পরকালের সুখ শান্তি কামনা করেন তাহাদের গর্ভে ইহলোকে থাকা কালে দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, প্রীতি ভালবাসা পরোপকার প্রভৃতি মহৎ গুণের অনুশীলন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

যাঁহারা ইহলোকে ধর্মের অনুশীলন, জ্ঞানের চর্চা, জনহিতকর কার্য, জ্ঞানের পক্ষপাতী ইত্যাদি প্রকারের মহৎকার্যে লিপ্ত থাকেন বা লিপ্ত থাকার অনুষ্ঠান করেন কিম্বা অসুস্থতায় লিপ্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহারা পরলোকে গিয়া ঐ সব কাজেই অধিকতর উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হন এবং তাহাতে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ পান এবং সেই লোকে অত্যন্ত যশস্বী ও প্রতিষ্ঠাবান হইয়া থাকেন।

পরলোকের সুখ সুবিধা সম্বন্ধে সংক্ষেপে, বর্ণনা করা গেল। অসুখ অশান্তিও যে নাই, তাহা নহে। যাঁহারা নীচ মনোবৃত্তি লইয়া কিম্বা ঘোরতর হিংসা দ্বেষ আদি লইয়া দেহত্যাগ করে স্মৃদ্ধদেহে ঐ সকল মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার কোন সুবিধা না থাকায় তদ্রূপ মানসিক কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হয়। সুরাসক্তেরা সুরাপান করিতে অক্ষম হইয়া অশান্তি ভোগ করে। কামুকেরা হৃৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ না পাইয়া মানসিক যাতনা ভোগ করে। অত্যাচারী নৃশংস ব্যক্তিরা বিবেকের তাড়নায় অস্থির হয়। ঘোরতর সংসারাসক্ত লোক পরিত্যক্ত সংসার-চিন্তায় ব্যাকুল হয়। ইত্যাদি প্রকারে দুঃখ ভোগের কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। পারলৌকিক সুখ দুঃখ সর্বতোভাবে ইহলোকের কৃতকর্মের উপর নির্ভর করে। কবি অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বিষয়টা বর্ণনা করিয়াছেন :—

সুখস্ত দুঃখস্ত ন কোহপি দাতা, পরোদদাতিতি কুবুদ্ধিরেষা।

অহং করোমিতি বথাভিমানম, স্বকর্মসূত্রেঐথিতো হি লোকাঃ ॥

[সুখ বা দুঃখ অণু কেহ প্রদান করে না। পরে দেয় বলিয়া যে মনে করা হয় তাহা গুরুতর ভ্রম ও কুবুদ্ধি। নিজে করিতেছে বলিয়া লোকে যে অভিমান করে তাহাও বৃথা। যে হেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৰ্ম্মমূত্রে গ্রথিত আছে এবং তদনুযায়ী ফল ভোগ করিতেছে।]

নরক নামক বাতনা ভোগের নির্দিষ্ট স্থান থাকা প্রকৃত নহে এবং সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করতঃ আক্রোশমূলে কাহাকে কোনরূপ সাজা দেওয়া হয় না। অজ্ঞ ও মূর্থ লোককে ন্যূনপথে পরিচালিত করার মহত্বদ্রোশে আসল বিষয়টাকে রূপকের ছাঁচে ফেলিয়া কোন কোন পুরাণকার নরকের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা নিজের বিবেকেই নিজেকে সাজা দিয়া থাকে এবং ঐ সাজা ভোগ করতঃ নিজে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়। সুরাপায়ী সুরার অভাবে কয়েকদিন উদ্বেগ অশান্তি ভোগ করিলেই ক্রমশঃ তাহার কু অভ্যাস দূর হইয়া যায়। তখন আর তাহার কোন ক্লেশ হয় না। অনন্তকাল যন্ত্রণা ভোগ করা কিম্বা উত্তপ্ত তৈলে নিমজ্জিত থাকিতে বাধা হওয়া আদি কল্পনা নিতান্তই অলীক। ভগবান অনন্ত অপার করুণামিদ্ধ। স্বেচ্ছাচারী ভূপতির ন্যায় ক্রোধপরবশ নহেন।

ব্রাহ্ম ধারণার বশবর্তী হইয়া আমরা মনে করি যে, মৃত ব্যক্তিকে আমরা চিরদিনের জন্য হারাইলাম এবং মৃত ব্যক্তিও আমাদের চিরদিনের জন্য হারাইল। প্রকৃত প্রস্তাবে কেহ কাহাকে হারায় নাই। আসল বিষয়টা হইতেছে এই যে, আমরা

সকলেই এক সময়ে একই স্থানে থাকিয়া পৃথিবী, প্রেতলোক ও স্বর্গলোকে বাস করিতেছি। এ বিষয়টা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এই তিন লোকে বাস করিতে থাকাবস্থায় কোন একজন যদি দেহত্যাগ করে তবে স্থূলদেহ না থাকায় তদবধি তাহার পার্থিব জীবনের শেষ হইল কিন্তু প্রেতদেহ ও স্বর্গীয়দেহ রহিয়া গেল, এই দেহদ্বয়ের সাহায্যে সে প্রেতলোক ও স্বর্গলোকের অনুভূতি গ্রহণ করিতে পারিবে। কাজেই প্রেতলোক ও স্বর্গলোকে বাস করা তাহার পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে। অতএব প্রেতলোক ও স্বর্গলোক সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমরা একত্রেই বাস করিতে থাকিব। বাস্তবিক পক্ষে আমরা পরলোকগত ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রেই বাস করিতেছি। আমাদের জড়দেহটা থাকাতে এবং আমরা সর্বদা জড়ের ভাবনায়ই উৎকণ্ঠিত এবং ব্যাকুল থাকাতে আমাদের সূক্ষ্ম প্রেতদেহ ও স্বর্গীয় দেহ অক্ষম ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আমাদের সূক্ষ্ম দেহটির মলিনতা ও অকর্মণ্যতা হেতু স্থূল দেহবিহীন পরলোকগত সূক্ষ্মদেহ দেখিতে বা তাহার কথা শুনিতে বা তাহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না। আমাদের মধ্যে যাহারা জড়দেহ থাকা সত্ত্বেও জড়দেহের প্রতি এবং জড় জগতের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ কেবল সূক্ষ্মদেহের ও সূক্ষ্ম জগতের অনুশীলনে নিযুক্ত আছেন, তাহারা হাটে মাঠে ঘাটে লোকালয়ে অসংখ্য পরলোকগত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান। বর্তমানেও এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে। কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তির নিকট

তাহারা আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অনেক পাপী পরলোকগত ব্যক্তি তাহাদের কক্ষফলজনিত যাতনা ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রভু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় নিকট উপস্থিত হইত বলিয়া গোস্বামী প্রভু স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়া অনেকের সহায়তাও করিয়াছেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী ব্যক্তি এবং সি, ডাবলিউ লিড্‌বিটার, মেডেম ব্লেভেস্কি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঋষিগণও অনেকানেক পরলোকগত ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন। একটু তদন্ত করিলেই এই কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

পরলোকগত ব্যক্তির সাক্ষাৎ তাহাদের নিজ নিজ সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যে আমাদের সূক্ষ্ম দেহগুলি স্পষ্ট দেখিতে পায়। আমাদের স্থূলদেহ দেখিতে পায় না। প্রত্যেক স্থূল পদার্থেই তাহার একটা সূক্ষ্মদেহ বা অদয়ব আছে। কাজেই মৃত ব্যক্তির জগতের সব বস্তুই দেখিতে সমর্থ এবং দেখিতেছেও। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে পরলোকগত ব্যক্তির অনেকটা পার্থিব জগতের প্রতি বা পৃথিবীর মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায় না। তাহাদের রাজ্যে অধিকতর সুখ শান্তি ও আরামের বিষয় আছে। তাহারা ঐ সব বিষয়েই লিপ্ত থাকে। ছফ্ফতিসম্পন্ন ও অসংপ্রকৃতিবিশিষ্ট অতি অল্পসংখ্যক লোক পরলোক প্রাপ্তির পরও ঘৃণিত পার্থিব জীবনের আসক্তি ত্যাগ করিতে না পারিয়া অশান্তির সহিত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পৃথিবীর সাধারণ লোক অধিকাংশই দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন এবং পার্থিব বিষয়ে ঘোরতর আসক্ত। যাহাদিগকে সাধারণতঃ সংলোক বলা হয় তাহাদেরও অনেকেরই এই অবস্থা। কাজেই তাহারা ঐহিক জীবনে জড়দেহের আবরণের দ্বারা পারলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। এই সকল লোক সংপ্রবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া পরলোকে কোনরূপ বিপত্তি ভুগিবে না কিন্তু ইহলোকে থাকিয়া জাগ্রতাবস্থায় তাহারা পরলোকের ব্যাপার অনুভব করিতে পারে না। পরলোকগত ব্যক্তিরা যদিও তাহাদিগকে দেখিতে পায়—তাহাদের কথা শুনিতে পায়, তথাপি তাহাদিগকে সাধারণতঃ দেখা দিতে পারে না, তাহাদিগকে কোন কথা শুনাইতে পারে না, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলেও তদ্বারা কোনরূপ অনুভূতি জন্মাইতে পারে না। পরম্পরের মধ্যে অনুভূতির আদান প্রদান না হওয়ায় কিছু দিন পরে পরলোকগত ব্যক্তিদের পার্থিব ব্যাপারের আসক্তি কমিয়া যায় এবং তাহারা অধিকতর শাস্তিপ্রদ পারলৌকিক ব্যাপারেই লিপ্ত হয়।

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক আছে যাহারা জড়দেহ ত্যাগ করার পরও সাময়িকভাবে পুনরায় অল্প সময়ের জন্য জড়দেহ গ্রহণ করিতে পারে ও করিয়া থাকে। এক শ্রেণী হইতেছেন অতি উচ্চ স্তরের মানব; যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস, কাঠিয় বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি। তাহারা বহু জন্মব্যাপী সাধনা দ্বারা মানসিক বল এতাদিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন যে,

তাহারা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইয়া যায়। তাহাদিগকে জীবিতাবস্থায়ও ঠিক একই সময়ে বহুদূরবর্তী ছুটে কি তিন স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে, এবং দেহত্যাগের পরও মাঝে মাঝে অনুরূপ দেহ ধারণ করিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে এবং অনুরূপ লোকহিতকর কার্যা করিতে নিঃসন্দেহ রূপে জানা গিয়াছে। এই পুস্তকেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ করা মোটেই অস্বাভাবিক নহে।

অপর শ্রেণী হইতেছে নিতান্ত ঘণিত ও জঘন্য প্রকৃতির লোক। ইহারাও অসাধারণ মানসিক বলের দ্বারা অত্যন্ত সময়ের জন্য নূতন করিয়া অনুরূপ জড়দেহ নির্মাণ করতঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়া অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করার চেষ্টা করে। প্রবল প্রতিহিংসাবৃত্তি, স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ প্রণয়, দাম্পত্য প্রণয়, অপত্যস্নেহ প্রভৃতি কতগুলি ভাব কোন কোন লোকের মধ্যে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ঐগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের মনে উচ্ছৃঙ্খল ধরণের দুর্দ্দমনীয় বল সপগর হয়। ঐ সকল ব্যাপারে সফলতা লাভের জন্য অনেক নানারূপ জঘন্য কাজ করিতেও প্রস্তুত হয় এবং করিয়া থাকে। ঐরূপ দুর্দ্দমনীয় বলের সাহায্যে কোন কোন পরলোকগত ব্যক্তি সাময়িকভাবে অনুরূপ জড়দেহ ধারণ করতঃ সাধারণ লোককেও দেখা দিতে কিম্বা তাহাদের সঙ্গে আলাপাদি করিতে পারে। এইরূপ একাধিক প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। এইরূপ করাটা বাঞ্ছনীয় নহে ; কারণ, ইহা পরলোকগত ব্যক্তির ঘোরতর

অশাস্তি ও তজ্জনিত দুর্গতির পরিচায়ক। সাধারণ আসক্তিতে ঐরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় না।

ইহজীবনে যাঁহারা সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা, কলা-শিল্প প্রভৃতিতে কৌতূহল ও অনুরাগ বিশিষ্ট অথবা যাঁহারা দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি সংশাস্ত্রে অনুরাগী, কিম্বা জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম বৈরাগ্য প্রভৃতি ধম্মানুশীলনে অনুরক্ত, কিম্বা যাঁহারা সহশ্রুণুযুক্ত, তাঁহাদের পক্ষে পরলোক ইহলোক হইতে সহস্রগুণে সুখ ও আনন্দদায়ক। কারণ, ঐ সকল সূক্ষ্ম জ্ঞানের চর্চায় ইহলোকে যে পরিমাণ আনন্দ বা আত্মপ্রসাদ লাভ হয় সূক্ষ্ম পরলোকে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যাঁহারা সাধারণ ভাবের সংসারী লোক, যাঁহারা চলনসই গোছের সং ও অসং প্রবৃত্তির মিশ্রিত অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছেন—যাঁহারা কুকাজ করাটা পছন্দ করেন না অথচ সচরাচরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকাজ করিতেছেন, তাঁহাদের পরলোকের অবস্থাও ইহলোকের অবস্থার চেয়ে অনেক ভাল হয়।

সচরাচর সংসারী লোকের পক্ষে পরলোকের বাস্তবতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করার একটা গুরুতর বিষয় বর্তমান রহিয়াছে। ভুক্তভোগী বলিয়া এই প্রতিবন্ধকতার স্পষ্ট উল্লেখ করাট আবশ্যক মনে করিতেছি। বিষয়টা হইতেছে এই যে, আমরা মাটি, ইট বা প্রস্তরের উপর বাস করি—আমাদের দেহটা হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদি ঘোরতর স্থূল পদার্থ দ্বারা নিষ্কিত—আমরা আভার করি কতকগুলি শক্ত বা অমৃত: তরল বস্তু—আমাদের যানবাহনাদি

সবই কঠিন বস্তু—আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য আসবাব-পত্র সবই কঠিন বস্তু নির্মিত, সূক্ষ্ম বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই নয়। আমরা কঠিন বস্তুতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে সূক্ষ্ম বস্তু সম্বন্ধে বেগনরূপ ধারণাই করিতে পারি না। আমাদের ধারণা অনুসারে বায়ুগ্ৰীই অতি সূক্ষ্ম বস্তু। বায়ু সঞ্চরণশীল বলিয়াই আমরা ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হই। বায়ুকে আমরা একটি বস্তু বলিয়াই মনে করিতে পারি না। বায়ু দ্বারা কোন কিছু প্রস্তুত হওয়া কিম্বা প্রস্তুত হইলেও সেইটী একটা জিনিষের মতো গণ্য হওয়া আমাদের ধারণাতীত। বায়ু হইতে আকাশ সূক্ষ্ম। আকাশের ধারণা আমাদের নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। “আকাশ কুসুম” কথাটা অলৌক বস্তুতে প্রয়োগ করা হয়। কাজেই আকাশ দ্বারা যে কোন জীবদেহ গঠিত হইতে পারে বা জীবের ব্যবহারোপযোগী কোন জিনিষ হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণাতে আসে না। এখন আকাশ ও বায়ু হইতেছে জড়জগতের বস্তু। অবশ্য গাছ পাথরের তুলনায় ইহার সূক্ষ্ম কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের বস্তুর তুলনায় ইহার স্থূল—অতি স্থূল। কারণ, এট্রেল প্লেন বা প্রেতলোকে যে সকল বস্তু আছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গাঢ় বস্তু যাহা তাহাও আকাশ হইতে সূক্ষ্ম। চিন্তা করিয়া দেখুন, বায়বীয় দেহ বলিলেই আমরা যখন একটা অলৌক কোন কিছু বলিয়া মনে করিয়া বসি, তখন প্রেতলোকের মানুষ আমরা কিরূপে ধারণা করিব? যে যাহাতে অভ্যস্ত নয় সে তাহার ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। পাথরগুলির যদি

বুদ্ধি থাকিত, তবে হয়তঃ ইহারা এই মনে করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত যে মাটীগুলি আছে কি করিয়া আবার মাটী হয়ত বৃক্ষলতাদির অস্তিত্ব দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইত। সেইরূপ জলচর জন্তুগুলি স্থলচর প্রাণীর অস্তিত্ব দেখিয়া অবাক হইয়া যাইত। জলে ছাড়াও যে প্রাণী বাঁচিতে পারে তাহা জলচর জন্তু কি করিয়া বুঝিবে? সেইরূপ প্রেতলোকবাসীরা আমাদের ভুলোকবাসীদের অবস্থা দেখিয়া চুঃখ প্রকাশ করে। আমাদের এক এক জনের ঘাড়ে দিবারাত্রি সোয়া নগ্ন পরিমাণ অস্থিমাংসের বোঝা চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার উপরে আবার বায়ুর বোঝাটাও নিতান্ত কম নহে। একটা ছালার ভিতরে মানুষকে আটকাইয়া রাখিলে তাহার যে অবস্থা হয়, পরলোকবাসীদের চক্ষু আমরাও ঠিক সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছি।

এখন বিবেচনা হইতেছে এই যে সূক্ষ্ম জগতের বিষয় আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব? একটু চিন্তা করিলে আমরা অনুভব করিতে পারি যে আমাদের ভিতরে একটা মন আছে এবং তদোপরি আর একটা বুদ্ধিবৃত্তি আছে। ইহারা এই জগতের স্থূল পদার্থ নহে। মনটা স্থূলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আছে। সেই আবার বুদ্ধিবৃত্তিকেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। মনের ভাবগুলি বুদ্ধিবৃত্তিকেও সর্বদাই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন রাখিয়াছে। আমরা যদি পরলোকতত্ত্ব বুঝিতে চাই তবে সেইটা মন বুদ্ধির সাহায্যেই সম্ভব হইবে—জড়পদার্থের দ্বারা নহে। তবে মন ও বুদ্ধির গুরুতর উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক।

মনের সাহায্যে চিন্তা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে সূক্ষ্ম বস্তুগুলি অবহেলার জিনিষ নয়। সূক্ষ্মই স্থূলের জননী। সূর্য্য কিরণের কয়েকটা রশ্মি একত্র করিলেই আগুন হয়। বড় বড় গাছপালা পাথরাদির মূল উপাদান সূর্য্য-কিরণ, ইহা বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষিত সত্য। স্থূল জলের দ্বারা গাড়ী চলে না কিন্তু জলের সূক্ষ্মাবস্থা বাষ্পের জোরে অঘটন সংঘটন হয়। ইহার জোরে ট্রেন ষ্টিমার আদি বেগে প্রধাবিত হয়। আকাশ হইতে ইথার সূক্ষ্ম। সেই ইথারের স্পন্দনে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই অতি সূক্ষ্ম ইথার বজ্রের জননী। সেই ইথারের স্পন্দনে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়া মোটর লরী, ট্রাম আদি চলিতে আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি অথচ ইথার কিন্তু আমাদের অদৃশ্য অতি সূক্ষ্ম বস্তু। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্রমে নিয়া যতই সূক্ষ্ম করা যায় ততই ইহার কার্য্যকরী শক্তি বাড়িতে থাকে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

বর্ণগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে স্থূল অবস্থাতে ইহাদের শক্তি প্রকাশিত হয় না। বটিকাকারে থাকাবস্থায় লাল, কাল, ভায়লেট, সবুজ আদি কালির বড়ি সবই কাল। ইহারা স্থূলদেহ ধারণ করায় সবই নিকৃষ্ট কাল রঞ্জের দেখা যায়। স্থূলদেহের দরুণই ইহাদের দুর্গতি। জলে গলাইয়া যতই সূক্ষ্ম করা যাইবে ততই ইহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

এই পরিচ্ছদে মানুষের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলা হইল তাহা জীবিত ও পরলোকগত সত্য সংকল্প ও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বহু মহাপুরুষের সম্মুখে প্রচারিত বাণী।

পরলোক মানুষের অনধিগম্য নয়। পরলোক ও পারলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার প্রকৃষ্ট প্রণালী মানব সমাজে বিধিবদ্ধরূপে প্রচারিত রহিয়াছে। যাঁহারা ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া নাশনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই বিষয়ে একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। বর্তমানে থিওসফিকেল সোসাইটীর বহু সদস্য কিরূপে পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন তাহার বিবরণ এই পুস্তকে খানিকটা বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই সব লোকও আবার কিরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট তাহা যদি অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাইবে যে বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক চরিত্রবলে পৃথিবীতে ইহারা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কয়েকটা নামও উল্লেখ করা যাক্ :—মেডেম্ ব্লেভিস্ক, কর্ণেল মালকট, স্মার অলিভার লজ, লর্ড লিটন, মিঃ বেলফোর, রাইট্ রেভারেণ্ড্ সি, ডাবলিউ, লিড্‌বিটার, এনি বেসান্ট, লর্ড্ ব্রাগহাম্, উইলিয়াম্ ট্রুক্স্। ইহা ছাড়া ভগবান বুদ্ধদেবের মহাধর্মের মূল ভিত্তিই হইতেছে পরলোকের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ত গীতায় পাইতেইছেন। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দেহত্যাগের ৪০ দিন পর পুনরায় সশরীরে কবর হইতে উত্থিত হইলেন! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাসের মূল মহাভারত খানা এবং মহর্ষি বাল্মিকীর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ খানার প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখিবেন, ঐ সকল মহর্ষিদের জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রতিভার নিকট গোটা হিমালয় পর্বতটীও খাট হইয়া যায় কিনা। যোগবাশিষ্ঠে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের উক্তিসমূহে তাঁহার

মানব বল কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে লক্ষ্য করুন। ঐ বলের নিকট শত মত্ত হস্তীর দৈহিক বলও অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হয় না কি ?

এখন বলুন দেখি, ঐ সকল মহামানবের নির্দেশমতে আমরা স্বয়ং পরলোক প্রত্যক্ষ করার চেষ্টাও করিব না, অথচ তাঁহারা নিজে যাহা দেখিয়াছেন তাহাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছন্তঃ করিব—আমাদের বিচার বুদ্ধির এ কেমন অবস্থা ? তথাপি যাহাদের সন্দেহ দূর হয় না, তাহাদের কর্তব্য হইবে সেই অলৌক সন্দেহের হেতুবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করা। যদি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন তবে কিছুকাল পর্যান্ত প্রত্যহ একবার করিয়া ঐ কল্পিত হেতুগুলির বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকিলে হঠাৎ একদিন দেখিবেন যে আপনা হইতে ঐ হেতুগুলির অসারতা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন সত্যের বিমল জ্যোতিতে চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। চিত্ত-বিশ্রমকারী শোক ও মৃত্যুর ভয় অন্তর্হিত হইবে। প্রকৃত শান্তি লাভ করিবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেতাশ্রম আর আবির্ভাব

এমন এক কাল ছিল যখন তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিতগণ ভৌতিক ঘটনার নাম শুনিলেই তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিত। যাহারা ভৌতিক ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করতঃ অবিশ্বাস করার কোন কারণ পায় নাই তাহারাও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তাচ্ছিল্যের ভয়ে তাহা প্রকাশ করিত না। তদ্রূপ অনেকানেক প্রেতাশ্রম আবির্ভাবের ঘটনার বৃত্তান্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক গ্রামে অসংখ্য বার প্রেতাশ্রম সশরীরে দেখা দিয়াছে, এরূপ অসংখ্য ঘটনার জাজ্জল্যমান প্রমাণ আজও বর্তমান রহিয়াছে। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বিস্তার হওয়ার প্রারম্ভে স্বল্প শিক্ষিত যুবকগণের মস্তিষ্কে একটা চাঞ্চল্য আসিয়াছিল।

এক কালে এমন হইয়াছিল যে মদ্য-পান ও মোরগ-ভক্ষণ শিক্ষিতের লক্ষণ স্বরূপেই পরিগণিত হইত। তখনকার বিচারে সর্ব-ত্যাগী ঋষিগণ স্বার্থপর বলিয়া সাব্যস্ত হইতেন। হিন্দুধর্ম নিতান্ত অসভ্যজনোচিত পৌত্তলিকতা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। তন্ত্র-শাস্ত্রগুলি চুরি, ডাকাতি ও ব্যভিচার করার সুবিধার জন্য প্রস্তুত হওয়া বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। আরও কত কিছু উচ্ছিন্নতা

আসিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করার চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাহি। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে মিথ্যা কখনো স্থায়ীরূপে জয়ী হইয়া থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ এই সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য মনোবীক্ষণের উদারতা, সত্যপ্রিয়তা এবং গভীর গবেষণাই অনেকস্থলে ভ্রম অপনোদনের মুখ্য কারণ। হজ্জাত্তা তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বর্তমানে ভৌতিক ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করা চলে না। এখন ভৌতিক আবির্ভাবের ঘটনা অনুসন্ধান ও তথ্য নিরূপণের জন্য সাইকিক রিসার্চ সোসাইটী নামে একটি বিরাট শক্তিশালী সমিতির কার্য চলিতেছে। আর উইলিয়াম ফ্রোকস ও আর অলিভার লজ্জ-এর আয় সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্যগণ এবং ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব মন্ত্রী লর্ড বেলফোরের আয় ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ বান্ধি যে সমিতির সদস্য, এই সমিতিকে আর টিটকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

স্বনামধন্য পাশ্চাত্য মনোবীক্ষি ডাবলিউ টি, ষ্টেড্ মহোদয় তাহার প্রণীত “Real Ghost Stories” নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

“Of all the vulgar superstitions of the half-educated none dies harder than the absurd delusion that there are no such thing as ghosts. All the experts, whether spiritual, poetical or scientific, and all the other non-experts who have bestowed any serious

attention upon the subject know that they do exist. There is endless variety of opinion as to what a ghost may be. But as to the fact of its existence, whatever it may be, there is no longer serious dispute among honest investigators. If any one questions this, let him investigate for himself. In six months, possibly in six weeks or even in six days he will find it impossible to deny the reality of the existence of the phenomena popularly entitled ghostly. He may have a hundred ingenious explanations of the origin and nature of the ghosts, but as to the existence of the entity itself there will no longer be any doubt."

ভাবার্থ :—অন্ধশিক্ষিতদের মধ্যে অনেক রকমের ঘৃণিত কুসংস্কার বর্তমান থাকে। তন্মধ্যে ভূত প্রেতের অস্তিত্ব না থাকার সিদ্ধান্তটিই অধিকতর জঘন্য। ধর্মপথাবলম্বীই হউক কিম্বা কবিই হউক অথবা বৈজ্ঞানিকই হউক—এই বিষয়ে যাহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন যে ভূত প্রেতের অস্তিত্ব আছে। এমন কি বিশেষজ্ঞ ছাড়াও যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত মনোযোগ দিয়াছেন তাঁহাদেরও এ সম্বন্ধে ঐ একই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। ভূত প্রেতের প্রকৃতি কিরূপ এ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রকারের মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু

ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুবর্গের মধ্যে কোনরূপ প্রকৃত মতভেদ নাই। এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিলে তাঁহার নিজেরই তদন্ত করা উচিত। নিজে তদন্ত করিলে তিনি ৬ মাস মধ্যে— সম্ভবতঃ ৬ সপ্তাহ মধ্যেই—কিন্তু ৬ দিনের ভিতরেই—তিনি জানিতে পারিবেন যে ভূত প্রেতের আবির্ভাব সম্বন্ধে অস্বীকার করা অসম্ভব। ভূতের উৎপত্তি কিদা প্রকৃতি হইত নানাজনে নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু জাবটীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রাপ্ত প্রেতাত্মা সংক্রান্ত চর্চা সমিতির (Society for Psychical Research) বহুকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা বর্তমানে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সংক্রান্ত সর্বপ্রকারের সন্দেহ সর্বত্রোভাবে দূরীভূত হইয়াছে। উক্ত সমিতির সদস্যগণ পৃথিবীর সর্বদেশে প্রেতাত্মার আবির্ভাব সংক্রান্ত বহুসংখ্যক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতঃ তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর ঘটনাবলী এতদূর সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়াছেন যে, সচরাচর যাহারা ঐগুলিকে অবাস্তুর বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন তাঁহাদের অধিকাংশই ঐরূপ দক্ষতার সহিত পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করিতে অসমর্থ। সমিতি কর্তৃক লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর অতি ক্ষুদ্র অংশ পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র বহিতে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তথাপি স্থূলভাবে বিষয়টা অনুধাবন করার জন্য অল্প কয়েকটা ঘটনা এ স্থলে বিবৃত করা যাইতেছে।

ভৌতিক ঘটনা মাত্রই যে পরলোকগত আত্মা দ্বারা সংঘটিত

হয় তাহা নহে। কোন কোন স্থলে জীবিত মানুষের উৎকট বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি ঠিক ঐ জীবিত লোকটার মূর্তি ধারণ করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অগ্নিত্র দেখা দেয় এবং অভীষিত কার্য সম্পাদন করে। এইরূপ ঘটনা দ্বারা মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ না হইলেও মানুষের সূক্ষ্মদেহ যে স্থলদেহের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে থাকিতে সক্ষম তাহা প্রমাণ হয় কাজেই তদ্বারা এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে দেহত্যাগের পর মানুষের সূক্ষ্মদেহ বর্তমান থাকি আয়ৌত্তিক বা অসম্ভব নয়। নানাকারণে কোন কোন আত্মা স্থল দেহত্যাগের প্রাকালেও দূর দেশবাসী প্রিয়জনের নিকট দেহধারণ করিয়া উপস্থিত হয় ও কথা বলে। মৃত্যুর পরেও অসংখ্য প্রেতা আত্মা দৃশ্যতঃ অবিকল জীবিত কালের দেহের আয় দেহধারণ করিয়া দেখা দেয়। কোন স্থলে বা প্রেত-লোকবাসী কোন দূরত্ব ছলনাক্রমে দৃশ্যতঃ অগ্নির দেহের অনুরূপ দেহধারণ করিয়াও উপস্থিত হয়। কেহ কেহ আবার কোন কোন অবস্থাতে নিজের উৎকট কোন মনোবৃত্তিকেই মূর্তিমন্ত প্রেতা আত্মার আয় দেখিয়া প্রতারিত হন। বাস্তবিক সেখানে প্রেতা আত্মা আসে নাই। ঐ সকল ঘটনা অসংখ্য প্রকারের। তন্মধ্যে জীবিত মানুষের আত্মা যে অল্প সময়ের জন্য দেহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া কাজ করে এবং পুনরায় নিজ দেহে ফিরিয়া আসে এই ধরনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

অনেকে হয়ত মেসমেরিজম্‌এর (সম্মোহন বিদ্যা) বৈঠক

দেখিয়াছেন। এই বিচার চর্চা সব দেশেই আছে। বৈঠকগুলি সাধারণতঃ গোপনে হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এই সকল বৈঠককে ইংরেজীতে সিয়ান্স (Seance) বলা হয়। তাহাতে একটা তবলমতি লোকের প্রয়োজন হয়। এই লোকটীর ব্যক্তিত্ব সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া তাহার দেহেতে প্রেতাত্মার আবির্ভাব করান হয়। এই লোকটীকে মিডিয়াম্ বলা হয়। মেস্‌মেরিজম্, সিয়ান্স, মিডিয়াম্ প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ প্রয়োগের আবশ্যক হইবে বলিয়া এই শব্দগুলির ভাবার্থ বলা হইল। নিম্নে যে ঘটনা বিবৃত করা হইল তাহাতে মেস্‌মেরিজমের কোন সংশয় নাই।

মেডেম্ ডি এস্পোরেন্স নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলা খুব ভাল মিডিয়াম্ বটেন—অর্থাৎ সিয়ান্সে মিডিয়ামের কাজটা তাহার দ্বারা খুব ভাল চলে। এই কাজের সংশ্রবে থাকা হেতু পরলোক-তত্ত্ব জানিবার খুব তীব্র আগ্রহ তাঁহার আছে, এবং বহু গবেষণা দ্বারা তিনি এই বিষয়ের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নিজের আত্মা একদিন অল্প সময়ের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার প্রণীত ছায়ালোক (Shadow Land) নামক গ্রন্থের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় তিনি এই কণিক দেহত্যাগের বিবরণ দিতেছেন :—

“একদিন গ্রীষ্মকালের কোন এক রবিবার প্রাতঃকালে বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে, এমন সময়ে আমি একখানা বই হাতে লইয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিরূপে

ভাবার্থ :—এ বিষয়ে আমি নিজেও সাক্ষ্য দিতে পারি যে একজন সুস্থ ও বলবান লোক তাহার স্থূলদেহ ছাড়িয়া দাড়াইলে তাহার মধ্যে অবর্ণনীয় স্বাস্থ্য, বল,—কার্যক্ষমতা এবং স্বাধীনতা আসে। দুর্বল ও রোগা লোকের পক্ষে এই অবস্থাস্থরটা আরও গুরুতর বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি আজ কাল যে দেহ রাখিয়া পরলোকে যাওয়ার ব্যাপারটা দৈনিক ঘটনাতো পর্যাবসিত হইয়াছে তথাপি যেন ইহা নিত্য নূতন আশ্চর্য্য এবং কয়েদখানা হইতে সূর্য্য কিরণে যাওয়া, দুর্বলতা ও অক্ষমতা হইতে শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে লাফাইয়া পড়ার ন্যায় মনে হয়।

সুপ্রসিদ্ধ এম্ গ্রেন্ডিলি ডিলেনি সাহেব তাঁহার “ভবিষ্যৎ জীবনের প্রমাণ” (Evidence For A Future Life) নামক গ্রন্থে অনেকগুলি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটি একজন ৩০ বৎসর বয়স্ক বুদ্ধিমান লোকের নিজ জীবনের কথা। এই লোকটী নিজে বলিতেছেন :—

“কয়েক দিন পূর্বে একদিন অপরাহ্নে ১০টার সময় বাড়ীতে আসিয়া অতি অদ্ভুত রকমের একটা অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। কেন যে এরূপ হইল তখন বুঝিতে পারিলাম না। বিছানায় না যাওয়া স্থির করিলাম এবং লেম্পটা জ্বালাইয়া বিছানার নিকটস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া একটা সিগারেট জ্বালাইয়া টানিতে লাগিলাম। কয়েক টান দিয়া একটা ইজি চেয়ারের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তারপর নিতান্ত

অদৃশ ভাবে শরীরটা রাখিলাম। মাথা সরিয়া গিয়া বালিশের উপরে রহিল। তখন অনুভব হইতে লাগিল যেন জিনিষপত্র সব ঘুরিতেছে। মাথাঘুরা বোধ করিলাম। অকস্মাৎ অনুভব হইল যেন আমি হঠাৎ সরিয়া প্রকোষ্ঠের মাঝখানে গিয়াছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ সরিয়া যাওয়া দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম। চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলাম এবং কোতুকটা আরও বন্ধি পাইল।

প্রথম অনুভব করিলাম যে বিছানাতে পড়িয়া আছি। বাঁ হাতে সিগারেট ধরা আছে এবং কন্ফুয়ের উপরিভাগ সমস্তটা উরুদিকে রাখিয়া সিগারেটটা ধরিয়া আছি। সিগারেটটা জ্বলিতেছে। লেম্পের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া যে কিছু আলো বাহির হইতেছে তদ্বারা সিগারেটটা দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ মনে করিলাম আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি এবং যাহা কিছু অনুভব করিতেছি সবই স্বপ্ন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এমন স্বপ্ন তো জীবনে কখনো দেখি নাই। সবই যে অত্যন্ত প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। স্বপ্নে তো তাহা হয় না। এখন যে সব জিনিষের সংশ্রবে আছি তাহা এত প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে যে জীবনে জাগ্রতাবস্থায়ও কখনো এরূপ ভাব হয় নাই। এইরূপ ভাবিয়া স্বপ্নের ধারণাটা দূর হইল, কিন্তু আশঙ্কা হইল না জানি আমি মরিয়াছি।

আমি যেন প্রেতাঙ্গাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। নিজেও প্রেতাঙ্গা হইয়াছি বলিয়া মনে হইল। পারলৌকিক

বিষয়ে আমি যা কিছু শিখিয়াছিলাম ত্যাং যেন সব আসিয়া আমার স্মৃতিতে উদ্ভিত হইল। মনে মনে আক্ষেপও হইতে লাগিল যে জীবনের কর্তব্য অনেক কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া আসিলাম।

দারপার বিছানায় পতিত দেহটা মৃতদেহ মনে করিয়া ইহার নিকটে গেলাম। গিয়া দেখিলাম ইহার শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইতেছে। দেহের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তখন ভাবিলাম ‘না, আমি তো মরি নাই’—তবে আমার উপর অদ্বৃত রকম কোন আবেশ হইয়াছে। মনে মনে আবার আশঙ্কা হইতে লাগিল ‘না জানি এমন আশ্চর্য্য একটা ঘটনা ভুলিয়া যাই—সংজ্ঞা লাভ করার সময় স্মরণ না থাকে।’

খানিকটা উৎসাহান্বিত হইয়া নিজে নিজে চিন্তা করিলাম ‘এই ভাবটা কতক্ষণ থাকিবে?’ তখন বিছানায় পতিত দেহটার প্রতি লক্ষ্য রাখিলাম না। লেম্পটার দিকে চাহিলাম। আলোটা বেশ জ্বলিতেছিল। এবং মনে করিলাম ইহা বিছানার অত্যন্ত নিকটে রহিয়াছে। না জানি মশারিতে আগুন ধরিয়া উঠে! আলোটা নিবাইবার উদ্দেশ্যে লেম্পের নির্ঝাপক কাঠিটা ধরিতে গেলাম। কি আশ্চর্য্য! কাঠিটির প্রত্যেক পরমাণু আমার হাতে বাজিতেছে। কাঠি ঘুরাইতে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু আমার আঙ্গুলগুলি নড়িল কিন্তু লেম্পের কাঠি নড়িল না। বাতি নিবান হইল না।

তখন আমি নিজকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে আমার হাতটা শরীরের অন্য অংশের ভিতর দিয়াও পরিচালনা করিতে পারিতেছি। অর্থাৎ দেহের এক অংশ অন্য অংশের গতি রোধ করিতেছে না। তথাপি দেহের অন্তর্ভূতিটা বেশই আছে। ধব্ ধবে সাদা পোষাকে আবৃত আছি। তখন আমার আয়নাটার সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। এ কি! আমার প্রতিকৃতি দেখিতেছি না; পক্ষান্তরে আয়নার পিছন দিকটা, তৎপিছনস্থিত দেওয়ালটা এবং দেওয়াল ভেদ করিয়া পিছনদিকস্থিত অন্যান্য বস্তু দেখিতে লাগিলাম। পার্শ্ববর্তী বাড়ীর কোঠার ভিতরস্থিত জিনিষপত্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম। ঐ কোঠাতে কোন আলোক ছিল না কিন্তু আমার ঐ অদ্ভুত দেহ হইতে একটা অদ্ভুত জ্যোতিঃ বাহির হওয়া লক্ষ্য করিলাম এবং তৎ সাহায্যে ঐ বাড়ীর প্রকোষ্ঠের ভিতরটা সব দেখিতে লাগিলাম। পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোকেরা আমার পরিচিত ছিলেন না। তিনি কার্যোপলক্ষে নিজে পেরিস মহানগরেতে ছিলেন। আমার একটা ভাব হইল যে ঐ বাড়ীর কোঠার ভিতরে যাউব। যেই মনে করিলাম এমননি আমি ঐ কোঠার ভিতরে!! কিরূপে গেলাম জানি না কিন্তু আমি যে দেওয়াল ভেদ করিয়া দেখিতে পাইতেছি সেইরূপ দেওয়াল ভেদ করিয়া গিয়াছি বালিয়াই মনে হইল। মোট কথা জীবনে এই প্রথম আমি সেই কোঠার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে সবগুলি প্রকোষ্ঠ পরিদর্শন করিলাম এবং যাহা যাহা দেখিলাম মনোযোগের সহিত মনে অঙ্কিত করিতে

লাগিলাম। এক কোঠায় একটা পুস্তকের লাইব্রেরী দেখিলাম। সে-ফের ভিতরে বইগুলি সাজান রহিয়াছে এবং সোনালী অক্ষরে বই-গুলির নাম ছাপান দেখিলাম, কি কি বই আছে তাহা লক্ষ্য করিলাম।

এমন একটা অবস্থা ঘটিল যে কোন স্থলে যাওয়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টার আবশ্যক রহিল না। মনে করিলাম, আর যাওয়া হইয়া গেল !! এর পর হইতে আমার স্মৃতিশক্তি খানিকটা গোলমালে হইয়া গেল। কেবল এইমাত্র মনে আছে যে আমি অনেক দূরবর্তী বহুস্থানে গিয়াছি এবং বহুস্থান দেখিয়াছি। ইটালী দেশেও গিয়াছি বলিয়া মনে হয়। তৎপর আমার ইচ্ছার উপরও আমার কর্তৃত্ব রহিল না। নানাপ্রকার ভাব আপনা-আপনি হইতে লাগিল, নানাস্থানে যাইতে লাগিলাম। তৎপর রাত্র ৫টার সময় জাগ্রত হইয়া দেখি শীতে শক্ত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। সিগারের কতকাংশ হাতে রহিয়াছে। বাতিটা আপনা আপনি নিবিয়া গিয়াছে। চিম্নাটা কাল হইয়া গিয়াছে। বিছানায় পড়িয়া রহিলাম কিন্তু ঘুম আসে না। শরীর শিহরিতে লাগিল! অবশেষে ঘুম আসিল। জাগিতে অনেক বেলা হইল।

পরদিন পার্শ্ববর্তী বাড়ীর পাহারাওয়ালাকে চতুরতার সহিত বলিলাম ‘দেখ দেখি তোমাদের কোঠার জিনিসপত্রগুলি ঠিক ভাবে আছে কি না।’ সে দোর খুলিল। আমিও সঙ্গে গেলাম। রাত্রে যে সকল জিনিস দেখিয়াছিলাম সব দেখিতে পাইলাম। লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি ঠিক ঠিক মিল হইল !!!

ইংলণ্ডের ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্রমওয়েল ভালী তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

“আমি চিনামাটি প্রস্তুতের সন্ধান পরীক্ষা করা উপলক্ষে এক প্রকার এসিডের ধূয়া প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেছিলাম। ঐ ধূমে শ্বাস নেওয়ার দরুণ আমার গলদেশে খিচুনী হয় এবং কণ্ঠ হইয়া পড়ি। ঐ খিচুনীর দরুণ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাইত। সালফিউরিক্ ইথার নামক ঔষধ শুকিবার জগ্ন আমাকে ডাক্তার পরামর্শ দেন এবং তাহাতে বেশ উপকার বোধ করিতে থাকি। কয়েকদিন ব্যবহারের পর গন্ধটা আমার অসহ্য হওয়ায় ঐ ঔষধ ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়া ক্লোরোফর্ম শূকিতে আরম্ভ করি। ক্লোরোফর্ম শূকিয়া অজ্ঞান হওয়ার পরও যাহাতে নাকের নিকট ইহা থাকিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে (বেশী শূকিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী) এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া জিনিসটা শূকিতাম যেন অজ্ঞান হওয়া মাত্র আমি পিছনদিকে পড়িয়া যাই এবং ক্লোরোফর্মের স্পঞ্জটা সম্মুখের দিকে মাটিতে পড়িয়া যায়। ঘটনাক্রমে একদিন এমন হইল যে আমি অজ্ঞান হইয়া চিৎ হইয়া পড়িলাম এবং ক্লোরোফর্মের স্পঞ্জটা মুখের উপর পড়িয়া রহিল। সর্ব্বাঙ্গ অবশ। কাহাকেও ডাকিবার শক্তি নাই! এ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য। আমার স্ত্রী (মিসেস্ ভালী) পার্শ্বের কোঠায় শুইয়াছিলেন। তাঁহাকে খবর দেওয়ার জগ্ন অত্যন্ত ব্যাকুল

হইলাম। কিন্তু উপায় নাই। সর্বদা অবশ্য। অবশেষে আগ্রহাতিশয়াবশতঃ আমার আত্মা আমার পত্নীর মনের ভিতরে প্রবেশ করতঃ তাঁহাকে জাগ্রত করিল এবং তিনি ব্যাকুল ভাবে আসিয়া আমার মুখ হইতে স্পঞ্জটা সরাইয়া দিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অবস্থায় পতিত হইলেন। আমি কথা বলিতে চাই কিন্তু পারি না। অবশেষে এইরূপ বলিলাম ‘আপনি যদি কাল আমাকে স্মরণ করাইয়া না দেন তবে এই ঘটনার কিছুই আমার মনে থাকিবে না। আপনি কিরূপে খবর পাইলেন তাহা অবশ্যই কাল আমাকে বলিবেন, তাহা না বলিলে আমার স্মৃতি আসিবে না।’

পরদিন প্রাতে আমার স্ত্রী আসিয়া সব বলিলেন কিন্তু প্রথমতঃ আমার কিছুই মনে হইল না। অনেক চেষ্টাতে আংশিক মনে হইল। তৎপর যারাদিনে সমস্ত বিষয়টা মনে হইল। আমার পত্নী বলিলেন যে আমার জীবন যে এই ভাবে বিপন্ন হইয়াছিল তাহা অতি সুপষ্টভাবে তাঁহার মনে প্রকাশিত হয়; অমনি তিনি জাগিয়া উঠিয়া এখানে আসিয়াছিলেন।”

এই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব (মিঃ ক্রমওয়েল ভালী) ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সনে তাঁহার নিজ প্রত্যক্ষ আর একটী চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা যাইতে গোটা আটলান্টিক মহাসাগরটী পার হইতে হয়। বহুদূরবর্তী স্থান। আমেরিকার সমুদ্র তীরের নিকটে হালিফেক্স সেণ্টজন ও হেভার নামে ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপ হইয়া আমেরিকার প্রধান নগরী নিউইয়র্কে

মাইতে হয়। উক্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঠেলও হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের সমুদ্র তলবত্তী তার স্থাপন করিয়াছিলেন।]

“আটলান্টিক মহাসাগরের টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করণের পর আমি আমেরিকা রওয়ানা হইয়া হালিফক্স পৌছিলে সেখানে হঠাৎ আমার নাম নিউইয়র্কে টেলিগ্রাফ করা হয় এবং মিঃ সাইরাস্ ফিল্ড্ মহাশয় সেই-উজন ও হেভারে এই খবর প্রেরণ করেন। কাজেই আমার যাওয়া উপলক্ষে সেই সেই স্থানে সম্বন্ধনার বিপুল আয়োজন হয়। হেভারে উপস্থিত হইলে সেখানে গুরুতর এক প্রীতি-ভোজের আয়োজন হয়। তদুপলক্ষে বক্তৃতা আদি হইয়া রাত্রি কিছু বেশী হইয়া যায়। রাত্রিশেষে যে ষ্টিমার ছাড়ে তাহাতে আমার যাওয়ার পরামর্শ স্থির হইল। সময়মতে জাগিতে পারি কি না সে আশঙ্কায় আমি উদ্ভিষ্ট ছিলাম। এই বিষয়ে সাধারণতঃ যে উপায় অবলম্বন করিয়া থাকি এক্ষেত্রেও তাহাই করিলাম। ঠিক সময়ে জাগিবার জন্য মনেতে দৃঢ় সংকল্প রাখিলাম।

রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছে তাহা টের পাইলাম। জাগিবার সংকল্পও ঠিক আছে অথচ দেখিতেছি যে আমি বিছানাতে নিদ্রিতাবস্থায় পড়িয়া আছি। জাগিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

[অন্ধকার রাত্রিতে বিদেশে চির অপরিচিত যায়গায় এক দালানের ভিতরে শুইয়া আছি। বাহিরে কি আছে কিছুই জানা ছিল না।]

জাগিয়া উঠিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে কিরূপে জাগিব তাহা চিন্তা করিতেছি। এমন সময় দেখি যে একটা বিস্তৃত চত্বর। তন্মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ স্তূপ। দুইটা লোক ঐ স্তূপে উঠিয়া একটা বৃহদাকার তক্তা নামাইবার উদ্যোগ করিয়াছে।

এ অবস্থায় মনে করিলাম যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া একটা কামান ছুড়া হইয়াছে এবং গুলী আমার গায়ে লাগিয়াছে, এরূপ ঘটিলেই জাগিতে পারা যাইবে। এইরূপ অলীক কল্পনা করা মাত্রেই আমি অনুভব করিলাম যে প্রকৃতই ঐ চত্বর হইতে একটা কামান ছোড়া হইয়াছে। ভয়ঙ্কর অওয়াজ, আমার মুখের চর্ম প্রায় ঘেসিয়া গুলি গিয়াছে। আবার ইহাও দেখিলাম যে কাষ্ঠ স্তূপের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড তক্তা লোক দুইটিতে নীচে ফেলিয়াছে। হঠাৎ জাগিয়া বসিলাম এবং তাড়া-তাড়ি জানালা খুলিয়া দেখি সেই চত্বর। সেই কাষ্ঠ স্তূপ! সেই লোক দুইগৈ তক্তা কাঁধে লইবার চেষ্টা করিতেছে।

[লক্ষ্য করিবার বিষয় জানালা বন্ধ, তিনি নিদ্রিত, বাহিরের অবস্থা তাঁহার জানা নাই। অথচ চত্বর, কাষ্ঠের স্তূপ, দুইটা লোক, এই সব সত্য ঘটনা কে দেখিল? সাহেবের মনের বল অত্যন্ত বেশী। যাহা সংকল্প করেন তাহা কাজে পরিণত করিতে পারেন। সংকল্প মতে স্মৃষ্টি দেহ জাগিয়াছে এবং সব দেখিয়াছে কিন্তু স্থূল দেহ জাগিতেছে না। কাজেই কামান ছোড়ার একটা অলীক সংকল্প করিতে হইল। তাহাই স্থূলদেহ জাগিবার কারণ ঘটিল। স্থূলদেহ নিদ্রিতাবস্থায় থাকা কালে স্মৃষ্টি দেহ

বাতির হইয়া দেওয়ালাদি ভেদ করিয়া দেখিতে শুনিতে পারে ইহাই প্রতিপন্ন হইল।]

ডাক্তার লি সাহেবের “দৃশ্য ও ছায়া” নামক গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠাতে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে : ঘটনাটি যে সত্য তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড নগরের দুইজন ধর্ম-যাজকের সম্মুখে ঘটনা। একজন অক্সফোর্ডের এক কলেজের অধ্যাপক। অপর জন ১৮ মাইল দূরবর্তী স্থানে কাজ করিতেন। তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হয় নাই। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ডাবলিউ এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে পি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

একদিন রাত্রিতে ডাবলিউ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাহার বন্ধু পি ভয়ে জড়সড় হইয়া আসিয়া বলিতেছে “বন্ধো, আমাকে রক্ষা কর। লোকে আমাকে জীবন্ত কবর দিয়া ফেলিতেছে।”

ডাবলিউ জাগিলেন। স্বপ্ন বলিয়া বিষয়টা গ্রাহ্য করিলেন না। শুইয়া রহিলেন। নিদ্রা আসিল। পুনরায় সেই একই স্বপ্ন! স্বপ্ন হইলেও প্রত্যেকের আয় অনুভূত হইল। প্রাতঃকালে একটা ইজি চেয়ারে পড়িয়া বিষয়টা চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, “কে আসিয়াছেন, ভিতরে আসুন।” এমন সময় তাঁহার বন্ধু পি’র সুপরিচিত কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল—“বন্ধো, আমাকে জীবন্তে পোতিয়া ফেলার উদ্যোগ হইয়াছে।”

ডাবলিউ ব্রহ্ম হইয়া উঠিলেন। তদন্তে জানিলেন ঘরে কেহ নাই। একা, চাকরও কাছে নাই। তখন বাস্তব হইয়া ১৮

মাঠের দূরবর্তী স্থানে ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলেন। গিয়া দেখেন 'পি'র বাস-ভবনের সম্মুখে একটা শবাবধার! বহু লোক জন সমবেত। 'পি'কে শবাবধারে পুরিয়া ফু দিয়া শবাবধারের ডালা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

ডাবলিও একটু দূর হইতে উচ্চৈশ্বরে বলিলেন—“থাম, থাম—বিষয় কি?” লোকজন দুঃখের সহিত বলিলেন পি মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সংস্কারের আয়োজন হইতেছে। ডাবলিও তখন অনুরোধ করিয়া শবাবধার খুলিয়া শব বাহির করিলেন। দেখিলেন, সম্পূর্ণ মৃতদেহ। তথাপি তিনি বাহির করিয়া সর্ব্বাঙ্গে গরম শেক দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য আসিল !! ইহার পরে ৯ বৎসরকাল তিনি জীবিত ছিলেন !!!

[বিষয়টা হইয়াছিল এই যে পি বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া যান এবং মরণের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আত্মীয় প্রতিবেশীগণ মৃত্যু সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে কবরস্থ করিতে উত্তত হইয়াছিল। তখন তাহার সূক্ষ্ম দেহ যাইয়া ডাবলিওকে ধবর দেয়।]

এই শ্রেণীর সত্য ঘটনার অভাব নাই। মানুষের আত্মা যে জীবিতাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহ লইয়া স্থূল দেহ হইতে পৃথক হইয়া বিচরণ করিতে সক্ষম হয় তাহার প্রমাণ-স্বরূপ অসংখ্য সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতে পারা যায়।

মিঃ রবার্ট ডেল্‌গাওয়েল তাহার “লোকান্ত সীমায় পদক্ষেপ” (Footfalls on the Boundary of Another World)

নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠায় জলমগ্ন জাহাজের যাত্রীদিগের রক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রকৃত ঘটনার বৃত্তান্ত দিয়াছেন। ঘটনাটা অনেকেরই জানা আছে। তথাপি ইহা অনাবিল সত্য বলিয়া প্রমানিত হওয়ায় এবং অত্যন্ত কোতুহলপ্রদ বিষয় বিবরণের পরিষ্কাররূপে বিবৃত করতঃ বর্তমান আলোচ্য বিষয় শেষ করিব।

ইংলণ্ডের লিভারপুল নগরী হইতে একটা বাণিজ্য জাহাজ ৬ সপ্তাহ পূর্বে রওয়ানা হইয়াছে। নিউব্রান্সউইক্ নামক বহু দূরবর্তী স্থানে যাইবে। মহাসমুদ্রের মধ্যস্থলে নিউ ফাউণ্ডলেণ্ড দ্বীপের নিকটে জাহাজে অবস্থিত মিঃ রবার্ট ক্রস নামক ব্যক্তি ঐ জাহাজের প্রধান সারঙ্গ। পরিচালক প্রভৃতি কর্মচারীগণের এবং যাত্রীগণের প্রকোষ্ঠগুলি ডেকের নীচে অবস্থিত থাকে। ডেক হইতে নীচে নামিবার সিড়ি থাকে এবং ঐ সিড়ি দিয়া নামিয়া নির্দিষ্ট পথ দিয়া ঐ প্রকোষ্ঠগুলিতে যাইতে হয়।

মহাসমুদ্রের মধ্যবর্তী জাহাজ কতদূরে গিয়াছে, সমুদ্রের কোন অংশে অবস্থিত আছে কিম্বা গন্তব্য স্থল কতদূরে আছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে ডেকের উপরে উঠিয়া যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের অবস্থিতি গণনা করিতে হয়। আকাশে সূর্য্যের স্থিতি স্থান নিরূপণ করার জন্য কাপ্তান, সারঙ্গ প্রভৃতি কর্মচারীগণ মধ্যাহ্নে ডেকে গিয়াছেন। প্রকোষ্ঠগুলি খালি আছে। প্রথম সারঙ্গ রবার্ট ক্রস সূর্য্যের অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে গিয়া গভীর মনোযোগের সহিত অঙ্ক কসিয়া গণনা করতঃ ফল মিলাইতে পারিতেছে না। এমন সময়ে কাপ্তান সাহেবের প্রকোষ্ঠে

দেখিতে পাইল যে সাহেব চেয়ারে বসিয়া ডেস্কের উপরে প্লেটে লিখিতেছেন। ক্রস বলিয়া উঠিল “আমার গণনা ভুল হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। আপনার গণনার ফল কিরূপ?”—কোন উত্তর নাই। ঘাড় নীচু করিয়া সাহেব লিখিতেছেন। ক্রস উত্তর না পাইয়া পুনরায় সেই কথা বলিল। মনে করিল কাপ্তান অশ্রু বিষয়ে মনোযোগী থাকায় শুনিতে পান নাই। কিন্তু এবারও কোন উত্তর হইল না। ক্রস তখন নিকটে গেলে লোকটি মাথা তুলিল এবং ক্রস দেখিয়া অবাক হইল যে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক।

মহাসমুদ্রের মধ্যে জাহাজ। ক্রস জাহাজের সকলকেই চিনে। অচেনা লোক কিরূপে আসিল? সে হতবুদ্ধি হইয়া দৌড়াইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ডেকে কাপ্তান সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার ব্যাকুল ভাব দেখিয়া কাপ্তান সাহেব বলিলেন “কি হে ক্রস, বিষয়টা কি?”

ক্রস :—“বিষয়টা হুজুর। আপনার ডেস্কে বসিয়া লোকটি কে?”

“আমি তো কিছু জানি না।”

“কিন্তু জানেন না হুজুর, সেখানে একজন অচেনা লোক।”

“কি অচেনা লোক? তুমি স্বপ্ন দেখ্চ। তুমি হয় ত চাকরকে দেখেচ, না হয় অশ্রু কোন একজন কর্মচারীকে দেখিয়াছ। তা ছাড়া আদেশ ভিন্ন অশ্রু কে সেখানে যেতে পারে?”

“কিন্তু হুজুর, লোকটি আপনার ইজি চেয়ারে বসিয়া প্লেটে

লিখিতেছিল। তার পর মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়াছে।
আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি।”

“আরে, দেখিয়াছিহু বলচিস্। কাকে দেখিয়াছিহু?”

“ঈশ্বর জানেন, হুজুর, আমি জানি না। লোকটাকে আমি
পূর্বে কখনো দেখি নাই।”

“ক্রস্, তুই পাগল হতে চলচিস্। অচেনা লোক বেটা।
হু সপ্তাহ যাবত জাহাজ সমুদ্রে। অচেনা লোক কোথা হতে
আসবে?”

“কিন্তু হুজুর আমি ত দেখেছি।”

“যা বেটা আবার দে'খে আয় লোকটা কে।”

ক্রস ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “হুজুর আমি ভূত বিশ্বাস
করি না বটে কিন্তু প্রকৃত বলিতে কি আমার বড় ভয় হইতেছে।
আমি একা যাইতে সাহস পাইতেছি না।”

“আয় আয় বেটা, আমার সঙ্গে আয়। জাহাজস্থ লোকদের
সাম্নে নিজকে একটা বোকা সাজাস্ নে।”

“হুজুর, আপনার সঙ্গে আমি যাব।”

কাপ্তান সাহেব নামিতে লাগিলেন। পিছনে পিছনে লোকটা
গেল। প্রকোষ্ঠে কেহ নাই। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল একটা
প্রাণীও নাই !!!

কাপ্তান সাহেব বলিলেন, “আচ্ছা ক্রস্, আমি তোমায় বলি
নাই যে তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলে?”

“হুজুর অবশ্য এখন তা বলতে পারেন। কিন্তু আমি যদি

লোকটাকে না দেখিয়া থাকি তবে আমি যেন আর বাটীতে ফিরিয়া না যাই।”

কাপ্তান সাহেব বলিলেন—“আচ্ছা শ্লেটে লিখার কথা। লেখাটা ত থাকবে? দেখি শ্লেটটা।” এই বলিয়া সাহেব শ্লেটটা দেখিলেন। তখন সাহেব চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—“লেখা ত রয়েছে। বড়ই আশ্চর্য্য তো।” “ক্ৰস, তুমি কি ইহা লিখিয়াছ?”

লোকটা শ্লেট হাতে নিয়া দেখিলেন স্পষ্ট লিখা রহিয়াছে—

“উত্তর-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও (Steer to the north west)”

[এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে কাপ্তান সাহেবের লিখিত আদেশ মতই জাহাজ চালান হয়। তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও আদেশ লিখিবার অধিকার নাই। শ্লেটটা আদেশ লিখিবার কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়।]

কাপ্তান সাহেব রাগান্বিত হইয়া ক্রম্কে বলিলেন—“তুমি আমার সঙ্গে ফক্করি করছ?”

ক্রস্ বলিল—“আমি হুজুরের চাকর। সত্য বলছি এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।”

কাপ্তান সাহেব গভীর চিন্তাঘ্নিত হইয়া ডেস্কে বসিলেন। শ্লেটটা সম্মুখে। অবশেষে শ্লেটটা হাতে লইয়া উণ্টাইয়া ক্রসের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—“লিখ দেখি, উত্তর পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও (Steer to the north west)

ক্রস্ লিখিল। সাহেব লেখাটা মিলাইয়া দেখিলেন। মোটেই মিল হইল না। তখন ক্রস্কে বলিলেন “যাও ত দ্বিতীয় সারেঙ্গকে আস্তে বল।”

দ্বিতীয় সারেঙ্গ আসিয়া লিখিল। তাহাও মিলিল না। ক্রমে জাহাজের প্রত্যেক লোক দ্বারাই কথা কয়টী লিখান হইল কিন্তু কারো লিখাই মিল হইল না।

সাহেব কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, “লেখক লোকটী যাবে কি ক’রে? অবশ্যই জাহাজে আছে। অবিলম্বে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তালাসে লেগে যাও।”

আদেশমাত্র সকলে তালাসে প্রবৃত্ত হইল। জাহাজের কোন স্থান বাকী রহিল না। কিন্তু অচেনা একটী প্রাণীও মিলিল না।

তালাস নিষ্ফল হওয়ার পর কাপ্তান সাহেব ক্রসকে বলিলেন, “তুমি এ বিষয়ে কি বল?”

ক্রস্ বলিল,—“হুজুর আমি কি বলব? আমি একটা, লোককে লিখিতে দেখিয়াছি। লেখাটা ত হুজুর দেখিতেইছেন ইহাতে অবশ্য কোন রহস্য থাকবে।”

কাপ্তান সাহেব বলিলেন—“মনে তো হয় তাই। বাতাসটা অনুকূলে আছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে জাহাজটী ঐ দিকে ঢালাইয়া দেখি কি হয়।”

“আমি হ’লে তা নিশ্চয়ই করিতাম হুজুর, নেহাৎ কিছু হইলে কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইবে বই ত নয়?”

“আচ্ছা, দেখা যাক” কাপ্তান বলিলেন, “যাও ডেকে যাইয়া

উত্তর পশ্চিম দিকে জাহাজ ফিরাইয়া দেও। দেখ, জগদীশ্বরের প্রীতি বিশ্বাস ও লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিও।”

আদেশ প্রতিপালিত হইল। জাহাজ উত্তর-পশ্চিমদিকে ফিরান হইল। জাহাজ ঐ দিকে চলিতে লাগিল। বেলা যখন প্রায় তঁটা তখন দেখা গেল একটা বরফের স্তূপ দেখা যাইতেছে। কাপ্তান সাহেব স্বয়ং ডেকে গিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলেন পর্বত প্রমাণ বরফের স্তূপ! তাহার পার্শ্বে একটা জাহাজ অচল অবস্থায় আছে।

আরও অগ্রসর হইয়া দেখা গেল একটা জাহাজ বরফস্তূপে ঠেকিয়া অচল হইয়া রহিয়াছে। ঐ জাহাজে অনেকগুলি লোক রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া জাহাজে বুলান ক্ষুদ্র নৌকাগুলি ভাসমান হইল এবং বিপন্ন লোকগুলিকে আনিবার জন্ত ঐ নৌকাগুলি পাঠান হইল। তখন দেখা গেল বিপন্ন জাহাজটী আমেরিকার অন্তর্গত কুইবেক নগর হইতে লিবারপুল যাইবার জন্ত রওয়ানা হইয়াছিল। পথে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া কয়েক সপ্তাহ যাবত এখানে আটক হইয়া আছে। জাহাজের কল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নিতান্ত দুর্বস্থাগ্রস্ত হইয়াছে। লোকের খাতিয়া কয়েকদিন পূর্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে। পানীয় জলও শেষ হইয়াছে। লোকগুলি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ছিল। এখন সাহায্য পাওয়ায় পুনর্জীবন লাভ করিল।

লোক বোঝাই করিয়া একটা একটা করিয়া নৌকা আসিতে

লাগিল। তৃতীয় নৌকাটী হইতে যে সকল লোক জাহাজে উঠিতেছিল তন্মধ্যে একজনকে দেখিয়া ক্রস্ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। দেখিল ঠিক ঐ লোকটী ৩ ঘণ্টাকাল পূর্ব্বে তাহাদের জাহাজে গিয়া কাপ্তানের প্রাকোষ্ঠে ডেস্কের উপর প্লেটে লিখিয়াছিল।

প্রথমতঃ ক্রস্ মনে করিল তাহার ভ্রম হইতে পারে কিন্তু যতই লক্ষ্য করিতে লাগিল ততই স্থির ধারণা হইল যে এই সেই লোকটী। কারণ তাহার পোষাক পর্য্যন্ত অবিকল মিলিয়া যাইতেছে।

বিপন্ন লোকগুলিকে যথোচিত যত্ন করিয়া জাহাজে তুলিয়া লইয়া জাহাজ পুনরায় গম্ভব্য পথের দিকে রওয়ানা হইলে ক্রস্ কাপ্তান সাহেবকে ডাকিয়া নির্জ্ঞান স্থানে নিয়া বলিল, “হুজুর এখন বুঝিলাম আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা ভূত নয়, কারণ লোকটা জীবিতই আছে।”

“তুমি কি বল্চ ? কে জীবিত আছে ?”

“কেন হুজুর, ঐ জাহাজ হইতে যে সব লোক আসিয়াছে তাহাদের একজনই ত আমাদের জাহাজে গিয়া প্লেটে লিখিয়াছিল এ বিষয়ে আমি বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি।” কাপ্তান সাহেব বলিলেন,—“বলিতে কি ক্রস্, বিষয়টা ক্রমশঃই অধিকতর বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে। চল যাই, লোকটাকে দেখি গিয়া।”

ঐ লোকটাকে দেখিবার জন্ত উভয়ে রওয়ানা হইলেন। গিয়া দেখেন ঐ লোকটী বিপন্ন জাহাজের কাপ্তানের সঙ্গে কথাবার্তা

কহিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া উভয়ে সসন্ত্রমে গাত্রোথান করিলেন এবং অতি ভীষণ মৃত্যুর দ্বার হইতে রক্ষা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তখন কাপ্তান সাহেব বলিলেন যে এইরূপ অবস্থাতে মনুষ্য মাত্রেরই যাহা কর্তব্য তিনি মাত্র তাহাই করিয়াছেন। তজ্জন্ম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা প্রশংসা করিবার কোনও কারণ নাই। তৎপর তাহাদিগকে নীচে কেবিনে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। সকলে কেবিনে গেলে পর কাপ্তান সাহেব যাত্রীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মহাশয় আপনি অপরিচিত ভদ্রলোক, তথাপি আপনাকে একটী অনুরোধ করিতে চাই। আশা করি আপনি ত্যক্ত হইবেন না। আপনি এই প্লেটটীতে কয়েকটী কথা লিখিলে বাঞ্ছিত হইব।” এই বলিয়া কাপ্তান সাহেব ঐ ভদ্রলোকটীর হাতে প্লেটটী এমন ভাবে দিলেন যেন প্লেটের পূর্বলিখিত দিকটা নীচে থাকে এবং বিপরীত দিকটা (যে দিকে কিছু লিখিত নাই) সম্মুখে পড়ে।

যাত্রী লোকটী উত্তর করিলেন, “আপনি যাহা বলেন তাহাই আমি করিতে প্রস্তুত। কি লিখিব বলুন।”

কাপ্তান সাহেব বলিলেন, “অল্প কয়েকটী শব্দ মাত্র, উত্তর পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও (Steer to the north west)”

যাত্রী লোকটি উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না। একটু হাসিয়া কথা কয়টি প্লেটে লিখিল।

কাপ্তান সাহেব প্লেটটি লইয়া উণ্টাইয়া ধরিয়া পূর্বলিখা

দেখাইয়া বলিলেন, “আপনি কি বলেন যে এই লিপি আপনার নিজ হাতের লিখা?”

যাত্রী বলিলেন—“নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন দেখি না কারণ ইহা আমাকে লিখিতে আপনি দেখিয়াছেন।” কাপ্তান সাহেব প্লেটটি উল্টাইয়া অপর দিক দেখাইয়া বলিলেন, “আর এই লিপি?”

যাত্রী লোকটি প্লেটের এপাশে ওপাশে লিখা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—“এর অর্থ কি? আমি এক দিকে মাত্র লিখিয়াছি। অপর দিকের লিখা কিরূপে হইল?”

কাপ্তান সাহেব বলিলেন, “এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমার সাধ্য নাই। আমার সারঙ্গ বলে আপনাকে আজ দুপুর বেলা আমার জাহাজে গিয়া ঐ লিপি লিখিতে সে দেখিয়াছে।”

যাত্রী ভদ্রলোক এবং বিপন্ন জাহাজের কাপ্তান আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কাপ্তান যাত্রীকে বলিলেন, “আপনি কি এইরূপ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছেন?”

যাত্রী উত্তর করিলেন, “না মহাশয় এমন কিছু তো আমার মনে হইতেছে না।”

আমাদের কাপ্তান সাহেব বলিলেন—“আপনি স্বপ্নের বিষয় বলিলেন! এই ভদ্রলোকটি দুপুর বেলা কি করিতেছিল?”

বিপন্ন জাহাজের কাপ্তান বলিলেন—“কাপ্তান সাহেব, বিষয়টা অত্যন্ত অদ্ভুত ও অসাধারণ দেখা যাইতেছে। আমরা একটু স্থির হওয়ার পর সব বিষয় আপনাকে বলিব বলিয়া মনে

করিয়াছিলাম। যাত্রী ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া বলিলেন, “এই ভদ্রলোকটি ক্ষুধা তৃষ্ণা ও প্রাণভয়ে একেবারে অবসন্ন হইয়া দুপুর বেলা গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। ইহা নিদ্রা না ও হইতে পারে কিন্তু নিদ্রিত বলিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম। ঘণ্টা খানেক পর জাগ্রত হইয়া আমাকে বলিয়াছিল—‘কাপ্তান সাহেব, আজ আমরা এই বিপদ হইতে মুক্ত হইব।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনার এ কথা বলিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি?’ তখন যাত্রী বলিল, ‘আমি স্বপ্নে অপর এক জাহাজে গিয়াছিলাম। ঐ জাহাজ আমাদের উদ্ধারার্থ আসিতেছে।’ সেই জাহাজের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল তাহা আপনার জাহাজের সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যাইতেছে। দূর হইতে আজ আপনার জাহাজ দেখিয়া আমরা বিশ্বাসে অভিভূত হইয়াছিলাম।’

আমাদের কাপ্তান সাহেব বলিলেন, প্লেটের লিপি যে ভাবেই হইয়া থাকুক ইহা সুনিশ্চিত যে এই লিখাই আজ আপনাদের সকলকে রক্ষা করিয়াছে। কারণ আমরা পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলাম। শুদ্ধ এই লিখার দরুণ নানা দিক ভাবিয়া—কলটা কি হয় দেখিবার জন্য জাহাজ উত্তর-পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া-ছিলাম। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, “আপনি প্লেটে লিখিয়াছেন বলিয়া স্বপ্নেও দেখেন নাই?”

“না মহাশয় আমি প্লেটে লিখিবার স্বপ্ন দেখিয়াছি বলিয়া মোটেই মনে পড়ে না। আমি এই মত স্বপ্নে দেখিয়াছি যে

আপনার জাহাজ আমাদের উদ্ধারার্থ আসিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আর একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা লক্ষ্য করিতেছি। আপনার জাহাজের সব আসবাবপত্র আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু আপনার জাহাজে পূর্ব্বে কখনো গিয়াছি বলিয়া মোটেই মনে হয় না। বিষয়টা অত্যন্ত প্রাহেলিকাময়। আপনার সারঙ্গ কি দেখিয়াছে?”

তখন মিঃ ক্রস্ তাহাদের নিকট আতোপান্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তাহারা মনে করিলেন জগদীশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই অলৌকিক ঘটনা সংঘটন করিয়াছিলেন।

[উপরিউক্ত ঘটনাটি জুলিয়া হেলফ নামক জাহাজের কাপ্তান মিঃ জে, এইচ্ ক্লার্ক সাহেব নিজে ক্রসের নিকট জানিয়া প্রকাশিত করেন। মহাত্মা লিড্‌বিটার সাহেব উক্ত কাপ্তান ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক্রস্কে আপনি চিনেন? ক্রস্ কেমন লোক ছিল?” তিনি উত্তর করিলেন, “এমন সরল ও সত্যবাদী লোক আমি জীবনে আর দেখি নাই। তাহার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বাবে এক জাহাজের ভিতরে ক্রমে সত্তর মাস কাল অবস্থান করিয়াছি। মিঃ ক্রসের চরিত্র সম্বন্ধে আমার জানিবার কিছুই বাকী নাই। মিঃ ক্রস্ এই ঘটনাটি বলিতে বলিতে ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিত। আমার জীবনে আমি কখনো তাহার কথাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে পারিব না।”

ঘটনাটি অতিশয় আশ্চর্য্য ও কৌতুহলপ্রদ। কিন্তু পৃথিবীতে এক্রপ ঘটনার অভাব নাই। ডাক্তার এনিবেসেস্তু তাহার রিভিউ

পত্রিকাতে বহুতর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে কিম্বা বঙ্গদেশেও এমন ঘটনার অভাব নাই। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের ইতিহাসেও এরূপ অসংখ্য ঘটনা বিবৃত আছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিজ দেহে থাকিয়া বিশেষ একটা বিদ্যা অর্জন করার অসুবিধা দেখিয়া নিজ দেহ ছাড়িয়া অত্র এক রাজার দেহ আশ্রয় করতঃ কিছুকাল ঐ ভাবে ছিলেন। এইরূপ আরও কতই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির সভ্যগণের নিকট এই সব বাপার স্বতঃসিদ্ধের গ্ৰাহ্য গণ্য ; তাঁহারা অনেকে নিজেরা ইচ্ছা করিয়াই নিজ দেহ বিছানায় রাখিয়া অত্র চলিয়া যান এবং অভিপ্রেত কার্য্য শেষ করতঃ পুনরায় নিজ দেহে ফিরিয়া আসেন। তা ছাড়া প্রত্যেক লোকই নিদ্রিতাবস্থায় নিজ দেহ ছাড়িয়া নানা স্থানে নানা কাজ করে কিন্তু তাহাদের বিষয়টাতে দক্ষতা না থাকায় (সাধনার অভাব হেতু) সব কাজ করিতেও পারে না এবং সব বিষয় স্মরণও রাখিতে পারে না।

সাধারণ লোক রোগে, শোকে, যন্ত্রনায় কিম্বা দুঃখে কষ্টে ম্রিয়মান হইয়া যখন একেবারে নিরুপায় অবস্থায় পতিত হয় তখন তাহাদের রক্ত মাংসের দেহের সহিত সূক্ষ্ম দেহের সম্বন্ধটা শিথিল হইয়া যায়। অতিরিক্ত ঈশ্বর চিন্তা কিম্বা অনাহারাদি দ্বারা সাধুদিগেরও এইরূপ অবস্থা হয় ! তখন যদি কোন বিষয়ের জন্য প্রবল আগ্রহ থাকে তবে সেই আগ্রহটি সূক্ষ্ম দেহকে পৃথক করিয়া লইয়া গিয়া নিজ কার্য্য উদ্ধার করে। ঐ

আগ্নেহের প্রাবলা হেতু জীবের মন অগ্নি দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না। সেই জন্যই ঘটনাটি স্মরণ থাকে না। অভ্যাসের দ্বারা এমন হয় যে মনের নিতান্ত সুস্থ এবং স্বচ্ছল অবস্থায় শুক্ক পরোপকার করার উদ্দেশ্যে দেহ ছাড়িয়া যাওয়া যায়। তখন সব স্মরণ থাকে।

উপরের লিখিত জাহাজের যাত্রী ভদ্রলোকটি সপ্তাহাধিক কালের ক্ষুৎপিপাসায়, শীতের প্রকোপে দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় ও মৃত্যু ভয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে তাহার কায়া প্রাণে সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ছিল কেবল একটা বাচিবীর আকাঙ্ক্ষা। তাহার মনটি ঐ আকাঙ্ক্ষাতেই ছিল। অগ্নি দিক দেখিতে পারে নাই। কাজেই ঘটনার অতি সামান্য অংশ মাত্র তাহার মনে ছিল।



নবম পরিচ্ছেদ

মুমূর্ষু লোকের সূক্ষ্মদেহের বিবরণ

পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে মানুষ জীবিত থাকা অবস্থাতেও তাহার সূক্ষ্মদেহ স্থূল দেহকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিতে পারে। কিন্তু ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে মুমূর্ষু অবস্থাতেই এইরূপ ঘটনা অধিক ঘটিয়া থাকে। ঠিক একই কারণে মুমূর্ষু অবস্থায় ঐ সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। যে সমস্ত লোক আকস্মিক রূপে হঠাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয় তাহাদের বাসনা কামনা আদি অত্যন্ত তীব্র থাকে। আবার গুরুতর রোগ-যন্ত্রণায় স্থূলদেহের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহের বন্ধনটা অনেক শিথিল হইয়া যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, তন্মাত্র এবং মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের সমষ্টিই সূক্ষ্মদেহ। মনটা হইতেছে তাহার কর্তা। কর্মদোষে সে অস্থিমাংসযুক্ত একটা দেহেতে আটক থাকাতে ইচ্ছামতে সব করিতে পারে না। কোন স্থানে যাইতে হইলে দেহটাকেও লইয়া যাইতে হয়। কাজেই সে কয়েদীর ন্যায় থাকে। নিজাতে সে দেহ ছাড়িয়া যায় তাহাতেও তাহার স্বাধীনতা লইয়া যাইতে পারে না। যেন একটা রজ্জু দ্বারা দেহের সঙ্গে আবদ্ধ। আবশ্যক হইলেই তৎক্ষণাৎ দেহে

আসিতে হইবে। কাজেই নিদ্রাতে বাহির হইয়া গিয়া নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। অনেক স্থলেই নিদ্রিতাবস্থার ঘটনাবলী পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিতে (মনে রাখিতে) পারে না। কিন্তু আসন্ন মৃত্যু অবস্থাতে সেই গ্রন্থি যখন শিথিল হয়—যখন বুঝিতে পারে যে এই দেহে থাকার উপায় নাই—তখন ঠেকিয়া বৈরাগী হওয়ার মত দেহের আসক্তি অনেকটা কমিয়া যায়, তখন অবস্থাটা হয় এই যে নিদ্রার বাহেনা করিয়া স্মৃদেহ সরিয়া গেল ; হয়ত তাহার প্রাণপ্রতিম পুত্র রহিয়াছে কলিকাতায় ; সেই আসক্তিটা অত্যন্ত প্রবল ; সেখানে উপস্থিত হইল। নিজ দেহের সঙ্গে যে রজ্জুর টান ছিল তাহা অত্যন্ত শিথিল আছে, কাজেই পুত্রের মনে প্রবেশ করার ক্ষমতা বাড়িয়াছে। পুত্রের মনে প্রবেশ করিয়া ধারণা জন্মাইল যে তাহার পিতা এখানে উপস্থিত। কাজেই পুত্র তাহার মনের দ্বারা দেখিতে পাইল পিতা উপস্থিত। ধরিতে গেল, কি ধরিলে ? পিতা ত মনে ! এই কারণে আসন্ন-মৃত্যু কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের দূরস্থিত আপন জনকে দেখা দিয়া থাকেন।

কথা হইতে পারে যে প্রত্যেকেরই যখন আসক্তি, কামনা, বাসনা আদি থাকে তখন সকল লোকের পক্ষেই ত এইরূপ ঘটনা হওয়া সম্ভব। তাহা হয় না কেন ?

উত্তরে বলা যাইতে পারে যে জগদীশ্বরে সৃষ্টিটা অতি সুকৌশলে পরিচালিত হইতেছে। দুঃখ দুর্গতির অবস্থা যত

কম ঘটতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আছে। মৃত ব্যক্তি বা মুমূর্ষু ব্যক্তি ঘোরতর বাসনা বা আসক্তির বশীভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করা অত্যন্ত ক্লেশের বিষয়। মঙ্গলময়ের রাজ্যে ঐ রকমটা প্রায়ই হইতে দেওয়া হয় না। স্থূলদেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহে গেলেই আরও অনেক সূক্ষ্মদেহীর সংসর্গ পাওয়া যায়। অনেকের পূর্বমৃত আত্মীয় স্বজনগণ উপস্থিত হইয়া আদর যত্ন করিয়া থাকেন এবং অধিকাংশ লোকেই দেহত্যাগ করা মাত্র বন্ধন-মুক্তের আয় সুখে কাল যাপন করে। তাহারা পার্থিব বিষয়াশক্তির অপকৃষ্টতা উপলব্ধি করতঃ পরিত্যক্ত বন্ধু-বান্ধবের জন্ম সামান্য দুঃখ ভোগ করেন এবং তাহাদের যাহাতে বিশেষ কষ্ট ভোগ না হয় তাহার চেষ্টা করেন মাত্র।

যাহারা অত্যন্ত নীচাশয়, হিংসা দ্বেষ আদি প্রবল রিপু যাহাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া রাখে, যাহারা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের উপদেশে কর্ণপাত করে না, কেবল তাহারাি, হয় হিংসা-রক্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম, না হয় ঘোরতর কোন আসক্তি পূরণ করার জন্ম হা ছতাশ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, কোন কোন স্থলে দেখা দেয়। সেইটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ভাল লক্ষণত নহেই।

আসন্ন মৃত লোকের দেখা দেওয়া সম্বন্ধে অসংখ্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

ক্রমে তিনবার দেখা দেওয়া।

[বক্ষ্যমান ঘটনাটি রাইট রেভারেট মিঃ ডাবলিউ সি, লিড্-

বিটার সাহেবের একজন বন্ধুর জীবনে ঘটয়াছিল। তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় নামটি প্রকাশ নাই। তিনি একজন কলেজের ছাত্র। লণ্ডনের কোন কলেজে পড়িতে ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী দূরবর্তী কোন গ্রামে। লোকটি সাহসী, সচরিত্র ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার শয়ন কোঠার পার্শ্বেই বৈঠকখানার কোঠা। মধ্যে একটা কবাট। বৈঠকখানার কোঠা হইতে বাহির হইবার পৃথক দরজা আছে।]

ইতিপূর্বেও তিনি একবার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। পিতা প্রভৃতি বাড়ীর সকলকেই সুস্থ দেখিয়া আসিয়াছেন। ১৫১২০ দিন হইল বাড়ী হইতে আসিয়া রীতিমত কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। আজ অপেক্ষাকৃত একটু সকালে ঘুমাইবার উদ্দেশ্যে তিনি বাহির হওয়ার দরজাটা বন্ধ করিয়া শয়ন কোঠায় নিজ বিছানাতে পড়িয়াছেন। বৈঠকখানায় প্রকাণ্ড আগুনের ধুনী জ্বলিতেছে। দুই কোঠার মধ্যবর্তী কবাটটি খোলা। দিবালোকের দ্বারা প্রকাশ। কবাট খোলা থাকাতে ঐ আলোকে শয়ন কোঠাও আলোকিত। এই দুই কোঠাতে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। অন্য কুঠা হইতে কেহ এই দুই কুঠার ভিতরে আসিবার কোন পথও খোলা নাই।

বিছানায় পড়িয়া আছেন। ঘুম আসিতেছে না। রাত্রি মাত্র ১০টা ১০ মিনিট। দেখিলেন তাঁহার পিতা মধ্যবর্তী কবাটের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, কোন শব্দ নাই। ভয়ে সর্বান্ত শিহরিয়া উঠিল। ধুনীর আলোকে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে

হাত নাড়িয়া কাছে যাওয়ার জন্য সঙ্কেত করিতেছেন। সাহসে ভর করিয়া তিনি লাফাইয়া কবাটের নিকট গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। কোথাও কিছু নাই। বাহির হওয়ার দরজার নিকটে গেলেন। তাহা যেমন বন্ধ ছিল তেমনই আছে কোন জানালাও খোলা নাই। দুই কোঠার মধ্যে অণু প্রাণী নাই! লুকাইয়া থাকিবার মত স্থানও নাই !!

কলেজের কোন ছাত্র যে কোনরূপ কৌতুক করা—তাহা একেবারে অসম্ভব। আকাশ পাতাল ভাবিয়া মনে করিলেন যে এটা জাগ্রতস্বপ্ন। পুনরায় শুইতে গেলেন। ঘুম আসেনা। অনেকক্ষণ পর পুনরায় দেখেন অবিকল সেই দৃশ্য। কয়েক সপ্তাহ পূর্বের পিতাকে যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন অবিকল সেই চেহারা। হাত নাড়িয়া কাছে যাওয়ার সঙ্কেত করিতেছে। এবার আর মুহূর্ত দেরী না করিয়া দুই হাত প্রসারণ করতঃ এক লাফে ঐ মূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আকাশ ভিন্ন কিছুই হাতে লাগিল না। আর কিছু দেখাও গেলনা। উভয় কোঠা তন্ন তন্ন করিয়া তালাস করিলেন, কিন্তু জনপ্রাণী শূন্য! দরজা জানলা সব বন্ধ !!

কলেজের অণুঅণু ছেলেদের খায় তাঁহারও ভৌতিক ক্রিয়াতে বিশ্বাস ছিল না। তিনি মনে করিলেন তাঁহার মাথা গরম হইয়া এইসব অলীক স্বপ্ন দেখিতেছেন। শীঘ্রই কোন রোগ হওয়ার আশঙ্কা হইল। ঠাণ্ডা জল দিয়া মাথা ও কপাল ধুইয়া মনকে দঢ় করতঃ শুইবার চেষ্টা করিলেন।

কঁতক্ষণ পরে ঘুম আসিল। অনেকক্ষণ ঘুমাইবার পর হঠাৎ ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙ্গিল। ধূণীর আগুণ অনেকটা মৃদু হইয়াছে। তথাপি স্পষ্ট দেখিলেন তাঁহার পিতা পূর্ববৎ দাড়াইয়া! এবার কিছু বিমর্ষভাব। কাছে যাওয়ার জন্য সঙ্কেত করিতেছেন না। পক্ষান্তরে সরাইয়া দিবার সঙ্কেত করিতেছেন! এবার আর হঠাৎ অন্তর্হিত না হইয়া আস্তে আস্তে আলোকের সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

এবার ছায়া-মূর্তি অন্তর্হিত হওয়ার পর আমাদের ছাত্র বন্ধুটির চলৎশক্তি আসিল। তিনি উঠিয়াই ঘড়িটা দেখিলেন। রাত্রি তখন ২টা বাজিতে ১০ মিনিট। এমন সময়ে কেহই জাগরিত হয় নাই। বাড়ীতে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প করিয়া তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আর ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন না। বাড়ীতে পিতার অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। কয়েক সপ্তাহ মাত্র পূর্বে তিনি পিতাকে সুস্থ সবল দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহার পরে কোন অসুখ হওয়ারও কোন খবর পান নাই। হঠাৎ কি যে হইল তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। যা হউক যানবাহন যোগাড় হওয়া মাত্র তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করিয়া অতি প্রত্যুষে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। বাড়ী সহর হইতে অনেক দূরে। যাইতে সারাদিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া ভীত ও ত্রস্ত হইয়া গেলেন। বহির্দ্বার বন্ধ! আলো জ্বালিবার সময় হইয়াছে কিন্তু জ্বালান হয় নাই।

শিকল নাড়িতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। পরে শিকলটি নাড়া দিলে চাকর উপস্থিত হইল। নিতান্ত বিমর্ষ অবস্থা! তাহার অবস্থা জানিয়াই অমঙ্গলাশঙ্কা আরো প্রবল হইয়া উঠিল।

চাকর বলিল “মহাশয়, আপনি সময় হারাইয়া আসিয়াছেন। আহা, আপনি যদি কাল রাত্রে আসিতেন!”

বন্ধুটি ব্যাকুলভাবে বিষয়টা কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে সে বলিল, “গত রাত্রে কর্তা দেহত্যাগ করিয়াছেন! রাত্রি ১০টার সময় তাঁহার প্রথম ফিট্ হয়। তাহার কিছুক্ষণ পরে আপনাকে দেখিবার জ্ঞান আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবং আপনার নিকট লোক পাঠাইতে বলেন। তখন আমরা সকলেই বলি যে রাত্রি ভোর হওয়া মাত্র আপনার জ্ঞান লোক পাঠান যাইবে। তিনি যেন আমাদের ঐ কথা লক্ষ্যই করিতে পারিলেন না। তাঁহার মূর্চ্ছা আসিয়া পড়িল। তৎপর রাত্রি ১২টার সময়ে ক্ষণেকের জ্ঞান পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করেন। তখন এই মাত্র বলিলেন, ‘আহা, আমার বাছা যদি এখানে থাকিত!’ পুনরায় মূর্চ্ছা!! রাত্রি যখন ২টা বাজিতে ১০ মিনিট বাকী আছে তখন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। আমাদের সকলকেই চিনিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল কিন্তু অতিশয় দুর্বলতার দরুণ কথা কহিতে পারেন নাই। কেবল অশ্রুটস্বরে বলিলেন, ‘আহা বাছার সঙ্গে যদি একটু কথা কহিবার সুযোগ হইত! আমি আর বাঁচিব না।’ এই বলিয়া শান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন। যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।”

এটানাটি বিবৃত করা গেল। এখন চিন্তা করিবার বিষয়—
ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে। এ সব ব্যাপার মানসিক
দুর্বলতার ফল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার একটা ফেসন প্রচলিত
আছে। কিন্তু বিচার করিতে গেলে এত সহজে উড়াইয়া দেওয়া
যায় না। কলেজের ছেলে। সবল সুস্থ দেহ। হঠাৎ মতিভ্রম
হইবে কেন? ধরা গেল মতিভ্রম—এ দিকে ঠিক সময়মতে
তাহার পিতার মুমূর্ষ অবস্থা ও মৃত্যু কেন? অথ কোন সময়ে
তাহার ঐরূপ মতিভ্রম হয় না কেন? এই সব বিষয় চিন্তা
করিলে সিদ্ধান্তটা অনিবার্য হইয়া উঠে। কাজেই এই সকল
বৃত্তান্ত কৌতুকের জ্ঞাত কল্পনা করিয়া প্রচারিত হয় বলিয়াও
কেহ কেহ অবিশ্বাস করিতে চাহেন। কিন্তু যিনি পুনঃ পুনঃ
এইরূপ অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন তিনি নিজে
যদি এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রচার করেন তখন কি সিদ্ধান্ত
হইবে? উপরি-উক্ত ঘটনার নায়ক আমাদের ছাত্র বন্ধুটীও ঐরূপ
অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। যদি বলা যায় তিনিও কল্পনা
করিয়া বলিয়াছেন, আসলে এইরূপ দেখেন নাই, তা হ'লে
তাহার পক্ষে ঐ দিন তাড়াতাড়ি করিয়া বাড়ী যাওয়ার কোন
কারণ ছিল না। প্রমাণ লওয়া হইয়াছে, বাড়ী হইতে তাকে কোন
খবর দেওয়া হয় নাই। এমন কি রাত্র ১০টার সময় প্রথম ফিট্
হয়। ঐ সময়ে খবর দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। পরদিন
লোক পাঠাইবার পরামর্শ ছিল। কিন্তু যুবক বন্ধুটী অতি
প্রত্যাশে বাড়ীতে রওয়ানা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ

আছে। নিশ্চয়ই বাড়ী হইতে কোন খবর পাইয়া যায় নাহ।

বিশেষতঃ লিড্‌বিটার সাহেবের মত ঋষিকল্প ব্যক্তি ! তাঁহার বন্ধু ! কলেজে পড়ে। লিড্‌বিটার সাহেবের নিকট নিজে বলিয়াছে বলিয়া উক্ত সাহেব মহোদয় বলেন ! এই সব অবস্থাধীনে বরং ঘটনাটির তদ্বানুসন্ধান না করিয়া কেবল মাত্র শিশোদর সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া দিলে কাহারো কোন আপত্তি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তুচ্ছ তামিলা করিলে বেয়াদবি হইবে এবং সজ্জন লোকের নিকট অপরাধী হইতে হইবে।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত লর্ড লিটন সাহেব যিনি নিজে ভারত-বার্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন এবং ইদানীং যাঁহার পৌত্র লর্ড লিটন সাহেব ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন, তিনি ৭৪ বৎসর পূর্বে এইরূপ একটা আশ্চর্য ঘটনা বিবৃত করা উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে লোক সমাজের মনোবৃত্তি অগ্নরূপ ছিল। তখন এইরূপ ঘটনার প্রতি অনেকেই কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিত না। কেহ নিজে এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেও সমাজে উপহাসাসম্পদ হওয়ার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে রাজী হইতেন না। ঐ সব বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজে তখন কাহারো বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। আজকাল অনেকেই এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া গবেষণা করিতেছেন এবং তামিলা করার ফেসানটা নাই।

ডা. লিটন মহোদয়ের মন্তব্য ।

(ইংরেজীর অনূবাদ)

“আমার পাঠকের সংখ্যা অল্পই হউক কিম্বা অধিকই হউক তাঁহাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম হইবে না, যাহারা নিজ নিজ জীবনে অত্যাশ্চর্য্য ও আলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং ঐ সকল ঘটনাবলী তাঁহার বিচার-শক্তিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি তাঁহাদের বাক্তিগত কুসংস্কারের মূলে আঘাত করিয়াছে। ইহা হয়ত অথবা সত্য বলিয়া প্রতিভাত স্বপ্নমাত্র হইয়া থাকিতে পারে অথবা অনিশ্চিত কোন কিছু সংঘটনের পূর্বাভাসও হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে মধ্যযুগের অধিক সংখ্যক লোক—তাহারা যতই শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকুক—সেই কাল যতই অবিশ্বাসের যুগ হইয়া থাকুক, আশ্চর্য্যময় দেশের সামান্য ও অস্পষ্ট পরিচিহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ভৌতিক অভিব্যক্ত ও ভূতাবিষ্ট বাড়ী আদি পর্য্যন্ত হইতে এমন সব ঘটনা, হয় তাহারা নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, না হয় অতি বিদ্বন্ত সহযোগীগণের নিকট জানিয়াছেন যাহা (যে ঘটনা সকল) বিদ্রূপ-নিরত কূটবুদ্ধিদ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে না এবং সম্ভবতঃ যে সকল হেতুবাদ বা বিতণ্ডা তাহাদিগকে উপহাস দ্বারা উড়াইয়া দেয়, ইহারাও সর্বত্র কিম্বা সর্বতোভাবে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে না। এইরূপ ঘটনাবলীর মধ্যে যে কয়েকটি সাধারণতঃ উদ্ধৃত করা ও অঙ্কতার সহিত উড়াইয়া দেওয়া হয় প্রকৃত

সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। করিণ যাহারা এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই লোকসমক্ষে তাহা স্বীকার করিতে রাজি। আর যাহারা নিতান্ত বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়া জ্ঞাত হয় তাহারাও মনুষ্য সমাজে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা রক্ষা করিবার আগ্রহাতিশয্যে তাহা স্বীকার করিতে রাজী নয়। কিন্তু যাহারা তাহাদের নিজ নিজ নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া আমার এই বিবৃতি পাঠ করিবেন তাহারা সম্ভবতঃ ভাবিবার জন্য হইলেও খানিকক্ষণ তুষ্টীভাব অবলম্বন করিবেন এবং নিজ নিজ স্মৃতি-মন্দিরের নিভৃত কোন দেশে এমন সব লুক্কায়িত ধারণা পাইবেন যাহা আমার এই বিবৃতি অসত্য নহে বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে।”

লর্ড লিটন মহোদয়ের সমসময়ে দেশে তত্ত্বজ্ঞান সমিতি প্রেতাঙ্গার আবির্ভাব সংক্রান্ত ঘটনাবলীর চর্চা-সমিতির প্রভাব ছিল না। তখন এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান বা বিবেচনা হইত না। বর্তমানে ঐ সমিতিদ্বয়ের চেষ্টায় দেশস্থ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছে। তথাপি লর্ড মহোদয়ের মন্তব্য চিরকালই সত্য এবং প্রশংসনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরি-উক্ত ঘটনার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এ বিষয়ে যাহারা বিশেষজ্ঞ নয় তাহারাও নিতান্ত দুঃখে, কষ্টে ও বিপদে পড়িলে নিরুপায় অবস্থায় নিজ আগ্রহাতিশয্যবশতঃ নিজের অজ্ঞাতমারে প্রেতদেহ ধারণ করিয়া অভীক্ষিত কার্য সম্পাদন

করিতে সক্ষম হয়। এই অবস্থা ছাড়া আবার এমন ঘটনাও অনেক পাওয়া গিয়াছে যে স্থলে মুম্বু ব্যক্তি অজ্ঞানাবস্থায় শয্যাগত থাকা কালে তাহার আত্ম প্রেতদেহ অবলম্বন করিয়া নানাস্থানে পর্যটন করে এবং সাংসারিক সাধারণ কাজেও লিপ্ত হয়। এই শ্রেণীর একটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রেতাত্মার ফটোগ্রাফ চাওয়া।

বিগত ১৮৯১ ইং সনের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডের অন্তর্গত নিউকাসেল নগরীর একটি জলপূর্ণ ষ্ট্রীটে পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকায় সময় স্পষ্ট দিবালোকে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। একটি ফটোগ্রাফের দোকানে প্রেতদেহ প্রাপ্ত লোকটি ঠিক জীবিত লোকের ন্যায় পাইচারী করিতেছিল এবং তাহার নিজের ফরমায়ের করা ফটোটি চাহিতেছিল।

দোকানের কর্মচারী বলিল, ‘আপনার ফটো সম্পূর্ণ হয় নাই। সময়ান্তরে আসিয়া লইয়া যাইবেন।’

“সারারাত ঘুরাঘুরি করিয়া ক্লান্ত হইয়াছি। সময়ান্তরে আসা অসুবিধা।” এই বলিয়া চলিয়া গেল। তখন কেহ কিছু সন্দেহ করিল না এবং অস্বাভাবিক কিছু বলিয়া মনেও করিল না।

এই ঘটনার সপ্তাহ কাল পরে ফটোগ্রাফ নেওয়ার জন্ত ঐ লোকটার পিতা আসিলে কথা-প্রসঙ্গে ৭ দিন পূর্বে যে তাগিদ করিতে আসিয়াছিল তাহার উল্লেখ হয়। তখন তাহার পিতা বলিলেন যে ঠিক সেই দিন সে অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিল।

সেই মুহূর্তে হইতে আর সংজ্ঞালাভ হয় নাই এবং ঐ দিন বৈকালে ২টা ৩০ মিনিটের সময় দেহত্যাগ করিয়াছে।

প্রথমতঃ লোকটা যখন আদিয়া ফটোগ্রাফের জন্ত show দিয়া যায় তাহা প্রায় এক মাস পূর্বের কথা। সেইদিন ফটোগ্রাফার মিঃ ডিকিন্সন্ (Dickinson) দোকানে উপস্থিত ছিলেন না। কর্মচারী show রাখিয়াছিল। কিন্তু পরে প্রেতদেহধারা আসিয়া তাগিদ করা কালে ডিকিন্সন্ সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফটি আনা হইল। তখন সাহেব স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন অবিকল চেহারা।

মহামতি ষ্টেড্ এই ঘটনাটি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে এই ঘটনাটি সম্বন্ধে যে ভাবেই চিন্তা করা যায়, একমাত্র সিদ্ধান্ত হয় যে প্রেতদেহ নামক জিনিস আছে, ইহা রীতিমত চলাফেরা করিতে পারে—কথা বলিতে পারে—ইচ্ছামতে পোষাক পরিতে পারে,—যদিও তাহার দেহ, পোষাকাদি বস্তু নহে।

ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখনও ঐ দোকান আছে কর্মচারীও কেহ কেহ আছে। স্পষ্ট দিবালোকে ঘটনা হইয়াছিল। ষ্টেড্ সাহেব নিজে তদন্ত করিয়া সত্য অবধারণ করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে অকাটা প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে।

মিশর হইতে টরকোয়ে ।

এক সাহেব তাহার মেম সহ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রওয়ানা হইয়াছেন । ঐ সাহেব ৪ বৎসর কাল ভারতবর্ষে উচ্চ চাকরী করিয়া নিজ সম্বানগণকে দেখিবার জন্য ৪ বৎসর পর দেশে রওয়ানা হইয়াছেন । তাহাদের সম্বানগণ দেশে টরকোয়ে নামক স্থানে তাহাদের এক বন্ধুর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিল । সাহেব ও মেম মিশর দেশ পর্য্যন্ত যাওয়ার পর মেম সাহেবের এমন পীড়া হইল যে তাহার জীবনের আশা রহিল না । রুগ্নাবস্থায় তিনি অনবরতঃ কেবল সম্বানদের দেখিবার জন্য গুরুতর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন । জ্বরের উপসর্গ প্রলাপ যখন নিবৃত্ত হইত তখন তাহার সম্বানদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিত । তাহার গুপ্তা-কারীগণকেও তিনি কেবল এই কথাই বলিতেন । এক সপ্তাহ-কাল প্রতিদিন তাহার কেবল এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন যে তাহার সম্বানগণকে একবার শেষ দেখা দেখিতে পারিলে তিনি সুখে মরিতে পারিবেন । মৃত্যুর দিবসে সকাল বেলায় তাহার এক সুদীর্ঘ গভীর নিদ্রা আসিল । গুপ্তাকারীগণের পক্ষে তাহাকে জাগান কঠিন হইল । নিবুম্ হইয়া শুইয়া রহিলেন ।

মধ্যাহ্নের পর সময়ে সহসা জাগ্রত হইয়া উচ্চৈশ্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমি তাহাদের সকলকেই দেখিয়াছি । তাহাদিগকে দেখিলাম । ধন্য জগদীশ্বর ।” এই কথা বলিবার পর পুনরায় নিদ্রিত হইলেন । এই নিদ্রাতেই সন্ধ্যার সময় তাহার জীবনান্ত হইল ।

টরকোয়েতে একটা দালানেরই পাশাপাশি দুইটা কোঠা তাঁহার সম্ভানগণের ব্যবহারে ছিল। একটা খেলার ঘর এবং অপরটা বিশ্রামের ঘর। মধ্যে একটা কবার্ট। একটা দাসীর তত্ত্বাবধানে শিশুগুলি খেলার ঘরে সকলে মিলিয়া পুস্তক, পুতুলাদি লইয়া পরমানন্দে আমোদ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদের মাতা বড় কোঠাটিতে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত হাসির সহিত প্রত্যেকটা শিশুকে নিরীক্ষণ করিল। পরে অপর কোঠাতে গেল ও ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। দানীটী তাহাকে চিনিত না এবং কচি ছোট শিশুটী চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহারাও প্রত্যক্ষ করিল। বড় তিনটা শিশু তাহাদের মাতা বলিয়া পরিষ্কার চিনিল এবং মায়ের এইরূপ ব্যবহারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ সেই ঘটনার তারিখ ১৮৫৪ ইং ১০ সেপ্টেম্বর নোট করা হইল। পরে দেখা গেল ঠিক ঐ তারিখ সন্ধ্যার সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ঘটনাটী খবরের কাগজে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ঐ পরিবারের বাইবেল গ্রন্থের একটা অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

আর একটা সুন্দর ঘটনা সাইকিক্ রিচার্চ সোসাইটীর প্রসিডিং বহিতে লিপিবদ্ধ করা আছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর সি, জে, রোমেস-এর নিজ অভিজ্ঞতার বিবরণ। ঘটনাটী এই :—

বৈজ্ঞানিকের ভগিনী।

“১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসের শেষ ভাগে একদিন মধ্যরাত্রে

আমি নিজকে জাগ্রত বলিয়া মনে করিতেছি এমন সময়ে দেখি যে আমার বিছানার শিয়রের দিকের নিকটবর্তী দরজাটা খোলা এবং ঐ দরজা দিয়া একটি শুভ্রবর্ণ লোক প্রবেশ করতঃ দরজার কাছে দাড়াইয়া আমার দিকে চাহিল। প্রবেশ করা কালে তাহার সন্দীপ্ত শুক্ল বস্ত্র দ্বারা আবৃত ছিল, প্রবেশ করিয়াই হাত তুলিয়া মাথার অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল। দেখি যে আমার ভগিনী !!! ঐ ভগিনীটি সে দিন ঐ দালানের অপর কোঠায় রুগ্নাবস্থায় শায়িত ছিল। আমি ব্যস্ত হইয়া তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ডাকিবামাত্রই দৃশ্যটি আকাশে মিশিয়া গেল।

এই ঘটনার দরুণ আমি কিছু চিন্তিত হইয়া পরদিন ভগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার জেনারকে কল দিলাম। ডাক্তার জেনার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ‘এই রোগী ছু এক দিনের বেশী বাঁচিবে না।’ ফলেও তাহাই হইল। ঘটনার দিন আমি খুব সুস্থ ও চিন্তিত ছিলাম। ভগিনীটিও আমাদের পারিবারিক ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ছিল। রোগের অবস্থা খারাপ ছিল না। তখন পর্য্যন্ত মরণের কোন আশঙ্কাই ছিল না। আমার জীবনে আমি আর কখনো এই ধরণের কোন ঘটনা দেখি নাই।”

সি, জে, রোমেল।

ভাব দেহের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঘটনাবলী হইতে কয়েকটি নির্বাচন করতঃ নিম্নে বিবৃত করা গেল।

উয়ান্টার সাইটারের ভাব দেহ।

[ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত মনীষী মিঃ ষ্টেড্‌ এই ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া প্রচার করিয়াছেন। ঘটনাটি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত সাবধানতার সহিত তদন্ত করতঃ সত্য অবধারণ করা হইয়াছিল।]

ইংলণ্ডের ডাণ্ডি নামক সুবিখ্যাত নগরীতে নর্থ গেট নামক স্থানে মিঃ আলেকজাণ্ডার ড্রামণ্ড নামক বিখ্যাত চিত্রকরের একটি চিত্র বিদ্যার কারখানা আছে। তাহাতে বহুসংখ্যক কর্মচারী কাজ করিতেছিল। ড্রামণ্ড সাহেবের শ্যালক ওয়ান্টার সাউটার ঐ কারবারে কেরানীর কার্য্য করিতেন। সাউটার সাহেব প্রত্যহ প্রভাতে ঠিক ৬ টার সময় আফিসে উপস্থিত হইয়া অল্প কর্মচারীরা কে কোথায় কি কাজে গেল—কে কি জিনিষপত্র লইয়া গেল তাহার হিসাব রাখিতেন। কখনও তিনি আফিসে আসিতে দেরী করিতেন না। দেরী করিলে অনেক কাজ নষ্ট হওয়ার বিষয় হইত।

ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইয়া গেল। ৬টা ২০ মিনিটের সময় ঘুম ভাঙ্গিল। আফিস এক মাইল দূরে। আফিসে যাইতে ৬টা ৪০ মিনিট হইয়া যাইবে। আফিসে সব কর্মচারী বসিয়া থাকিবে। অনেক কাজের ক্ষতি হইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া আফিসের দিকে রওয়ানা হইলেন।

অপরদিকে স্বয়ং ড্রামণ্ড সাহেব ঠিক ৬টার সময় আফিসে গিয়া সাউটারকে পান নাই। লোকজন বসিয়া আছে। সকলেই সাউটারের জন্ত পথের দিকে চাহিয়া আছে। বেলা যখন ঠিক ৬টা ২০ মিনিট তখন ড্রামণ্ড সাহেব ও কৰ্মচারীগণ দেখিলেন সাউটার আসিয়া পেছনের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই অপর এক দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সকলে মনে করিলেন, কোন কাজে গিয়াছেন; এখনই আসিবেন। কিন্তু কোথায় কে!! দেৱী হইতে লাগিল।

বেলা যখন ৬টা ৪০ মিনিট হইয়াছে তখন ওয়ালটার সাউটার তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিয়া ড্রামণ্ড সাহেবকে বলিলেন, “কি করিব দেখুন, আজ ঘুম ভাঙ্গিতেই ৬টা ২০ মিনিট হইয়াছে। তারপর অবিলম্বে রওয়ানা হইয়া একরকম দৌড়িয়া আসিয়াছি।”

তখন ড্রামণ্ড সাহেব বলিলেন, “আপনি ইতিপূর্বে ৬টা ২০ মিনিটের সময় আসিয়া আবার কোথায় গিয়াছিলেন?” সাউটার শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন এবং কেন যে এইরূপ বলা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

চিত্রকর মিঃ ড্রামণ্ড বিষয়টা কি অবধারণ করার জন্ত বিকাল বেলা তাঁহার শ্যালক সাউটারের বাড়ীতে যাইয়া সাউটারের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে ঠিক ৬টা ২০ মিনিটের সময় জাগিয়া সাউটার ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছেন, “সর্বনাশ! ঘুম

ভাঙ্গিতে ৬টা ২০ মিনিট হইয়া গেল, যাইতে ত আরও ২০ মিনিট লাগিবে !”

উভয়ের ঘড়ি ঠিক এক মিলেই চলিতেছিল।

সবুজ গ্লাবস এর কথা।

এই ঘটনাটি ডাক্তার জর্জ উইগ প্রচার করিয়াছেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি নিজে তদন্ত করিয়াছেন। নিঃসন্দেহ হইয়া নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত করিয়াছেন :—

কুমারী জেক্সন এবং তাহার মা’র সঙ্গে আমার খুব সম্ভাব ছিল। দরিদ্রের সেবা করাই তাহাদের ব্রত ছিল। একদিন কুমারী জেক্সন দরিদ্র সেবায় বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিতে খানিকটা রাত হইয়া যাওয়ার কারণ ঘটিল। ফিরিয়া আসিবার কালে বাড়ী হইতে কিছু দূরবর্তী স্থানেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। ভয়ানক শীতে আড়ষ্ট। বাড়ীর রান্না ঘরের উননে হাত দুইটা সেকিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু বাড়ী নিকটে নয়। উপায় নাই !

সেদিকে বাড়ীর রান্নাঘরে দুইটী ঝি। তাহারা সন্ধ্যার পরক্ষণেই দেখিল খট করিয়া রান্না ঘরের দরজা খুলিয়া কুমারী জেক্সন ঘরে প্রবেশ করতঃ উননে হাত সেকিতেছেন। হাতে সবুজ বর্ণের গ্লাবস পরা আছে। খানিকক্ষণ পরেই ঐ ঝি দুইজন দেখিয়া স্তম্ভিত হইল যে কুমারী সেখানে নাই। ঝিদ্বয় হতবুদ্ধি হইয়া কুমারীর মা’র নিকট গিয়া বিষয়টা বলিল। ইহাও বলিল কুমারীর হাতে সবুজ বর্ণের গ্লাবস পরা ছিল।

কুমারীর মাতা বলিলেন, “তোমাদের ভ্রম হইয়াছে।
তাহার গ্লাবস্ সবুজ নয়। কাল রঙের।”

এই সকল কথাবার্তা হওয়ার অনেকক্ষণ পরে কুমারী
জেক্সন শীতে জড়সর হইয়া বাড়ী আসিয়া একদম রান্নাঘরে
গিয়া হাত সেকিতে লাগিল। হাতে সবুজ বর্ণের গ্লাবস্।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কখন আসিলে?” উত্তর
হইল, “এই মাত্র।”

“তোমার কাল বর্ণের গ্লাব কোথায়?”

উত্তর হইল, “আজ সেগুলি তাল্যাসে না পাওয়া সবুজ বর্ণের
গ্লাবস্গুলি পরিয়াছি।”

মৃত্যুর সংবাদবার্তা প্রেতদেহ।

কোন কোন লোক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার দূর
দেশস্থিত আত্মীয়-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্য তাহাদিগের
নিকট প্রেত দেহে উপস্থিত হয়। ঘোরতর সাংসারান্ধিত্যসম্পন্ন
অজ্ঞ লোকের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

যাঁহারা যোগসাধনা দ্বারা এই সব ব্যাপারে অভ্যস্ত তাঁহাদের
পক্ষেই জীবিত কালেই হটক বা মৃত্যুর পরেই হটক এইরূপ দেখা
দেওয়া খুব কঠিন নহে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমেই
তাহা করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির সচরাচর তাহা
করেন না। করার আবশ্যক মনে করেন না। কাঠিয়া বাবা
ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাদের দেহত্যাগের পর সময় সময়
তাঁহাদের শিষ্যদের মধ্যে কাহারো কাহারো নিকট সশরীরে

উপস্থিত হইয়া উপদেশাদি দিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে মৃত্যুর পর পুনরায় স্থূলদেহ অবলম্বন করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। কেবল ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই এইরূপ হইতে পারে। সকল বিষয়ে আবার সকলের সমান আগ্রহ হয় না। প্রেতাশ্মার আবির্ভাবের ঘটনাবলীর মধ্যে এমন সব ঘটনা পাওয়া যায় যাহাতে অতি সামান্য কারণে প্রেতাশ্মা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এইসব দেখিয়া আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নাই। যেহেতু আমরা জীবদ্দশা কালে অতি তুচ্ছ কাজেই আমাদের অমূল্য সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া থাকি। মৃত্যুর পর আমাদের অভ্যাস বা চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। তবে সকল বিষয়ে সকলের সমান আগ্রহ থাকে না। কেহ কেহ কবিগান শুনিবার জন্য কিম্বা নিমন্ত্রণ খাইবার জন্য ৮।১০ মাইল দূরবর্তী স্থানে হাটিয়া গিয়া থাকে আবার কেহ বা সমীপবর্তী বাড়ীতে গান কিম্বা নিমন্ত্রণ হইলে অত্যন্ত অনুরোধেও যাইতে সম্মত হন না। প্রেতাশ্মার মধ্যেও এইরূপ কোন কোন স্থলে অতি সামান্য কাজেও দেখা দিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে একটী চমৎকার ঘটনার বিষয় আমি একজন বিশ্বস্ত লোকের নিকট জানিয়াছি। আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু লোকের একটী ভ্রাতৃপুত্র ১৬।১৭ বৎসর বয়সে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। ঐ ছেলের পিতাও তখন বর্তমান আছেন। মৃত্যুর একাদশ দিবসে শ্রাকের বন্দোবস্ত হইয়া ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এমন

সময় অর্থাৎ দিবা ১০টা কি ১১টার সময় তিনি নিজে তাহাকে দেখিতে পান।

ঘটনাটি এইরূপ :—তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন একটা পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পারে বাঁশের ঝার। একটি বাঁশ হেলিয়া পুষ্করিণীর জলের উপরিভাগে জল হইতে ৩৪ হাত উচ্চে রহিয়াছে। মৃত ছেলেটি ঠিক জীবিতের স্থায় পা দুখানি নৌচের দিকে ঝুলাইয়া ঐ বাঁশের উপরে বসিয়া রহিয়াছে। একখানা লাল পেড়ে কাপড় পরা। কোনরূপ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ভাব নাই।

ঐ ঘটনাটি দেখিয়া আমার বন্ধু—বয়স ৬০ বৎসরের মত—একটু বিচলিত হইলেন এবং ঐ ছেলের পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলেন। পিতা আসিয়াও দেখিতে পাইলেন কিন্তু তিনি আসিবার অল্পক্ষণ পরই হঠাৎ বিলীন হইয়া গেল। বাঁশটি নড়িয়া উঠিল।

এই ঘটনাটির কথিত প্রেতাঙ্গা অবস্থা মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্য আসে নাই! নিম্নে মৃত্যু সংবাদবাহী প্রেতাঙ্গার কয়েকটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

আমার নিজের একজন ভাজ (ভ্রাতৃ বধূ) তিনি যখন বিবাহিতা হইয়া আমাদের সংসারে আসেন তখন আমার বয়স ছিল ৫ বৎসর। তিনি স্থিরবুদ্ধি, কৰ্ম্মঠ ও অমায়িক চরিত্রের লোক ছিলেন। শৈশবে তিনিই আমার এবং আমার কনিষ্ঠদের লালন পালন করিতেন। সংসারের কাজে তাঁহাকে অনেক খাটিতে হইত অথচ এই সব খাটুনির পুরস্কার ছিল না। পরিবারস্থ

কাহারো কাহারো ব্যবহারে মনোকষ্ট পান নাই বলিয়া বলা চলে না। তাঁহার সুসন্তান অনেকই জন্মিয়াছিল কিন্তু শৈশবেই মারা যায়। একটি মাত্র পুত্র জীবিত ছিল। সেও শিশু অথচ বিকৃতমনা। সংসারে আশা ভরসা বিশেষ ছিল না। আমার নিকট সদ্যবহারের প্রত্যাশা তিনি করিতেন। আমার তখন পাঠ্যাবস্থা। সর্বদাই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

আমি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াকালে হাওড়া জিলাব অন্তঃপাতী সেকন্দরপুর গ্রামে রায় কে, পি, পাল বাহাদুরের ফ্রি স্কুলে মাষ্টারী করিতেছিলাম। রূপনারায়ণ নদের পারে স্কুল গৃহ। স্কুল কম্পাউণ্ডেই আমাদের বাসস্থল। বরিশাল জিলাব সিদ্ধকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র গুহ হেড্ মাষ্টার। আমি এবং ব্রাহ্মণ চাকর ও কয়েকটি স্কুলের ছাত্র একত্রে বাস করিতেছি। আমার পড়াশুনা করিতে হইত বলিয়া আমার কোঠাতে আমি একাই থাকিতাম। যোগেশ বাবু ও অন্যান্যদের ভিন্ন ভিন্ন কোঠা ছিল।

একদিন রাত্রে পড়াশুনার পর কোঠার কবাট বন্ধ করিয়া শুইয়া আছি। হঠাৎ রাত্রি ১টার সময় বুক চাপা স্বপ্ন হইয়া গো গো করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। দেখি যেন আমার সেই ভাজ মশারীর একদিক উপরে তুলিয়া একটা হাতপাখা হাতে লইয়া কি বলিতে চাহিতেছেন। আমার কিন্তু স্পষ্ট ধারণা রহিয়াছে যে আমি অতি দূরবর্তী হাওড়া জিলায় আছি এখানে তিনি আমার কিছুমাত্র কারণ নাই—অস্বাভাবিক ঘটনা দেখিয়া

আমার ভয় হইয়াছে এবং অস্পষ্টভাবে চিৎকার করিতেছি। আমি যতই চীৎকার করি ততই জোরে তিনি পাখা দ্বারা বাতাস দেন। সেই বাতাসে মশারির পরদার কাপড় সরিয়া আমার গায় লাগিতেছে। বাহিরে যোগেশ বাবু, চাকর এবং কয়েকটি ছেলে দরজার কাছে দাড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন স্পষ্ট শুনিতেছি কিন্তু কোনও জবাব দিতে পারিতেছি না। অগত্যা তাহারা কবাট ভাঙ্গিবার জন্য বুড়াল আনাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও শুনিতেছি কিন্তু তথাপি উত্তর দিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় হঠাৎ তিনি অন্তহিত হইলেন। তখন উঠিয়া দরজা খুলিলাম। যোগেশ বাবু প্রভৃতির নিকট ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম। ইহার ৩ দিন পর বাড়ীর চিঠি পাইয়া জানিলাম ঐ দিনই আমার ঐ ভাজ পরলোকগামী হইয়াছিলেন। জ্বর রোগে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় পূর্ব্ব আমি কিছুই জানিতে পারি নাই।

সৈনিকের পিতামহী।

হেনয়ের নৌ বিভাগের কাপ্তান জুলিয়েন লেগার মহাশয়ের স্বাক্ষরিত বিবরণ :—

সেনিগাল দেশের সেইন্ট লুই নামক স্থানে আমি লেপ্টেনেন্টের পদে নিযুক্ত ছিলাম। একদিন রাত্রে কয়েক ঘণ্টাকাল আমি আমার সামরিক বিভাগের সহযোগী বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথনের পর রাত্রি ১টার সময় শুইতে গেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রা আসিল। ঘুম আসার পরক্ষণেই হঠাৎ

আমার বৃকে যেন একটা চাপ অনুভব করিলাম এবং জাগ্রত হইলাম। কাত হইয়া কনুইয়ের উপর ভর করিয়া মাথা তুলিয়া দেখি আমার পিতামহী উপস্থিত। দাড়াইয়া এক দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম তিনি ক্ষীণ স্বরে বলিতেছেন, “প্রাণের ভাইটী আমার, তোমার কাছে শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি। তোমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না।” এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল। আমি জাগ্রত কি না সন্দেহ করিয়া অমনি উঠিয়া বসিলাম। কয়েকদিন পরে বাড়ীর চিঠি পাইয়া জানিলাম ঠিক ঐ দিন ঐ সময়ে আমার পিতামহী ৭৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতি পেরেটের কথা।

[ঘটনাটী শ্রীমতি মেডেম্ মার্গারাইট পেরেটের নিজের লিখিত ইহা ১২ বৎসর পূর্বে ১৯১৯ ইং সনের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে সংঘটিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে এই ঘটনা হইতে তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছে যে তাহার ভগিনী দেহত্যাগ করিয়াও বর্তমান আছেন]

ফ্রান্স দেশের চেলোন নামক স্থানের একটী বিদ্যালয়ে আমরা দুই ভগ্নি বাস করিতে ও বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলাম। হঠাৎ টাইফয়েড্ জ্বর মহামারীরূপে প্রাচুর্ভূত হইল। স্কুলের শিক্ষার্থী দিগকে স্ব স্ব পিতামাতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ফ্রান্সের বিউন নগরের মেয়র শ্রীযুক্ত বার্গই মহাশয় আমার পিতার বিশেষ

বন্ধ। পিতা আমাকে উক্ত বার্গই ও বার্গই পত্নীর তত্ত্বাবধানে
তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া রুগ্ন ভগ্নিটির শুশ্রূষার জন্য চেলোনে
গেলেন।

শৈশবাবধিই আমার ধর্মভাব প্রবণতা ছিল। আমি বার্গই
মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া ভগ্নির আরোগ্যের জন্য ভগবানের
নিকট প্রার্থনা করিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে ঐ
প্রার্থনা করার দিন হইতে ৯ দিন মধ্যে আমার ভগিনী আরোগ্য
হইবে। আমার শয়ন কোঠা এবং বার্গই ও বার্গই পত্নীর
শয়ন কোঠার মধ্যবর্তী স্থানটী ছিল বৈঠকখানায় যাওয়ার পথ।
পোষাক পরিবার কোঠা ছিল আমার শয়ন কোঠার সংলগ্ন।
আমার প্রার্থনার তারিখ হইতে পঞ্চম দিবসে ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্য
রাত্রে পোষাকের কোঠায় শিকল টানার শব্দ শুনিয়া জাগ্রত
হইলাম। চিরকালই আমার ঘুম পাতলা। শব্দটা শুনিয়া
আমি মাথা তুলিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় আরও লক্ষ্য করিতে
লাগিলাম। আমার নিকট আরও আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল
যে হঠাৎ যেন শিকলের শব্দটা লোকের পাদক্ষেপ শব্দের শব্দ
শুনিতে লাগিলাম। যেন কেহ আমার শয়ন কক্ষে আসিতেছে।
আমি চীৎকার দেই মত অবস্থা কিন্তু আমি যে এখানে আছি
চীৎকার দ্বারা গুপ্ত স্বাতককে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া বুদ্ধির
কার্য্য হইবে না মনে ভাবিয়া চীৎকার দেই নাই। তারপর
হঠাৎ আমি অনুভব করিলাম কেহ যেন আমার বিছানার
গদর হাতাইতেছে। হঠাৎ বিদ্যুৎবিকাশের শব্দ অতি অল্প

সময়ের জগ্নু আমার ভগ্নির চেহারা দেখিলাম। দেখা মাত্রই ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

অবিলম্বে পিতৃবন্ধু ও তৎপত্নী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যাপার কি?” আমি বলিলাম, ‘আর ব্যাপার! আমার ভগ্নি আর কি! একেবারে বিছানার উপর। তখন বার্গই মহাশয় বলিলেন, “মা, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ। তা কি কখনো হয়? তোমার ভগ্নি রহিয়াছে চেলোনে। ভয়ানক পীড়িত। কিরূপে আসিতে পারে?” আমি বলিলাম, ‘নিশ্চয়ই স্বপ্ন নয়। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি!’

তঁাহারা আমায় প্রবোধ দিলেন। কমলা ফুলের জল দিলেন। বলিলেন, “ঘুমাও গিয়ে মা, কিছু নয়। তখন শেষ রাত্রি। ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। পরদিন ছপুরে আমরা টেবিলে খাইতে বসিয়াছি এমন সময় বাহির দরজার ঘণ্টা টন্ টন্ বাজিয়া উঠিল ঝি গিয়া দরজা খুলিল। পিতা মহাশয় রুমাল দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া প্রবেশ করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “তোমার ভগ্নিটা গত রাত্রে ৫ টার সময় চলিয়া গিয়াছে।”

বার্গই মহাশয় এবং বার্গই পত্নী এক সমানে বলিয়া উঠিলেন, “একি আশ্চর্য্য! ৫টার সময় শ্রীমতি মার্গারাইট পেরেট বলিয়াছে যে তাহার ভগ্নীকে তখন সে তাহার বিছানাতে দেখিয়াছে।”

তখন পিতার নিকট রাত্রির ঘটনা সম্পূর্ণ বিবৃত করা হইল। পিতা মহাশয় সারাদিন কেবল বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য!”

আরাণ্ডালের মা ।

[আরাণ্ডালের মা ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী চেরবার্গের এক মৎস্য বিক্রেতা স্ত্রীলোক ছিল। ১৪ বৎসর পূর্ব্ব অর্থাৎ ১৮১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখ বেলা ১টার সময় মাথায় ভ্রমি দিয়া হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পর ঐ দিন রাত্রেই মেডেম বলিয়ার নামক এক ভদ্রমহিলার নিকট সে দেখা দেয়। ঐ মহিলা মেডেম মিচু নামক অপর এক মহিলার সঙ্গে একত্র হইয়া পরদিন বাজারে গিয়া তদন্ত করিয়া জানেন যে ঘটনা প্রকৃত। এই ঘটনা সম্বন্ধে চেরবার্গ নিবাসী গেষ্টন থরিন নামক এক ভদ্রলোক লিড্‌বিটার সাহেবের নিকট ১৯২১ ইং ১০ অক্টোবর তারিখে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ চিঠিখানা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।]

চিঠি ।

মেডেম বলিয়ার এক নিদ্দিষ্ট রাত্রিকালে (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ইং) জাগ্রত অবস্থায় শুনিতেছেন কে যেন তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। বলিয়ার মনে করিলেন যে তাহার নিদ্রা হইয়াছে এবং তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। [তা না হইলে রাত্রিতে কে তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবে।] কিন্তু তন্মূহূর্ত্তেই আবার শুনিলেন, “মেডেম বলিয়ার।” নিশ্চয়ই স্বপ্ন নয় মনে করিয়া তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন জানালা দিয়া একগী স্ত্রীলোক

দেখা যায়। সেই তাকে ডাকিতেছিল। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে গা?” স্ত্রীলোকটা উত্তর করিল, “আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই?” “আমি আরাণ্ডালের মা, এ সকালে আপনি যে আমা হইতে মাছ কিনিয়াছিলেন!”

মেম বলিলেন, “হাঁ, হাঁ, মনে হয়েছে। তবে তুমি কি চাও?”

“আমি বোধ হয় মরে গেছি। আমার দেহটা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটা করিতেছে। আমি কত চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে কোন কথা শুনাইতে পারি নাই। আমাকে তাহারা দেখেও না। কিন্তু বাস্তবিক আমি মরি নাই।” “কিভাবে তুমি মরিলে?”

“ছপুর বেলা বাড়ীতে আসিয়া আমার ভয়ানক রাগ হইল আর’ মাটিতে পড়িয়া গেলাম! লোকজন জড় হইল। আমার দেহটা ঘেরাও করিয়া রহিল। আমি কিন্তু মরি নাই।”

“যা হউক, তুমি এখন কি চাও? “আপনি গিয়া লোক-গুলাকে বলুন যে আমি মরি নাই।”

“না গো মা। এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। লোকে বলবে আমার মাথা গরম হইয়াছে। তুমি এখন যাও।”

এই কথাবার্তার পর প্রেতাঙ্গা অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাতে মেডেম বলিয়ার তাহার এক প্রতিবেশী মেডেম মিচুর নিকট এই ঘটনা বলিলেন এবং তদন্ত করার জন্ত দুইজন বাজারে গেলেন। গিয়া দেখেন আরাণ্ডালের মা’র দোকানের

উপরে একখানা কাগজ আটা দ্বারা লাগান রহিয়াছেন ! তাহাতে লিখা, “আরাণ্ডালের মা’র মৃত্যু হইয়াছে।” অন্যান্য মৎস্য বিক্রেতারা বলিল বাড়ী যাইয়া হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

গেস্টন খরিণ।

লিড্‌বিটার সাহেব এই চিঠি পাইয়া স্বয়ং চেরবার্গে গিয়া তদন্ত করেন। চেরবার্গ তাহার পরিচিত স্থান। তিনি ১৮১৯ ইং সেপ্টেম্বর মাসেও একবার ঐ স্থানে গিয়াছিলেন। যা হউক তিনি চিঠি পাইয়া পুনরায় সেখানে গিয়া টাউন হলের জন্ম মৃত্যু রেজিষ্টার বহি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন আরাণ্ডালের মার জন্ম তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬ ইং মৃত্যু তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ ইং দুপুর ১টা। তাহার প্রতিবেশী আর একটি মৎস্য বিক্রেতা স্ত্রীলোক বলিল যে আরাণ্ডালের মা যেদিন মরে ঐ দিন দুপুর বেলা সাহেববাজার হইতে বাড়ী রওয়ানা হইতে সে তাহাকে দেখিয়াছিল এবং ঐ দিন দুপুর বেলা ২টার সময় সে নিজে বাড়ীতে গিয়া জানিতে পারে যে আরাণ্ডালের মা মরিয়াছে।

সেনাপতি সাহেবের পুনরাবির্ভাব।

এই ঘটনাটী অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া কিছুকাল পরে যুদ্ধ আফিসের সরকারী বিবরণী পর্য্যন্ত সংশোধিত হইয়াছিল। ঘটনাটী এই :—

কাপ্তান জার্মেণ হুইট ক্রপ্ট (Wheat Cropt) নামে

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতবর্ষের ৬নং ড্রেগুন নামক সৈন্য দলের সেনাপতি ছিলেন। ১৮৫৭ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ভারতে আসিয়া সেনানির কার্য গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নী সঙ্গে না আসিয়া ইংলণ্ডের কেমব্রিজ নগরীতে বাস করিতে- ছিলেন। ঐ সনের নবেম্বর মাসের ১৪ তারিখ (তারিখ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হইবে) রাত্রি ১২টার পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তাহার পতি অত্যন্ত বাকুল পীড়িত। এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনিও অত্যন্ত বাকুল হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময় রাত্রি ছিল। তিনি এদিক ওদিক চাহিতেছেন এমন সময় দেখেন তাহার পতি বিছানার নিকটে দাড়াইয়া। পরিধানে সেনাপতির পোষাক। দুইহাত বৃকের উপর জড়ান। মাথার চুলগুলি এলো মেলো মুখশ্রী মলিন। উদ্বিগ্ন হইলে এক ভাবে ঠোট মুখ নাড়িবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। এখন ও ঠিক তাহাই করিতেছেন। মাথা একটু নোয়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া যেন কি বলিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কথা ফুটে না। এইভাবে সম্পূর্ণ এক মিনিটকাল থাকিয়া ছায়ামূর্তি বিলীন হইয়া গেল। মেম সাহেব খুব সতর্কতার সহিত সেই মূর্তির সর্বঙ্গ লক্ষ্য কবিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন বুক খোলা কোটের নীচে ধব্ ধবে সাদা সাটের বুক দেখা যাইতেছে। তাহাতে কোনরূপ রক্তের দাগ নাই।

মূর্তি অস্তহিত হওয়ার পর মেম সাহেবের প্রথম চিন্তা হইল তিনি বাস্তবিকই জাগ্রত কিনা। তিনি চাদর দ্বারা চোখ

মুছিলেন। চাদরের স্পর্শ প্রকৃত বলিয়াই বোধ করিতে লাগিলেন। বিছানাতে তাহার ভাইয়ের পুত্র একটা শিশু নিদ্রিত ছিল। ঐ নিদ্রিত শিশুর উপর লুইয়া দেখিলেন তাহার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। শ্বাসের শব্দের ও কোন বৈলক্ষণ্য নাই। স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে যাহা দেখিয়াছেন স্বপ্ন নহে। সেই রাত্রিতে তিনি আর নিদ্রা গেলেন না।

রাত্রি প্রভাতে তিনি তাহার মাতার নিকট সম্পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং ঐ ধারণা প্রকাশ করিলেন যে যদিও কোন রক্তের চিহ্ন দেখা যায় নাই তথাপি তাহার পতি মৃত হইয়াছেন কিম্বা গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন বলিয়াই তাহার দৃঢ় ধারণা। এই ঘটনা দ্বারা তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে সেই অবধি তিনি কোন নিমন্ত্রণে যান নাই। তাহার যুবতী বন্ধু গান বাজনার, আমোদ-প্রমোদের বৈঠকে যোগদান করার জন্ত তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিলেন তিনি এখন পর্য্যন্ত সধবা আছেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই। যে পর্য্যন্ত তিনি পতির কুশল সংবাদ সম্বলিত ১৪ নবেম্বরের পরবর্তী তারিখের লিখিত কোন চিঠি না পান সেই পর্য্যন্ত তিনি কোন আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবেন না।

নবেম্বর মাস এইভাবে গেল। ডিসেম্বর মাসে কোন এক মঙ্গলবার দিনের খবরের কাগজে কাপ্তান হুইট ফ্রন্ট সাহেবের মৃত্যু সংবাদ লগুন নগরীতে প্রচারিত হইল। টেলিগ্রামের খবর।

ইহার মৰ্ম্ম ছিল এই, “লক্ষ্মী এর নিকট ১৫ই নবেম্বর তারিখে সেনাপতি হুইট ক্রপ্ট যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।”

লণ্ডনের উইলকিন্সন্ সাহেব ছিলেন সেনাপতি সাহেবের সরকারী উকীল। বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার পূর্বাবধিই তাহার উপর স্থাপিত ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম খবরের কাগজে টেলিগ্রামের খবর দেখিলেন। এই ছঃসংবাদ জানিয়া উইলকিন্সন্ সাহেব সেনাপতির বাড়ীতে তাহার পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন সেনাপতি পত্নী বলিলেন যে এই নিদারুণ সংবাদে জ্ঞাত তিনি পূর্বাবধিই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর প্রচারিত তারিখ ১৫ই নবেম্বর প্রকৃত হইতে পারে না। কারণ ১৪ই নবেম্বর তারিখে সেনাপতি সাহেব তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন।

উইলকিন্সন্ সাহেব উকীল। সম্পত্তির তত্ত্বাবধান জ্ঞাত তাহার মক্কেল সেনাপতি সাহেবের মৃত্যুর সার্টিফিকেট সময় আফিস হইতে লইলেন। তাহা এইরূপ :—

“নং ৯৫৭৯

সমর অফিস,

৩০শে জানুয়ারী, ১৮৫৮ ইং

সমর অফিসের বিবরণী দৃষ্টে এই সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে ৬নং ড্রেগুন সৈন্যদলের সেনাপতি ১৮৫৭ ইং ১৫ নবেম্বর তারিখে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

(স্বাক্ষর) বি, হাওয়েস।

উইলকিন্সন্ সাহেব সেনাপতির মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে সন্দিক্-
চিত্ত রহিয়াছেন এমন সময়ে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।
তদ্বারা টেলিগ্রামের লিখিত তারিখ সম্বন্ধে আরও সন্দেহ উপস্থিত
হইল।

ঘটনাটী এই :- উইলকিন্সন্ সাহেব তাহার এক বন্ধুর
বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাহার বন্ধুর স্ত্রী আজীবন
ভৌতিক আবির্ভাব সংক্রান্ত বাপারের চর্চা করিতেন এবং এ
বিষয়ে তাহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাহার পতি ছিলেন
একজন ভাল মিডিয়াম।

[মেস-মেরাইজ করিতে হইলে কোন একটী লোকের উপরে
প্রেতাত্মার আবির্ভাব করাইতে হয়। যাহার উপর ঐরূপ
- আবির্ভাব করান হয় তাহাকে মিডিয়াম বলে।]

এই কথাটা কেবল তাহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগেরই বিদিত
ছিল। অগ্রে জানিত না। ঐ ছই ব্যক্তির (স্বামী স্ত্রী) নাম
প্রকাশ করার অনুমতি না থাকায় তাহাদের নাম পাওয়া
যায় না। এন্ এবং এন্ পত্নী বলিয়াই তাহাদের উল্লেখ
আছে।

মিঃ উইলকিন্সন্ তাহার বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর (এন্ ও এন্
পত্নী) নিকট সেনাপতি ছইটক্রেপ্ট যে ভাবে তাহার পত্নীকে
দেখা দিয়াছিলেন, তাহার চেহারা পোষাক এবং অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি
সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিবা-
মাত্র এন্ পত্নী এন্ এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “ঐ যে এক

দিন সন্ধ্যার সময় আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথাবার্তা করিতে করিতে একজনকে দেখিয়াছিলাম নিশ্চয় তিনিই হইবেন। আপনি তখন একটা হাতী আঁকিতেছিলেন। ঐ হাতীর পৃষ্ঠে হাওদা আঁকা হইয়াছিল। মিঃ উইলকিনসন্ যেরূপ বিবরণ দিতেছেন তাহার সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। সেই ইংরেজ সেনাপতির পোষাক। সেই বৃকের উপর জড়ান হাত! সেই সম্মুখের দিকে নওয়া! অবিকল একরূপ!

তিনি তখন উইলকিনসন্কে বলিলেন, “ঐ লোকটী ঐ দিন আমার পতির পিছন দিকে থাকিয়া তাহার বাম কাঁধের দিকে তাকাইয়াছিল।

উইলকিনসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি তাহার কোন সংবাদ লইয়াছিলেন কি?”

“হাঁ। মিডিয়াম স্বরূপে) আমার পতির মারফতে সংবাদ লইয়াছিলাম।”

“ঐ সংবাদের মর্ম্ম আপনার মনে আছে?”

“মর্ম্ম এইরূপ যে সেই দিনই বৈকালে তিনি ভারতবর্ষে নিহত হইয়াছেন। আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে ইহাও তিনি বলিলেন যে তাহার দেহটী তখন পর্য্যাপ্ত কবর দেওয়া হয় নাই। এই কথাটির প্রতি আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম।”

“ঘটনাটী কবে হইয়াছিল?”

“একদিন রাত্রি প্রায় ৯ টার সময়। কয়েক সপ্তাহ হইল। ঠিক তারিখটা মনে হয় না।”

“এমন কিছু আপনি মনে করিতে পারেন কি না যদ্বারা তারিখ নিরূপন করা যাইতে পারে ?”

এন্ পত্নী চিন্তা করিলেন, “না এমন ত কিছু মনে হয় না।” তখনই পুনরায় বলিলেন, “হাঁ একটা ঘটনা মনে পড়িল আমার পতি যখন চিত্র আঁকেন, তখন আমি আমার একজন আত্মীয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। তখন চাকর আসিয়া সংবাদ দেয় যে আমি যে এক বোতল সিরকা কিনিয়াছিলাম তাহার মূল্য দেওয়ার জন্য বিল লইয়া আসিয়াছে। তাহাতে আমাদের কথাবার্তা ভঙ্গ করিতে হয়।”

“তখন আপনি কি মূল্য দিলেন ?”

“হাঁ, চাকরের হাতে মূল্যটা দিয়াছিলাম।”

“রসিদ আছে ?”

“বোধ হয় উপরের তালায় আছে। আচ্ছা‘দেখি।”

অমনি উপরের তালায় গিয়া রসিদ বাহির করিয়া আনিলেন। তারিখ রাঁহিয়াছে ১৪ই নবেম্বর !!

এই ঘটনার তারিখের সঙ্গে সেনাপতি পত্নীর সাক্ষাতের তারিখ মিলিয়া যাওয়া, সেনাপতির মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে উইলকিন-সন্ সাহেবের সন্দেহ এত প্রবল হইল যে তিনি সমর আফিসের মিঃ কব্জ ও মিঃ গ্রিগউড সাহেবের নিকট নিজে গিয়া সেনাপতি ইন্সট্রাক্ট সাহেবের মৃত্যু সার্টিফিকেটে কোন ভুল আছে কি না তদন্ত করান। কিন্তু ঐ তদন্ত দ্বারা ভুলের সন্দেহ সমর্থক কোন কারণ বাহির হইল না। স্মর কলিন কেম্বেলের প্রেরিত দুইটী

বিবরণী কাপ্তান লুইটক্রপ্টের মৃত্যুর উল্লেখ ছিল এই বিবরণীতেই তারিখ দেখা গেল ১৫ই নবেম্বর। কাজেই আপাততঃ কিছুই হইল না। সময় যাইতে লাগিল।

১৮৫৮ ইং মার্চ মাসে কাপ্তানের বাড়ীতে লক্ষ্মী হইতে এক চিঠি আসিল। ঐ চিঠি ১৮৫৭ ইং ১৯ ডিসেম্বরের লিখিত। সমর বিভাগের কাপ্তান জি, সি এই চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ চিঠির মর্ম্ম এই যে সেনাপতি লুইট ক্রপ্ট লক্ষ্মীর যুদ্ধে সাহসিকতার সহিত সৈন্য চালনা করিতে থাকা অবস্থায় ১৪ই নবেম্বর তারিখে বিকালে নিহত হইয়াছেন। কাপ্তান সি, ঐ সময়ে তাহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাহার পতন দেখিয়াছেন। কামানের গোলার একটা খণ্ডাংশ তাহার বক্ষে প্রবেশ করে। তাহাতেই তিনি ধরাশায়ী হন। আর কলিন কেমেল যে ১৫ই নবেম্বর তারিখে মৃত্যু বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক। দেলখোস নামক স্থানে তাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে। তাহার বন্ধু ৯নং সৈন্যদলের বর্শাধারী সেনাপতি লেপ্টনেন্ট আর মহাশয় কাষ্ঠ নিষ্মিত ক্রশ তৈয়ার করাইয়া তাঁহার কবরের উপরে প্রোথিত করাইয়া রাখিয়াছেন। ঐ ক্রশে খোদিত আছে সেনাপতির নামের সংক্ষিপ্ত দুই অক্ষর জি, ডবলিউ এবং মৃত্যু তারিখ ১৪ই নবেম্বর ১৮৫৭ ইং।

কিছুকাল পরে সমর আফিসের বিবরণীর লিখিত তারিখ সংশোধিত হইয়াছিল। ১৮৫৯ ইং এপ্রিল মাসে উইলকিন্সন সাহেবের ঐ মৃত্যু সার্টিফিকেটের আর একখানা নকল লওয়ার

অবশ্যক হয়। ঐ সময় নকল লইয়া দেখেন তাহার তারিখ হইয়াছে ১৪ই নবেম্বর।

মৃত ভগ্নীর কীর্তি :

সিসিলিয়ার ভগ্নীর নাম এচ্‌থার। অল্লদিন হইল এচ্‌থারের বিবাহ হইয়াছে এবং নবদম্পতি যুগল অর্থান্বেষণে আমেরিকার অন্তঃপাতী কালীফর্ণিয়া দেশে রওয়ানা হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে কালীফর্ণিয়া নূনকল্লে ও আট হাজার মাইল দূরবর্তী। সিসিলিয়া পতিপুত্র সহ ইংলণ্ডে আছে এবং শীঘ্রই এচ্‌থারের চিঠি পাইবে একরূপ আশা করিতেছে। একদিন সিলিসিয়া স্বপ্নে দেখিল এচ্‌থার আসিয়া তাহার বিছানায় বসিয়া বলিতেছে, “দিদি কালীফর্ণিয়া যাবে চল। আমাদের বাসা দেখিয়া আসিবে।” সিসিলিয়া উত্তর করিল, “আমার পতি পুত্র এখানে ফেলিয়া এতদূরে কি করিয়া যাই।” এচ্‌থার বলিল, “অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যাওয়া হইবে এবং প্রভাতের পূর্বেই পুনঃরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে।”

স্বপ্নে এই কথাটা সিলিয়ার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইল না। তিনি স্বীকার করিলেন এবং এচ্‌থারের হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল যে এচ্‌থারের সহিত যেন শূন্যে ভাসিয়া অসম্ভব দ্রুত গতিতে চলিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই এক বাড়ীতে নামিয়া দেখিল বাড়ীটা খুব সুন্দর বা পছন্দসই নয়। একরূপ বাড়ীতে এচ্‌থার ও তাহার পতি বাস করিবে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল না। যা হউক উভয়ে ভিতরে

প্রবেশ করিলেন। সিসিলিয়া দেখিলেন এচ্‌থারের পতি নিতান্ত শোকার্ত ভাবে শোকের পোষাক পরিধান করিয়া আছেন। পর মুহূর্তেই এচ্‌থার সিসিলিয়াকে পার্শ্ববর্তী কোঠার মধ্যস্থলে লইয়া গেল। ঐ কোঠার মধ্যস্থলে একটা শবাধার। ইহার ডালাটী খোলা। ভিতরে শব রহিয়াছে। সিসিলিয়া দেখিলেন এচ্‌থারের দেহ !!

সিসিলিয়া স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছেন এমন সময় তাহার সঙ্গী (জীবিতব্য প্রতিভাত) এচ্‌থার বলিল, “হাঁ, দিদি, আমারই দেহ ছিল। কিন্তু ভীষণ রোগ ইহাকে আক্রমণ করে। আমার কলেরা হইয়াছিল এবং দেহত্যাগ করিয়া লোকান্তরে আছি। কয়েকদিন পরে খবর পাইয়া তুমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। সেইজন্য পূর্বেই তোমাকে বিষয়টা সম্পূর্ণ দেখাইয়া দিলাম।” অল্পক্ষণ পরেই সিসিলিয়া আবার যেন আকাশে উঠিল এবং রাত্রি থাকিতে নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া পূর্ববৎ শয়ন করিল !!

বলা বাহুল্য পরে তদন্ত করিয়া জানা গেল এচ্‌থারের মৃত্যু, তাহারের বাসার অবস্থা ইত্যাদি অবিকল মিলিয়া গিয়াছে !!

যে সকল লোক যুদ্ধে নিহত হয় মৃত্যুকালে তাহাদের দেহ, মন সাধারণতঃ সবল থাকায় বিশেষতঃ তাহাদের বয়সও অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তাহাদের বাসনা, আকাঙ্ক্ষা আদি অত্যন্ত বলবৎ থাকে। ইহা ছাড়াও যুদ্ধের মৃত্যুতে স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গের কেহই নিকটে থাকে না। এই কারণে যুদ্ধে মৃত

ব্যক্তিদের প্রেতাঙ্গা অনেকস্থলেই নিজ আপন জনকে দেখা দিয়া থাকে। বিগত জার্মান যুদ্ধ উপলক্ষে এইরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বার্ণমাথ্ নামক স্থানের এক ভদ্রমহিলা নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পতি ডিভনের একজন সার্জেন্ট ছিলেন। বিগত মহাসমরের তিনি ১৯১৫ ইং ২৫শে জুলাই তারিখে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যান। তাঁহার পত্নী প্রায় সর্বদাই তাহার কুশল সংবাদ সম্বলিত চিঠিপত্র পাইতে থাকেন এবং এইরূপ চিঠিপত্র পাওয়াতে তাহার মনে বেশ ভরসা জন্মিয়াছিল যে তাহার পতির কোন অশুভ ঘটনাই না।

সেপ্টেম্বর মাসের ২৫শে তারিখ রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে তাহার শয়নকক্ষে শয্যার উপরে বসিয়া অপর একটা মেয়ের সঙ্গে যুদ্ধ সম্বন্ধে কথাবার্তা করিতেছিলেন। এই আলাপে তাহারা এতই একাগ্রচিত্ত হইলেন যে তাহাদের ঘুমাইবার বিষয়ে মনেই পড়িতেছিল না।

এই অবস্থায় আলাপ চলিয়া আসিতেছে। হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গেল। একেবারে নীরব। মহিলাটী একটা কথার মাঝখানে হঠাৎ চুপ করিয়া রহিলেন এবং এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন !

যুদ্ধের পোষাক পরিয়া তাহার পতি সম্মুখে দাড়াইয়া আছে। দুই তিন মিনিট সময় তিনি এইভাবে চাহিয়া রহিলেন। তাহার

চেহারাতে দুঃখের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মহিলাটি হঠাৎ উঠিলেন এবং ধব করিয়া সেই ছায়ামূর্তির নিকটে গেলেন। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে সেই দৃশ্য অন্তর্হিত হইল।

সেইদিন সকালে তিনি এক চিঠি পাইয়াছিলেন তাহাতে তাহার পতি ভাল আছেন বলিয়াই লিখিত ছিল। তথাপি তাহার ঘোরতর আশঙ্কা হইল। তাহার আশঙ্কা পরদিনই সত্যে পরিণত হইল। তিনি সমর আফিসের চিঠি পাইলেন যে তাহার পতি ১৯১৫ ইং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে লুজের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন।

কর্তৃত্ববাহু সেনা-নায়কের বৃত্তান্ত।

বিগত মহাসমরের সময় ইংলণ্ডের এক সেনা নায়ক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেনভাস নামক স্থানে সেনা নায়কত্ব করিতেছিলেন। তাহার সৈন্যদল তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল; তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। ঘটনা ক্রমে ঐ যুদ্ধ ব্যাপারে তাহার একটি বাহু নষ্ট হইয়া গেল এবং জীবন রক্ষার্থে ঐ বাহু কাটিয়া ফেলিতে হইল। বাহুহীন অবস্থায় সেনা-নায়কত্ব করার উপায় না থাকায় তাহার কর্মত্যাগ করিতে হইল। তাহার কর্মত্যাগে অধীনস্থ সৈন্যগণ অস্তুরে ব্যথা পাইল। তিনি কর্মত্যাগ করিয়া রওয়ানা হইলেন। বাড়ীতে কয়েক মাস থাকিয়া তাহার শরীর সুস্থ হইল! কর্তৃত্ব বাহুর স্থান একটা কৃত্রিম বাহুদ্বারা পূর্ণ করা হইল! কার্যক্ষম উৎসাহশীল লোক অলস ভাবে বসিয়া

থাকিতে অস্বস্তি বোধ করিয়া পুনরায় সামরিক বিভাগে কর্ম পার্থী হইলেন।

কিন্তু বাহ্যহীন ব্যক্তিকে অধিনায়কত্ব পদ দেওয়া সম্ভব মনে না করিয়া সামরিক বিভাগ ইচ্ছাক্রমে তাহাকে দার্দানেলিস্ নামক স্থানে সৈন্য বিভাগে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। অগত্যা তিনি সেই স্থানে গিয়া কর্মে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু তাহার মন রহিল শ্রেণ্ডাসের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সঙ্গে !

কিছুদিন পরে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিদায় নিয়া বাড়ীতে রওয়ানা হইতে বাধ্য হইলেন। তিনি নিরাপদে ইংলণ্ডের সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন কিন্তু তথা হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত যে হাস্পাতাল গাড়ী যাতায়াত করে ঐ হাস্পাতাল গাড়ীতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

ঠিক যে সময়ে হাস্পাতাল গাড়ীতে তাহার জীবন শেষ হয় ঠিক ঐ সময়ে ফ্রান্সের ফ্রেণ্ডার্স নামক স্থানের সমরঙ্গনে তাহার ভূতপূর্ব সৈন্যদলের খনিতে খাতে তিনি আবির্ভূত হন। স্পষ্ট দিবালোক। বিশেষ পরিচিত শ্রদ্ধাযুক্ত সৈন্যগণ দ্রষ্টা এবং পরিচিত শ্রদ্ধাস্পদ সেনা নায়ক দৃশ্য। ভুল হওয়ার কোন কারণ বর্তমান নাই। সৈন্য দলের মেজর বলিয়া উঠিলেন, “বিষয়টা কি ? তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না !” এই বলিয়া তাহাকে অভিবাদন করার উদ্দেশ্যে মেজর সাহেব অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিকটে পৌছিবার সমকালে মূর্তি অদৃশ্য হইল। সৈন্যদের মধ্যে বহুলোকে স্পষ্ট দেখিয়াছিল এবং

হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ার বিষয়ে তাহাদের শ্বাস রোধ হওয়ার অবস্থা। কারণ যে সময়ে তিনি আবির্ভূত হন ঐ সময়ে তিনি দার্দানলিস্‌এ লেমচ্‌ নামক স্থানে ছিলেন বলিয়া সকলেই জানিত। কয়েকদিন পরে ডকে পৌঁছিলে তাহারা সকলেই জানিল যে ঠিক ঐ দিনে ঐ সময়ে তাহার মৃত্যু হইয়াছে !!

একাদশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু শয্যায় পরলোকগত আত্মীয়ের দর্শন ।

পাঠক পাঠিকাগণ অনেকেই হয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে মৃত্যুশয্যায় অনেক মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রলাপচ্ছলে পরলোকগত আত্মীয়ের উপস্থিতি জ্ঞাপন করে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ সব জ্বালা যন্ত্রণা যেন দূর হইয়া গেল ! যেন পরম আত্মীয় সমাগমে মন নিতান্ত উৎফুল্ল ও আশান্বিত হইয়া উঠিল। যেন দেহত্যাগ করিয়া উপস্থিত আত্মীয়গণের সঙ্গ লাভ করাটা অত্যন্ত লোভনীয় হইয়া উঠিল ; কেহ মায়ের কোলে যাইতেছেন, কেহ মৃত পিতা মাতা উভয়ের সান্নিধ্য লাভ করিতেছেন। কেহ পিতামহ, মাতামহ আদি পরম বন্ধুলোকের স্নেহ ভাজন হইতেছেন একরূপ ভাব স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এস্থলে আমার একটু বক্তব্য আছে। আমরা কোন সাধনা করি নাই। কোনরূপ যোগ অভ্যাস করি নাই। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের প্রতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে ও এ জীবনে চেষ্টা করি নাই। চিরটা কাল নিতান্ত মূর্খের ন্যায় মিথ্যা সংসারের প্রহেলিকায় পড়িয়া অলীক কাজে মনুষ্য জীবন অতিবাহিত করিতেছি। আমাদের পূঁজি মাত্র একটু খণ্ড বুদ্ধি, একটু খণ্ড

দৃষ্টিশক্তি, একটু খণ্ড শ্রবণ শক্তি, ইত্যাদি অতি সামান্য জ্ঞান—
 যাহা পশুপক্ষী আদি ইতর প্রাণীরও আছে। কোন কোন
 স্থলে পশুপক্ষীর জ্ঞান বেশী থাকাও প্রত্যক্ষই পাইতেছি। এই
 অবস্থায় আজীবন ভোগ-বাসনায় শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া
 অনাত্মবন্ত ভাবে জীবন কাটাইয়া আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে গুরুতর
 বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হই। বাস, বান্ধিকি,
 বশিষ্ঠ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ
 চৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ, মেডেম্ ব্লেভিস্ক, কর্ণেল আলকট,
 এনি বেশান্ত প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাধকগণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,
 ভোলানন্দ গিরি, কাঠিয়া বাবা, সম্ভদাস প্রভৃতি বর্তমান
 যোগসিদ্ধগণ একবাক্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তৎপ্রতি
 আমরা ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করি। আমরা যে এই সব
 করি, নিতান্ত মোহাক্ত না হইলে তাহা অস্বীকার করিবার যো
 নাই। যা হউক সেইটা আমাদের অজ্ঞতার দরুণই হউক বা
 বুদ্ধির আতিশয্য প্রযুক্তই হউক, ত্রায়ই করি কি অত্রায়ই করি
 তাহার বিচার না করিয়া অত্ৰাভাবে বিচার করিলে কি দাঁড়ায়
 তাহা একবার দেখিতে দোষ কি ?

ধরা যাক মুমূর্ষু ব্যক্তিগণ বুদ্ধিব্রংশ হইয়া অলীক স্বপ্ন দেখে।
 কিন্তু সত্যভাবেই হউক বা অলীকভাবেই হউক মায়ের কোলে
 যাওয়ার সুখটা তাহার হয়ত ? আত্মীয়-স্বজনের সহবাস লাভের
 শান্তিটা তাহার হয়ত ? অন্ততঃ সে ত বুঝিতে পারে না যে
 এই সব অলীক। সে ত তাহাদের সঙ্গে যাইতে নিতান্ত আনন্দ

লাভ করে। প্রত্যেক কথা প্রত্যেক ভাবভঙ্গির দ্বারা তাহার আভ্যন্তরিক বিমল আনন্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠে! তাহা যদি হইল তবে স্বার্থপর মানব আমরা, আমরা নিজ আনন্দ ছাড়া কি চাই। মুমূর্ষুগণ মধো যাহারা এইরূপ আনন্দ পান তাহা আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি? যখন দেহ সঙ্গে আত্মার সংশ্রব একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যখন ইহলোকের কেহকে চিনে না, কেহকে দেখিতে পায় না, কাহারো কোন সাহায্য বা বল ভরসা পাইবার কোন উপায় থাকে না। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে ঐ অবস্থাটাকে মৃত্যুবস্থা বলা যায়। সর্ব্বশরীর শীতল। জড়তা প্রাপ্ত। ঐহিক ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত। আজীবন শ্বাস প্রশ্বাস লইবার অভ্যাস বশতঃ কণ্ঠমালী হইতে মুখ পর্য্যন্ত শ্বাস লওয়ার মত একটা দৃশ্য থাকে মাত্র। ইহাকে জীবিতাবস্থা বলা ঠিক হয় না। তা যদি ঠিক হয় তবে ত মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা আমরা দেখিতেই পাইলাম।

যাঁহারা মুমূর্ষু অবস্থায় ঐ সকল আত্মীয় দর্শন ব্যাপারকে অলীক স্বপ্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারাষ্ট আবার বলেন যে সারা-জীবনের সংস্কার ও পরিচয় বশতঃই এইরূপ স্বপ্ন হইয়া থাকে।

তাহা যদি মানিয়া লওয়া যায় তা হইলে ও মৃত আত্মীয়গণ পরলোকে জীবিতভাবে আছেন এবং মৃত্যু সময়ে উপস্থিত হইয়া সহায়তা করিবেন এইরূপ ধারণা বা কুসংস্কার লইয়া মরাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ এইরূপ

সংস্কার বা ধারণা থাকিলেই ঐ অলীক স্বপ্ন আসিবে। যে স্বপ্ন নিক্রপায়ের উপায়! অসহায়ের সহায়! নিদানের বন্ধু !!

আর যদি দেহতাগ মাত্রই পিতামাতা ভাইবন্ধু আদি আত্মীয়ের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায় এইরূপ ধারণা বা সংস্কার জন্মাইয়া মরা যায় তা হইলে মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই ঐ রকম স্বপ্ন হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তা হইলে প্রাণবায়ু সর্বতোভাবে বহির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত হইলেও ঘোরতর ক্লেশ হওয়ার বিষয়। ধরা গেল তৎপর যেন আর কিছুই থাকিবে না।

মাননীয় স্যার উইলিয়ম বেরেট্‌ এফ্‌, আর, এন্‌ মহাশয় মৃত্যু শয্যার দৃশ্যাবলী নামক একটি গ্রন্থ ইদানীং প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অনেকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত আছে। যে সকল লোককে মৃত্যু শয্যা দেখা যায় তাহাদের সবই পূর্বমৃত। তবে যে স্থলে কোন এক আপন ব্যক্তি যিনি পূর্বে মরিয়াছেন বলিয়া মুমূর্ষু অবগত হইতে পারেন নাই, তিনি যদি মুমূর্ষুর দৃষ্টিগোচর হন তাহা হইলে ঐ দৃশ্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। এমন একটি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করা যাইতেছে।

জেনি ও এডিথের বৃত্তান্ত।

নিকটবর্তী কোনও সহরে জেনি ও এডিথ্‌ নামে দুইটী বালিকা এক বিদ্যালয়ে পড়িতেছিল। তাহারা সমপাঠী ও সমবয়স্কা। একটীর বয়স ৮ বৎসর আর একটীর বয়স

কিঞ্চিদধিক। পরস্পরের মধ্যে খুব মনের মিল ছিল। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত। ১৮৮৯ ইং জুন মাসে উভয়েরই ডিপ-থিরিয়া রোগ হইল। বুধবার দিন দুপুরবেলা জেনি মরিয়া গেল। এই ঘটনা (জেনির মৃত্যু) যদি এডিথকে জানিতে দেওয়া হয় তবে তাহার রোগের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় এডিথের পিতা এবং চিকিৎসক উভয়ে পরামর্শ করিয়া এডিথ যাহাতে জানিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন।

জেনির মৃত্যু যে এডিথের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল তাহা আর একটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী শনিবার ৮ই জুন দুপুরবেলা এডিথ তাহার নিজের দুইখানা ফটো বাছিয়া তাহার শুশ্রূষাকারীর হাতে দেয় এবং ঐ ফটো দুইখানা জেনির নিকট পাঠাইতে এবং জেনির নিকট বিদায় লওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানাইতে অনুরোধ করে। ইহার অত্যল্পকাল পরেই এডিথ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। ঐ শনিবার দিনই বৈকাল সাড়ে ছয়টায় এডিথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়ে তাহার সংজ্ঞা আসে। বন্ধুগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করে এবং মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া প্রকাশ করে। তাহার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই মত ভাব প্রকাশিত হয়। তাহার কথাবার্ত্তা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে তাহার মৃত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত যেন সচরাচর সংঘটিত—অবস্থার ত্যায় অবস্থা। তাহার পরক্ষণেই যেন চমকিয়া উঠিল। বলিল “জেনি, জেনি আসিয়াছে। জেনি যে এখানে বাবা ত আমাকে তা বলেন নাই। আমি

জেনির সঙ্গে যাই। অমনি যেন অত্যন্ত আদরের সহিত দু হাত বাড়াইয়া জেনিকে অভ্যর্থনা জানাইল। এবং বলিল, “জেনি, তোকে পাইয়া আমি কত খুসী হইয়াছি!”

এডামিনার রূতান্ত।

[দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশের ভার্দাদেইলাস্ নামক মাসিক পত্রিকায় ১৮২৪ ইং সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয়।]

এডামিনা তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্বে তাহার পিতাকে বলে যে তাহাদের পরিবারের পূর্ব মৃত ব্যক্তিগণ তাহার শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছেন। পিতা মন্তব্য করিলেন, “এ গুলি প্রলাপ মাত্র”। এডামিনা অধিকতর উৎসাহের সহিত উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম বলিতে লাগিল। তন্মধ্যে তাহার ভাই আলফ্রেডের নামও বলিল। আলফ্রেড কিন্তু ৪২৩ কিলমিটার দূরবর্তী সিসল্ নামক স্থানের এক আলোক গৃহে চাকরী করিতেছিল। পূর্বের দিনও পিতা তাহার কুশল সম্বলিত চিঠি পাইয়াছেন সে জীবিত লোক। সে কিরূপে অদৃশ্যভাবে এডামিনার নিকট উপস্থিত হইবে? এ সব প্রলাপ। ঐদিন সন্ধ্যার সময় এডামিনা দেহত্যাগ করিল। পরদিন সকালবেলা এক টেলিগ্রামে আলফ্রেডের মৃত্যু সংবাদ আসিল। তুলনা করিয়া দেখা গেল এডামিনার মৃত্যুর পূর্বেই আলফ্রেড মরিয়াছিল।

উপরি-উক্ত ঘটনা দুইটির সত্যতা সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ইহাদের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে যে

আমাদের ইহকালের নিয়মাবলীর দ্বারাই পারলৌকিক ব্যাপার পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। আমাদের কে কখন মরণাপন্ন হয় পরলোকবাসীগণ তাহা জানিতে পারেন।

ইহলোকে যাহারা সুহৃদ তাহারা পরলোকে গিয়াও সুহৃদই থাকেন। ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়লোক ব্যাপী। যিনি যত বেশী লোককে ভালবাসিতে পারেন, যত বেশী লোকের উপকার ও সাহায্য করিতে পারেন তিনি ইহলোকে যেমন দুখ স্বচ্ছন্দ লাভ করেন পরলোকেও তাহাই হয়। দুদিনের পাখিব জীবন শুদ্ধ পরোপকার ও শ্রীতির উৎকর্ষ সাধনের জন্ম। হিংসা দ্বেষ ও দলাদলি দ্বারা শত্রুতা সৃজন করতঃ আত্মাকে কলুষিত করার জন্ম নয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে আবির্ভাব

মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাহারা তাহাদের জীবিত স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অনবরত দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং সর্বদা তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করার ও সাহায্য করার চেষ্টা করেন। এই সকল চেষ্টার প্রণালী নানা রকম হইতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের প্রণালীই সচরাচর অবলম্বিত হয়।

(১) শুভাশীর্বাদ বা শুভাকাঙ্ক্ষা দ্বারা। একের শুভাশীর্বাদ দ্বারা অপরের উপকার সর্বদাই হইতেছে। আশীর্বাদকারীর মানসিক বলের তারতম্য অনুসারে এবং সেই বল প্রয়োগের শক্তির তারতম্য অনুসারে ফলোৎপত্তির তারতম্য হয় এই মাত্র। আশীর্বাদকারী যতই একাগ্রতার সহিত আশীর্বাদ করিবে ঠিক সেই মাত্রায় আশীর্বাদ কার্যকরী হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। যাহারা নিজ কুকর্ম দ্বারা মাতৃপিতৃ স্নেহ হইতে বঞ্চিত না হয় তাহারা মাতাপিতার আশীর্বাদে অনেক উপকার পাইয়া থাকে। যাহাদের মাতা পিতা সৎ ও উদার চরিত্রের লোক তাহাদের তো কথাই নাই, ইহার ব্যতিক্রম স্থলেও মাতা পিতার আশীর্বাদ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। তাহাতে একাগ্রতাটুকু

থাকেই এবং সরলতাও থাকে। অসরল ভাবে মৌখিক আশীর্বাদের কোনও ফল নাই।

(২) মানসিক বলের দ্বারা স্নেহাস্পদের মনে ধারণা জন্মাইয়া।
—এমন ঘটনা হয় যে এক ব্যক্তি নোহের বশীভূত হইয়া একটা কুকার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন তাহার মৃত পিতা বা মাতা মনের দ্বারা তাহার ক্রমশঃ ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারেন যে সে ঐ ধারণামূলে তাহার পিতা কিম্বা মাতাকে সশরীরে উপস্থিত বলিয়া মনে করিবে এবং তদ্রূপ কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে। এইরূপ করাটা অপেক্ষাকৃত কঠিন। অনভ্যস্ত লোকে সচরাচর ইহা করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু আগ্রহের অতিশয় প্রাবল্য হইলে অনভ্যস্ত লোকেরও ঐ ক্ষমতাটি সাময়িকভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৩) মনের বল দ্বারা সৃষ্টিদেহের ভিতরে সাময়িক ভাবে স্থূল পদার্থ আকর্ষণ করতঃ ঠিক জড়-দেহ প্রস্তুত ক্রমে দেখা দেয়। এই বিষয়টা অতিশয় কঠিন। যোগী পুরুষদিগের ও ঐ ক্ষমতা কদাচিৎ আয়ত্ত হয়। কাটিয়া বাবা, বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী, অবলীলাক্রমে তাহা করিতে পারেন ও করিতেছেন। আবার বাসনার প্রাবল্য স্থলে স্থলে অসম্ভব ও সম্ভব হয়। প্রগাঢ় অপত্যস্নেহের বশীভূত হইলে কিম্বা বিজাতীয় প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল হইলে সাধারণ লোকেও এইরূপ করিতে পারে। এই অবস্থায় মূর্ত্তিটা উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। কথা বলিতে পারে। সকলেই শুনিতে পায় এবং বলের কাজ ও সাধন করিতে পারে।

আবার ইহলোক, প্রেতলোক পিতৃলোক স্বর্গলোক আদিত এমন সব শক্তিশালী প্রাণী আছেন যাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক একে অণ্ডের চেহারা অবলম্বন করিয়া লোকের দৃষ্টি পথারুঢ় হইতে সমর্থ। রামায়ণে পাওয়া যায়, অঙ্গদ রাবণের সভায় গিয়া দেখে যে সভাশুদ্ধ সবই রাবণ। মাত্র ইন্দ্রজিৎ আলাদা। কথাটা যদি বাল্মিকীর কল্পনা প্রসূত হইয়া থাকে তথাপি বাল্মিকীর মত ব্যক্তির পক্ষে একরূপ কল্পনা অশোভন নহে।

যেহেতু বাল্মিকীর এইরূপ ক্ষমতা থাকা কিছুতেই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। মহামতি লিড্‌বিটার সাহেব বলেন যে তাঁহার সমিতিভুক্ত কোন কোন ব্যক্তি সত্বেদেহ প্রদেহিত হইয়া বাঞ্ছিত পরোপকার সাধন করার জন্য সময় বিশেষ এইরূপ করিতে বাধ্য হন ও করেন।

আবির্ভাবের প্রকৃতি কোন স্থলে কিরূপ তাহা অবস্থানুসারে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

মাতৃস্নেহের দৃষ্টান্ত।

ডাক্তার জন মেসন নিয়েল সাহেব একটী সুন্দর আবির্ভাবের বৃত্তান্ত প্রচার করিয়াছেন। ঘটনাটী এইরূপ :—

এক ভদ্রলোকের পত্নী বিয়োগ হওয়ায় তিনি তাহার ক্ষুদ্র শিশুগুলিকে তাহার পল্লীগ্ৰামস্থ কোন বন্ধুর তত্ত্বাবধানে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া নিজে অত্যাঁ কাজ করিতেন এবং প্রায়ই ঐ বাড়ীতে গিয়া শিশুগুলিকে দেখিয়া আসিতেন। সেই বাড়ীর দালানটা ছিল পুরাতন। সাবেকী ধরণের। ঐ বাড়ী হইতে

নামিবার দুইটী রাস্তা ছিল অন্ধকার পূর্ণ। শিশুগুলি ঐ রাস্তার মধ্যে উঠানাবা ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিত। একটী রাস্তার পার্শ্বে বাড়ীর বহির্ভাগে একটী পাতকুয়া ছিল। ঐ কুয়াটী কোনরূপ বেড়া দ্বারা ঘেড়াও করা ছিল না।

একদিন শিশুগুলি একটী রাস্তা দিয়া নামিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেছে এমন সময় হঠাৎ দৌড়াইয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়া বড় দুইটী গস্তীর ভাবে বলিল যে তাহাদের মা আসিয়াছে এবং তাহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসার জন্ত বলিয়াছেন। পিতা বলিলেন “তোরা ভুল দেখিয়াছিস্। তোদের মা কি বাঁচিয়া আছে যে ফিরিয়া আসিবে।” তখন ছেলে দুইটী বলিল, “আমরা কি মাকে চিনি না? নিশ্চয়ই আসিয়াছে। আপনি আশুন দেখিতে পাইবেন।”

তখন ঐ ভদ্রলোক শিশুদের সঙ্গে গেলেন। কিন্তু তখন আর কিছুই দেখা গেল না। যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিল সেই নির্দিষ্ট স্থানটি শিশুরা দেখাইল। ইহার কোনদিক হইতে কোনদিক দৌড়াইয়াছিল তাহাও দেখাইল। স্থানীয় অবস্থা দ্বারা বুঝা গেল যে শিশু ছেলেরা ঐভাবে দৌড়াইলে হঠাৎ কুয়াতে পড়িয়া মৃত্যু অনিবার্য ছিল। এবং তাহাদের এমন স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন যে তথায় দাঁড়াইলে শিশুরা কিছুতেই কুয়াতে পড়িতে পারে না।

এই ঘটনাটী দ্বারা এই অনুমান হয় যে শিশুগুলি অসহায় অবস্থায় পতিত হওয়ায় তাহাদের মাতা তাহাদের উপর সতর্ক

দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাহাদের আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করার প্রবল আগ্রহ থাকায় তাহাদিগকে যে ভাবেই হউক দেখা দেওয়ার অথবা দেখিয়াছে বলিয়া অনুভূতি জন্মাইবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য পিতার আগমন।

ফরাসী দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার ডবলিউ, ডি. সারামিন নিম্নলিখিত ঘটনাটা বিবৃত করিয়াছেন :—

জিয়ান ভিটানিস্ নামে একজন দৃঢ়কায় শক্তিশালী মূস্থ লোক ছিলেন। তিনি বিবাহিত কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন। ৩৯ বৎসর বয়সে হঠাৎ তিনি প্রবল জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। সেই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থিতে নিদারুণ বেদনা হইয়াছিল। লক্ষণগুলি ছিল আমবাতের। ঐরূপ রোগের চিকিৎসা প্রণালী বর্তমানে যেরূপ প্রচলিত আছে ঐ সময়ে তাহা প্রচলিত ছিল না। ঐ সময়ে প্রচলিত ঔষধ আদি প্রয়োগে এই প্রকার রোগী ৭১৬ সপ্তাহ কাল ভুগিয়া কোন স্থলে আরোগ্য হইত আবার অনেক স্থলেই মারা যাইত। আমি নিজে ঐ রোগীর চিকিৎসা করিতাম।

রোগীর অবস্থা কিছুতেই উন্নতির দিকে যাইতেছে না। এইরূপ অবস্থাতে রোগোৎপত্তির ষোড়শ দিবসে প্রাতঃকালে আমি যাইয়া দেখি রোগী বেশ পোষাক পরিয়া বিছানায় বসিয়া আছে। মুখে মুদ্র হাসি। হাত, পা যথেষ্ট নাড়া চাড়া করিতেছে। জ্বর সম্পূর্ণ বিরাম !!

পূর্বের দিন বৈকালে আমি নিজে রোগীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার শরীরের সবগুলি গ্রন্থি ক্ষীণ ছিল এবং তাহাতে ভয়ানক বেদনা ছিল। জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী ছিল। এক রাত্রির মধ্যে কিরূপে এত উপসর্গ দূর হইতে পারে তাহার কিছুমাত্র কারণ আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। রোগীটী অত্যন্ত ধীরভাবে আমাকে বলিল যে বিগত রাত্রিতে তাহার মৃত পিতা আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়াছিল এবং সেই কারণেই সে হঠাৎ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সে আমাকে যাহা বলিল তাহার মোটামোটি বিবরণ এইরূপ :—

“গত রাত্রে আমার মৃত পিতা আমাকে দেখিতে আসিয়া ছিলেন। বাগানের দিকে যে জানালা আছে ঐ জানালাটি দিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। প্রথমতঃ একটু দূরে থাকিয়া আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকান। তৎপর কাছে আসিয়া আমার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দেন এবং তাহাতে তৎক্ষণাৎ আমার জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং সমস্ত গ্রন্থির বেদনা ও কোলা দুরীভূত হয়। তখন তিনি আবার ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে আজই সন্ধ্যার পর রাত্রি ঠিক ৯ টার সময় আমার মৃত্যু হইবে। আমি আজই মৃত্যুর পূর্বে অবশ্য করণীয় ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া (অপরাধ স্বীকার, মন্ত্র গ্রহণ আদি) সম্পন্ন করিব। আপনার চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এবং অকপট চিত্তে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে আপনার চিকিৎসার কোনরূপ ক্রটি বশতঃ আমার মৃত্যু হইতেছে না।

আমার পিতারই আকাজক্ষা যে আমাকে লইয়া যান। তিনি পুনরায় নিজে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। তিনি রাত্রি ঠিক ৯টার সময় আসিবেন।”

তিনি হাসিমুখে অত্যন্ত শান্তির সহিত আমাকে এই কথা-গুলি বলিলেন। তাহার আকৃতি প্রকৃতি ও হাবভাব দ্বারা বুঝা গেল, তিনি অত্যন্ত শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

আমি বলিলাম, “আপনি একটা অলৌক স্বপ্ন মাত্র দেখিয়াছেন। আমি আশ্চর্য্যাব্বিত হইলাম যে আপনি আবার তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন।”

তিনি উত্তর করিলেন, “না না ইহা স্বপ্ন নয়। আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলাম। বাস্তবিকই আমার পিতা আসিয়াছিলেন। আমি পরিষ্কার দেখিয়াছি এবং তাহার কথা শুনিয়াছি। তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জীবিতের জায় অনুভব করিয়াছি।’

“কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে আপনার মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যত বাণীতে বোধ হয় আপনি বিশ্বাস করেন না। যেহেতু আপনার রোগ তো সারিয়াছে?”

“কিন্তু আমার পিতা আমাকে বঞ্চনা করিতে পারেন না। আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে যে তাঁহার কথিত নির্দিষ্ট সময়ে আমার মৃত্যু হইবে।” তাহার নাড়ী দেখিলাম শান্ত নিয়মিত এবং পূর্ণ। শারীরিক উত্তাপ দেখিলাম স্বাভাবিক। ঘোরতর রোগের বিন্দুমাত্র লক্ষণ পাইলাম না। তথাপি পরিবারস্থ লোককে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলাম যে



সন্ধ্যাস শ্রেণীর বাতব্যাধিতে হঠাৎ মৃত্যু হওয়া বিচিত্র নহে।

আমার এই সতর্কীকরণের দরুণ পরিবারস্থ লোকেরা স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ অপর প্রাচীন চিকিৎসক ডাক্তারকে আলোচনা ও পরামর্শের জন্ত কল্ দিলেন। সেই প্রাচীন ডাক্তার আসিয়া রোগীর স্বপ্নদর্শন ও নিদ্দিষ্ট মরণ সম্বন্ধে রোগীর সঙ্গে কৌতুক তামাসা করিলেন। কিন্তু রোগীকে না জানাইয়া পরিবারস্থ লোকদিগকে বলিয়া গেলেন যে রোগীর মস্তিষ্ক আক্রান্ত আছে। অবস্থা খুব ভাল নয়।

তিনি রোগীর অগোচরে গিয়া আরও বলিলেন যে রোগীর শাস্ত্যভাব ও দৃঢ়তা আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক। স্বপ্নের প্রতি এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। সাধারণতঃ লোকে মৃত্যুকে ভয় করে কিন্তু এই রোগী যেন মৃত্যুর জন্ত অত্যন্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত অপেক্ষা করিতেছে। তথাপি অবস্থা দেখিয়া আমি আপনাদিগকে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে আজ রাত্রে মরিবার মত কোন লক্ষণই বর্তমান নাই। ৯টার সময় নিদ্দিষ্ট মৃত্যুর বিষয়টা প্রসঙ্গের মত।”

রোগী আমাকে নিকটে পাইতে অত্যন্ত আগ্রহ করিত। ছপূর বেলা আমি আবার গেলাম। গিয়া দেখি সম্পূর্ণ সুস্থভাবে পাইচারী করিতেছে। কোনরূপ বেদনা বা দুর্বলতা মোটেই নাই।

আমাকে বলিল, “আমি আপনার জন্ত অপেক্ষা করিতে-

ছিলাম। আমার মুমূর্ষুকালীন কর্তব্য কার্য যথারীতি সম্পন্ন করা গিয়াছে। এক্ষণে আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। কিছু খাইতে পারি কি? আপনার সম্মতি ভিন্ন কিছু খাইতে ইচ্ছা করি না।”

জ্বর মোটেই নাই। সম্পূর্ণ সুস্থতার লক্ষণ রহিয়াছে। এ অবস্থায় লঘুপথ্য খাইবার ব্যবস্থা দিলাম। রোগী কি করে তাহা দেখিবার জন্য রাত্রি চটার পর আমি পুনরায় গেলাম। গিয়া দেখি বেশ সুস্থভাবে কথাবার্তা বলিতেছে। ধর্মযাজক মহাশয় বস। হাসি গল্প চলিতেছে। ধর্মযাজক মহাশয় বলিলেন যে রোগীর ঐকান্তিক আগ্রহ থাকায় আমি মৃত্যুকালের করণীয় ধর্ম-ক্রিয়াগুলি করাইয়াছি। ঐ সকল কর্ম পুনঃ পুনঃ করাতেও কোন বাধা নাই। রোগী আজ মরিবে না।

ঐ ঘরে একটা ঘড়ি ছিল। জিয়ান পুনঃ পুনঃ ঐ ঘড়ির দিকে তাকাইতেছিল। যখন ৯টা বাজিবার এক মিনিট বাকী তখন ও হাসিখুসীর কথাবার্তা চলিতেছিল কিন্তু জিয়ান হঠাৎ উঠিয়া নামিল। বলিল, “আর সময় নাই।” খুব ক্ষিপ্ততার সহিত স্ত্রীকে ও ভাই-ভগ্নীকে চুম্বন করিল এবং এক লাফে পুনঃ বিছানায় উঠিয়া বালিসগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন করতঃ “চলিলাম বিদায়, বিদায়” বলিতে বলিতে বালিসে মাথা রাখিয়া চিং হইয়া শুইয়া পড়িল। আর নাড়াচাড়া নাই !!

মৃত্যুর ভান করিয়াছেন মনে করিয়া আমি কাছে গিয়া দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। বাস্তবিকই মৃত্যু। একপা

যন্ত্রণাহীন মৃত্যু আমার জীবনে কোথাও দেখি নাই। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পর্য্যন্ত হইল না !!

সুদীর্ঘ একটা মুচ্ছা যদি হইয়া থাকে এই দুরাশা করিয়া কবর দেওয়াইতে দেৱী করিতে লাগিলাম। অনাবশ্যক দেৱী করিলাম। দেহ কঠিন হইয়া উঠিল এবং পঁচিয়া উঠিবার পূর্ব লক্ষণ হইতে লাগিল। কাজেই শবদেহ সমাধিস্থ করিলাম।

জনপূর্ণ ষ্ট্রীটে আবির্ভাব।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী গ্লাসগো নগরীতে ১৮নং শচীহল ষ্ট্রীটে ৩৫ বৎসর বয়স্ক মিঃ ডেভিড্ ডিক্ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটা তিনি নিজে সুবিখ্যাত মহাত্মা ষ্টেড্ সাহেবের নিকট বলিয়াছিলেন। কথোপকথনটা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

ডিক্ বলিলেন, “আমি একজন মৃত ব্যক্তির আবির্ভাব নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি কিন্তু কিরূপে যে তাহা হইল স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করিয়া আমি তাহার কুল কিনারা পাইতেছি না।”

“ইহা কি কোন জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি না মৃত ব্যক্তির ভূত।”

“মৃত লোকের ভূতই বটে।”

“লোকটা কত কাল পূর্বের মৃত?”

“৬ বৎসর”,

“আপনি ইহাকে কোথায় দেখিয়াছেন?”

“গ্লাসগো নগরে।”

“দিনের বেলার কি রাত্রিতে ?”

“বৈকাল ৩৯ টার সময়। প্রকাশ্য দিবালোকে।”

“আচ্ছা বলুন দেখি কি ভাবটা হইল ?”

“বিকাল ৩৯ টার সময় আমি শচীহল স্ট্রীটের অফিস ঘর হইতে বাহির হইয়া বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে সেন্ট ভিয়েন্ট স্ট্রীটে যাইবার জন্য রওয়ানা হইলাম। শচীহল স্ট্রীট ছাড়াইয়া রেগফিল্ড স্ট্রীটে যাওয়ার সময় ভূতটী আমার সঙ্গে লইল।”

“আপনি বুঝিলেন যে ইহা ভূত ?”

“নিঃসন্দেহ রূপে।”

“কিরূপে বুঝিলেন ?”

“তৎক্ষণাৎ আমি চিনিলাম যে।”

“ইহা কি আপনার সঙ্গে আলাপ করিল ?”

“হাঁ করিল। ইহা আমি আপনাকে বলিতে অক্ষম। বিষয়টা আমার ব্যক্তিগত।”

আপনি উত্তর করিলেন ?”

“হাঁ, আমি হাটিতে লাগিলাম ! ভূত ও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ঠিক যেন একজন জীবিত লোক। রেগফিল্ড স্ট্রীট দিয়া যতক্ষণ হাটিলাম ততক্ষণ উভয়ে একত্রে হাটিতে হাটিতে কথা কহিলাম। তাহাকে দেখিয়া অগ্র লোকে ভূত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ ছিল না। জীবতকালে যেক্রপ পোষাক পরিভেন ঐরূপ পোষাকই পরা ছিল। প্লাসগো নগরীর সম্পূর্ণ জনপূর্ণ স্ট্রীটে আড়াই শত গজ পরিমাণ স্থান

একত্রে চলিয়াছি। ভিন্সেন্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে যাওয়া মাত্রই ভূত
অদৃশ্য হইল। কিরূপে আসিল কিরূপে বা গেল কিছুই দেখিতে
পাইলাম না। হঠাৎ দেখি সে নাই। এই মাত্র।”

“আপনি ভয় পাইলেন না?”

“কিছুমাত্র না।”

“আপনি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন?”

“না, কিছুই না। তিনি যে কথা আরম্ভ করিলেন আমি
তাহাই চালাইলাম মাত্র।”

“তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হওয়াতে আপনি বিচলিত হইলেন কি?”
“কিছুই না। তিনি অজ্ঞাতসারে আমার সঙ্গে মিলিত হইয়া
অজ্ঞাতসারেই চলিয়া গেলেন। মিলাইয়া যাইতে আমি দেখি
নাই। হঠাৎ এইমাত্র দেখিলাম যে তিনি নাই।”

“সেই ভূত আপনার পরিচিত?”

“বিশেষভাবে পরিচিত।”

“ইনি কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?”

“আমার পিতার প্রেতাত্মা।”

“আপনি কি আপনার পিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন?”

“একেবারেই না।”

“যখন তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন
তখন আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কি?”

“মোটাই না।”

“বিষয়টা কি জানিবারও ইচ্ছা হইল?”

“না, ইহা যেন স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হইল। কেবল গম্ভীরা স্থানের চিন্তাই আমার মনে ছিল। বাস্তবিক পরের দিন আমার মনে এই চিন্তা প্রথম আসে যে ৬ বৎসর পূর্বে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এমন মহানগরের জনপূর্ণ ষ্ট্রীটে তিনি উপস্থিত হইয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। বিষয়টা ত অতি আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু ইহা যে ঘটয়াছে তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অনুরূপ ঘটনা আমি জীবনে আর প্রত্যক্ষ করি নাই। কেবল এইমাত্র জানি যে পিতার মৃত্যুর ৬ বৎসর পর আমি রেগফিল্ড ষ্ট্রীটে তাহার সঙ্গে হাটিয়াছি। তিনি কথাবার্তার ভাবে আমাকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে আমি যে বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি তাহা সম্পাদন করা কেবল আমার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। ঘটনা দ্বারা ক্রমশঃ দেখা যাইবে যে আমার গুরুতর পরিশ্রম ও ব্যাকুলতাটা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ নহে। বাস্তবিক কার্যোতে ও তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তিনি আমাকে কোন অনুরোধ ও করেন নাই। কিম্বা কোনরূপ ভরসা বা ভবিষ্যদ্বাণী ও দেন নাই। যদি দিতেন তবে মনে করিতাম ভূতগী ভয়ানক প্রবঞ্চক ও ফাজিল। আমার পিতা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি ও মিতভাষী লোক ছিলেন।”

এই বৃত্তান্তটা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে প্রেতাগ্নির আবির্ভাবের কারণ বিশেষ গুরুতর নহে। তবে পুত্রের সঙ্গে আলাপ করা এবং তাহাকে উপদেশ দেওয়া পিতার পক্ষে বিশেষ আগ্রহের বিষয় হওয়া বিচিত্র নহে।

মৃত পিতার সতর্ক বাণী ।

[ডাক্তার মির্ট্‌ জে সেভেজ্‌ সাহেব তাহার সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় ১৯০২ ইং মাৰ্চ সংখ্যায় নিম্নলিখিত ঘটনাটী প্রচার করিয়াছেন ।]

নিউইয়র্ক মহানগরীর সন্নিকটবর্তী স্থানে ২০ বৎসর পূর্বে এই ঘটনাটী ঘটিয়াছিল । এক যুবক বিদেশে হিডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল । সে ভাব প্রবণ ছেলে ছিল না । দীর্ঘকায়, বলবান্‌ এবং ডনগীর বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল । গণিতশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান এবং তরিত্ত্ব বিজ্ঞান তাহার পাঠ্য ছিল । সে খুব সুস্থ ও সবল দেহে বিদেশ হইতে বাড়ী ফিরিয়াছে । তাহার জননীর গ্রীষ্মকালীন বাস গৃহ আছে । আহারের পর ধূমপান করিতে করিতে বাড়ীর বাহিরে গিয়া বেড়াইবার তাহার অভ্যাস ছিল । একদিন রাত্রিতে সে একরূপে বেড়াইয়া আসিয়া চুপটী করিয়া ঘরের ভিতরে গেল এবং কাহারো সঙ্গে আলাপ না করিয়া বিছানায় শুইল । পরদিন প্রত্যুষে তাহার মায়ের ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্বেই উঠিয়া মায়ের প্রকোষ্ঠে গেল । অত্যন্ত আদরের সহিত মায়ের মুখে হাত বুলাইয়া জাগাইল । জাগাইয়া বলিল, আপনাকে একটী অতি দুঃখের কথা জানাইতে আসিয়াছি । আপনার মনে বল আনিতে হইবে । সাহসের সহিত, ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে হইবে । জননী অবশ্যই ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বাবা তুমি কি বল !” সে বলিল, “মা, আমি যাহা বলিতেছি তাহা প্রকৃতই । আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট ।”

জননী অতিশয় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, এ কি কথা? তুমি এ সব কি বলিতেছ?” তখন সে উত্তর করিল, “গত রাত্রে আহারের পর আমি যখন বেড়াইতে গিয়া-ছিলাম তখন এক প্রেতায়া আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করতঃ জানাইয়া গিয়াছে যে আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট। জননী অবশ্যই অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। তথাপি তাহার মনে হইল বাছার বুঝি কোন পীড়া হইয়াছে। তাই মনে করিয়া তিনি ডাক্তার ডাকাইলেন। এবং ডাক্তারের নিকট সম্পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করিলেন। ডাক্তার খুব ভাল রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন কোন রকম রোগ নাই। বলিলেন, “বিষয় কিছুই নয়। একটা অলীক স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। ইহার প্রতি কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নয়। সাময়িক একটা ঝাঁ ঝাঁ মাত্র। কয়েক দিন পরে ইহার কথা মনে কারয়া আপনারা নিজেই হাসিবেন।

পরদিন প্রভাতে সেই যুবক কিন্তু নিজেকে আর তত সুস্থ মনে করিলেন না। দ্বিতীয়বার ডাক্তার ডাকাইয়া আনা হইল। এবারও ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করতঃ হাসিয়া বলিল, “আপনারা অকারণ ভয় পাইতেছেন।”

তৃতীয় দিন প্রভাতে যুবক অধিকতর অসুস্থতা অনুভব করিল। তৃতীয় বার ডাক্তার ডাকাইয়া আনা হইল। এবার ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার এপেন্ডিসাইটিস্ রোগ হইয়াছে।

অবিলম্বে অস্ত্র চিকিৎসা না করাইলে মৃত্যু অনিবার্য।
যথারীতি অস্ত্রোপাচার করা হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।
তুদিন মধ্যে যুবক প্রাণত্যাগ করিল !!

এই ঘটনার কিছুকাল পরে যুবকের জননী নিউইয়র্ক
মহানগরীতে একজন সাইকিক্ এর নিকট যান। [পরলোকগত
লোকের সঙ্গে দেখা করাইতে ও আলাপ করাইতে সক্ষম ব্যক্তিকে
সাইকিক্ বলে :]

তিনি সাইকিকের নিকট পূর্ব্ব কোন চিঠিপত্র দিয়া বা ঘটনা
জানাঠিয়া বা আলাপ পরিচয় করিয়া যান নাই। হঠাৎ
অপরিচিত ভাবে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাহার ছেলের বিষয়
জানিতে চান। সাইকিক্ তাহার প্রক্রিয়া শেষ করা মাত্রই
প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়া বলিল, “মা আমি আপনার মৃত পুত্র।”
ইহা ছাড়া জননীর নিকট আরও এত সব কথা বলিল যাহা
সাইকিক্ নিজে জানিবার কিছুমাত্র কারণ ও জানিত না ! এই
সব কথাবার্তার পর জননী প্রশ্ন করিলেন।

“সেদিন রাত্রে আহারের পর তুমি বেড়াইতে গেলে, যিনি
আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন, তিনি কে?”
(প্রশ্নটা উদ্দেশ্য করিয়াই এমনভাবে করা হইল যেন তাহাতে
কোন মৃত ব্যক্তির উল্লেখ না থাকে।)

সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “ইনি আমার পিতা।”

প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার পিতা কয়েক বৎসর পূর্ব্বই দেহত্যাগ
করিয়াছিলেন। তাহার মা পরে অল্প ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহিতা

হইয়া তাহার সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। সেখানেই যুবক তাহার মায়ের বাড়ীতে গিয়াছিল।

ঘটনাটি দ্বারা মনে হয় পিতা প্রবল অপত্য স্নেহের বশীভূত হইয়া পুত্রকে অবশ্যস্বাবী মৃত্যু জনিত নিদারুণ ভয় হইতে মুক্ত করার জন্য দেখা দিয়াছিলেন। বর্তমানে এই ধরণের ঘটনাবলীর যে সমস্ত বিবরণ বাহির হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ ঘটনার অভাব নাই।

চুক্তিবাদ্য প্রেতাঙ্গা।

লর্ড ব্রাগ্‌হামের প্রদত্ত বিবরণ।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ লর্ড ব্রাগ্‌হাম স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। একদিন রাত্রি ১টা বাজিবার সময় আমি সুইডেন দেশে এক হোটেলে উপস্থিত হই। রাত্রি ১টা বলিলে আমরা মধ্যরাত্র অতীত হইয়া যাওয়া বুঝি; কারণ আমাদের দেশে তাহাই হয়। কিন্তু সুইডেন দেশে তখন রাত্রি বেশী নয়।]

হোটেলটি বেশ ভাল। দুইখানা ঘরও পাওয়া গেল। রাত্রিটা সেখানেই থাকা স্থির করিলাম। শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। গরম জলে স্নান করিয়া ঘরে যাইব বলিয়া স্নানাগারে গেলাম। পোষাক পরিচ্ছদগুলি একটা চেয়ারের উপর রাখিয়া গরম জলের টবে গিয়া বসিলাম। গরমটাতে বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল যে ইহার আগাগোড়া বৃত্তান্ত না বলিলে বিষয়টা বুঝা যাইবে না। তাই বলিতে হইল :—আমি স্কুলের পড়া

শেষ করিয়া যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি তখন জি নামক আমার এক সহপাঠির সহিত অত্যন্ত বন্ধুতা হয়। আমরা দুই বন্ধুই পরলোকের তত্ত্ব জানিতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলাম। তখন অদূরদর্শিতা বশতঃই হটুক আর বাহাই হটুক দুইজনে পরামর্শ করিয়া নিজ শরীরের রক্তদ্বারা এইরূপ চুক্তিপত্র লিখি যে আমাদের মধ্যে যে পূর্বের মরি সেই মৃত্যুর পরক্ষণে অপরকে দেখা দিব এবং তদ্বারা মৃত্যুর পরও যে মানুষের অস্তিত্ব থাকে তাহা সপ্রমাণ করিব।

পরে জি ভারতবর্ষে চলিয়া গেল। বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল। সে আছে কিনা তাহারই খবর রাখি না। এই ত অবস্থা! আমি গরম জলের টবে বসিয়া আরামের সহিত এদিকে ওদিকে চাহিতেছি হঠাৎ দেখি ঐ চেয়ারের উপরে (যে চেয়ারে পোষাক রাখা হইয়াছে।) জি বসি, দেখিয়া আমার কি অবস্থা হইল তাহা কি আর বলিব! আমি কখন যে টব হইতে উঠিলাম তাহা বলিতে পারি না। পরে হৃৎ হওয়ার পর দেখি মেঝেতে পড়িয়া আছি। চেয়ারে জি, নাই!! সে ১৯শে ডিসেম্বরের ঘটনা। আমি তারিখ শুদ্ধ নোট করিয়া রাখিয়াছি। সেই তারিখ আমি আজ পর্য্যন্তও ভুলিতে পারি নাই।

পরে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে ঠিক সেই ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে জি, ভারতবর্ষে দেহত্যাগ করিয়াছে!!

হারাণ ধন বাহির করিয়া দেওয়ার জন্ত

প্রেতাত্মার আগমন ।

নিম্নলিখিত ঘটনাটী একটী সরল সাধু ও সত্যবাদী স্ত্রীলোক ১৮৯৯ ইং ৩১শে মে তারিখে বলিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন :—

হঠাৎ মাথায় রক্ত সঞ্চার হইয়া মস্তিষ্কের বিকারে আমাদের পিতার মৃত্যু হয়। আজ তাঁহার মৃত্যুর তৃতীয় দিবস। আমাদের পরিবারে এই নিয়ম ছিল যে টাকা পয়সা লেনা দেনার সমস্ত কাজ কারবার পিতা মহাশয় নিজেই করিতেন এবং তহবিল তাঁহার নিকটই থাকিত। তাঁহার আবার একটা অভ্যাস ছিল যে টাকা পয়সার তহবিল তিনি অস্বাভাবিক রকমের গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিতেন। আমাদের তাহা জানা থাকিত না। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের পর সাংসারিক ব্যাপারের জন্ত মার টাকার প্রয়োজন হইল। জানা ছিল যে সঞ্চিত অর্থ আছে কিন্তু তাহা কোথায় রাখা হইয়াছে তাহা আমাদের কাহারো জানা ছিল না। মা, আমি এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে তন্ন তন্ন করিয়া তালাস করিলাম কিন্তু তহবিলের খোঁজ পাইলাম না। সকলে নিতান্ত নিরাশ হইলাম এবং কি যে উপায় হইবে তাহার কোন পন্থা ঠিক পাইলাম না।

পরদিন রাতে ১১টার অল্প পরে আমরা সকলেই বিছানায় শায়িত আছি। আমার ঘুম আসে নাই এ অবস্থায় খড়ের কুঁজির ধার দিয়া পদশব্দ গুনিতে পাইলাম। আমাদের দরজার

বারে আসিয়া শব্দ থামিল। তখন পিতা মহাশয়ের গলার স্বর শুনিলাম। তিনি আমার ডাকিয়া বলিতেছেন, “বেপ্টিষ্টাইন! বেপ্টিষ্টাইন—বেপ্টিষ্টাইন!”

তখন আমার কি আবার হইল তাহা বলা অপেক্ষা বুঝা সহজ। আমি যেন ভয়ে অন্ধমুত। আমার খুড়াত ভগ্নিটী সঙ্গে শুইয়াছিল। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে টেলিলাম কিন্তু জাগাইতে পারিলাম না। সে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তখন আমি অত্যন্ত সাহস করিয়া বলিলাম, “বাবা”। তখন সেই কণ্ঠস্বর পুনরায় শুনিলাম বলিতেছেন, “বেপ্টিষ্টাইন, মা; আমার কথা শোন। তোমরা টাকা পয়সাগুলি খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছ। যাহা হউক পাকের ঘরের পেছন দিকে যে একটা কোঠা আছে তাহাতে একটা পুরাতন কাঠের বাস আছে। ঐ বাসে প্যাক করিয়া বহুপূর্বের কমলা আনা হইয়াছিল। বাসটির ভিতরে অনেকগুলি খোপ আছে। ইহার এক পার্শ্বে নানা প্রকারের শক্তী গ্লাক্‌ডার পুটলীতে বাধা রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে দেখিবে কতগুলি পুরাতন গ্লাক্‌ডা। ঐ সকল গুলির নীচে টাকা পয়সা যাহা কিছু রাখিয়াছিলাম, তালাস করিয়া লইও, মা। এখন আসি।

বলা বাহুল্য যে ইহা শুনিয়া আমি মাকে এবং অন্যান্য সকলকে জাগাইলাম এবং বৃত্তান্ত বলিলে পর সকলে একত্র হইয়া ঐ বাস তালাস করিয়া দেখি ঠিক কথিত স্থানে তহবিল রহিয়াছে।

এম, ফ্লেমারিয়ন সাহেব চিঠিতে এই বৃত্তান্ত জানিয়া তদন্তের জন্ত সেই গ্রামে তাহার এক বন্ধুর নিকট চিঠি লিখিয়া নিম্নলিখিতরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন :—

“আপনার অনুরোধ অনুসারে তদন্ত করিয়া অত্যন্ত আফ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আজ সকালে ইউজিন আরডুইনএর বাগান বাড়ীতে যাইয়া তাহার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে ও তাহার কন্যা বেপ্টেট্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। বেপ্টেট্টাইন তখন আমই দানা কুড়াইতেছিল।

আপনার নিকট ঘটনা সংক্রান্ত যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহার মুসাবিদা খানা বেপ্টেট্টাইনকে পড়িয়া শুনাইয়াছি। সে উত্তর করিল, ‘ঘটনা ঠিক এই রূপই বটে।’

আমি তাহাকে বলিলাম, “আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘটনার বৃত্তান্ত যাহা আপনার মনে আছে নিজ হাতে তাহার একটা বিবরণ লিখিয়া দিন।” সে হাসিয়া উত্তর করিল যে তাহার দ্বারা ইহা হওয়া অসম্ভব। যে হেতু সে কখনো লেখা পড়া জানে না।

তখন আমি তাহাকে ঘটনাটী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম এবং সে অত্যন্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিকতার সহিত উত্তর দিতে লাগিল।

প্রশ্ন :—“আপনি কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে তখন আপনার ঘুম ছিল না?”

“আমার তখন ঘুম আসে নাই। এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।”

“সেই তহবিলে কি পরিমাণ অর্থ ছিল ?”

‘পনের শত ফ্রেঙ্ক ! ঐ ঘুণে খাওয়া পুরাতন বাস্‌ট্রা যেন এখনো দেখিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে।’

“ইহা কি হইতে পারে না যে টাকাগুলির জন্য নিতান্ত ব্যাকুল থাকায় আপনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিতে পারেন।”

“না না। আমি সকলের ছোট। টাকার জন্য এত বাস্তবতা আমার ছিল না। আর তাহা হইলে লুক্কায়িত অর্থ কোথায় তাহার খোঁজ পাইব কেমন করিয়া ?”

— — —

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য মৃতের আগমন।

অধিকাংশ স্থলেই উৎকট আকাজক্ষা মৃত ব্যক্তি দিগকে ইহলোকে টানিয়া আনে। সেই আকাজক্ষাগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে কতকগুলি মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিক। আর কতকগুলি ব্যক্তিগত ধারণা হইতে উৎপন্ন। অপরের মনে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হিন্দুর ধারণা থাকে যে তাহার শব দাহ না হইলে সদগতি হয় না। কাজেই শাস্ত্রমতে তাহার শব দাহ হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা হয়। না হইলে কোন কোন স্থলে প্রতিকারের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। মুসলমানের আবার তাহা হয় না। কারণ দাহ করার ধারণা বা সংস্কার তাহাদের থাকে না। তাহারা আবার যথা নিয়মে কবরস্থ করার জন্য ব্যাকুল হয়। এইরূপ অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারের জন্যও মৃত ব্যক্তির দেখা দেওয়া কিম্বা কথাবার্তা বলার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

আবার সাম্ভারিক কাজের বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য কিম্বা আত্মীয়স্বজনের সহায়তা করার জন্যও অনেক স্থলে মৃতের আগমন হয়। এই সব ব্যাপার প্রকৃত। ভাবপ্রবণ লোকের প্রলাপ উক্তি নহে।

কাপ্তান ব্লুমবার্গ্ ।

কাপ্তান ব্লুমবার্গ্ মার্টিনিক দ্বীপে যুদ্ধ পরিচালনা করা উপলক্ষে হঠাৎ নিহত হন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় শিবিরের নিকটে ছিলেন না। কার্যাবাপদেশে খানিকটা দূরে যাইতে হইয়াছিল। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শিবিরে তাঁহার প্রকোষ্ঠে দুইজন সাহায্যকারী কর্মচারী থাকিতেন। মৃত্যুর পর তিনি ঐ কর্মচারীদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার পুত্রের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। তাঁহার পুত্র লগুনে ছিল। সেখানে যাইতে বলেন এবং সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য একখানি অত্যাবশ্যকীয় দলীল কোন্ আলমারীর কোন ড্রয়ারে আছে তাহার ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া যান। তদনুসারে লগুনে যাইয়া প্রদত্ত ঠিকানামতে তাঁহার পুত্রকেও পাওয়া যায় এবং দলিলও পাওয়া যায়। এই ঘটনা সহরময় রাষ্ট্র হয়, এবং রাণী চালোঁগীর কর্ণগোচর হয়। রাণী তাহাতে নিতান্ত উৎসাহিতা হইয়া ছেলেটিকে নিয়া রাজ-তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঐ ছেলে একজন উচ্চদরের ধর্মযাজক হইয়াছিল।

মানুষ সাধারণতঃ নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া এবং নিজ নিজ ক্ষুদ্র সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি, আচার ব্যবহারাদি লইয়া এতই মাতোয়ারা থাকে এবং তাহাদের অজ্ঞতার পরিমাণ সাধারণতঃ এতই অধিক যে আসমুদ্র-গিরি-কানন সারা পৃথিবীটা সম্বন্ধে ভাবিবার অবসরই পায় না। জগদীশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে

অভিনিবেশ করা ত দূরের কথা। কাজেই দেহটাকে মানুষ মনে করে। দেহ গেলেই সব গেল এই স্থূল সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত হইতেই আবার মৃতের আগমন অসম্ভব মনে করিয়া উপরিউক্ত ঘটনাটির ত্রায় লক্ষ লক্ষ সত্য ঘটনাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

আগে বিচার করিয়া পরে যদি সিদ্ধান্ত করে তবে বিচারও ঠিক হইতে পারে এবং সিদ্ধান্তও সঙ্গত হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু লোকে সচরাচর আগেই সিদ্ধান্ত করে, মাত্র ভুল ধারণা সম্বল করিয়া। পরে বিচার করিবার জন্য যুক্তির অন্বেষণ করে। কাজেই যুক্তিগুলি বলবান হয় না। অনেক স্থলেই অসঙ্গত হয়। উপরিউক্ত ঘটনাটী সম্বন্ধে কেহ হয় ত বলিবেন যে শিশু সন্তানকে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া শত শত লোকই ইহধাম পরিত্যাগ করিতেছে। উপযুক্ত তত্ত্বাবধান না হওয়ায় কত নাবালক শিশুর মূলাবান স্থাবর সম্পত্তি শঠ লোকে আত্মস্বাৎ করিতেছে। কোথাও কোন মৃত ব্যক্তি আসিয়া তাহার প্রতীকার করিতে ত দেখা যায় না।

এখন কথা হইতেছে যে চন্দ্র ও সূর্যাগ্রহণ সর্বদা হয় না বলিয়া কি যখন যখন হয় তাহাও অবিশ্বাস করা চলে? যে সব ঘটনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় ঐ গুলিই আমাদের বিবেচ্য। আর যাহা হয় নাই তাহার চিন্তা করিয়া ফল কি? বিশেষতঃ আমরা যতগুলি মৃতের আগমন সংক্রান্ত ঘটনা জানিতে পারি তাহার শতগুণ কি সহস্র গুণ ঘটনা সংঘটিত হইয়া অজানিতভাবে

বিলুপ্ত হয় না কি? এই পৃথিবীতে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা অহরহ ঘটতেছে বলিয়া খবর পাওয়া বিশেষ কঠিন নহে। একটু অনুসন্ধান করিলেই বহুতর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু খবর কে রাখে?

আর একটী কথা এই যে যত স্থলে মৃত ব্যক্তি তাহার পরিত্যক্ত সংসারের তত্ত্বাবধান করে ঐ সর্বত্রই যে মূর্তিমান হইয়া দেখা দেওয়ার আবশ্যক হয় বা দেখা দেয় তাহা ঠিক নহে। অনেক স্থলে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির মনোরুতি পরিচালিত করে এবং সেই ভাবেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া দর্শনযোগ্য দেহ অবলম্বনের কোন প্রয়োজন হয় না। অনেকের সেই ক্ষমতাই হয় না।

আবার মৃতদের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এমনও থাকে যাহাদের কিছু করিবার ক্ষমতাই নাই। জীবিত লোকের মধ্যে এমন লোকের অসম্ভাব আছে কি? হয় ত মৃত্যুর পর অজ্ঞান অবস্থাতেই বহু সময় কাটিয়া যাইতেছে। তা ছাড়া বহুতর লোক আবার এরূপও আছেন যাঁহারা পার্থিব বিষয় সম্পত্তিকে নিরানন্দ, অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া তৎপ্রতি কোনরূপ লক্ষ্য করেন না।

বস্তুত হিংসা, দ্বেষ, দর্প, অহঙ্কার, অভিমান প্রভৃতি নিয়া আমরা সচরাচর যেরূপ মনোরুতি সম্পন্ন হইয়া থাকি তাহাতে অনেক সময় জীবিত লোকেই বহু চেষ্টাতেও কোন কোন বিষয় শুনাইতে, দেখাইতে বা বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। আর মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাহা করা যে কত কঠিন তাহা

সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা কম হওয়া ত বিচিত্র নহেই বরং মাঝে মাঝে যে সংঘটিত হইতে পারে তাহাই আশ্চর্য্য। নিঃস্বার্থ, পবিত্র-চিন্তা ও পবিত্র আত্মার লোক আকাক্ষমা করা মাত্রই মৃত পিতা মাতা বা গুরুতর উপদেশ পাইয়া থাকেন। আবশ্যক হইলে দেখাও পান। একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রাম নিবাসী বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ডাক্তার একজন মহান্নভব নিঃস্বার্থ ও উদার প্রকৃতির ধ্যান্মিক লোক ছিলেন। অতি অল্পদিন হইল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ এখনো অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেই গ্রামে গেলে খবর পাওয়ার খুবই সুবিধা আছে। তিনি একজন বড়দের চিকিৎসক ছিলেন। কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলেই তিনি পিতার সমাধি মন্দিরে যাইতেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ পাইতেন। তাঁহার পিতা আনন্দচন্দ্র নন্দী (আনন্দ স্বামী) একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু তারাকিশোর চৌধুরী (বর্তমানে সন্তদাস কাঠিয়া) সশরীরে বর্তমানই আছেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেই অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার গুরুদেব রামদাস কাঠিয়া বাবা লোকান্তারিত হইয়াও তাঁহার পক্ষে বাঁচিয়াই আছেন। আবশ্যক হইলেই উপদেশ দেন। সময় সময় দেখা ও দেন।

সংস্কারগুলি মানুষের সঙ্গে যায় এবং আবদ্ধ জীব তাহার নিজ কুসংস্কার লইয়া দেহতাগ করিলে পরলোকেও তাহাকে ঐ কুসংস্কারের ফল ভোগ করিতে হয়। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে এমন একটা কুসংস্কার ছিল যে মৃত্যুর পর দেহটিকে বিধি মত সমাধিস্থ বা দাহ না করিলে মৃত ব্যক্তি যতই সং বা সাধু লোক হউক না কেন তাহার সদগতি হইবে না। প্রাচীন গ্রন্থের লিখিত অভিসন্ধি মূলক অতিশয়োক্তি হইতে এইরূপ কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়। দেহ সংস্কার অবশ্য হওয়া উচিত কারণ তাহাতে সদগতির পক্ষে কিছু সুবিধা হইতে পারে এইমাত্র। তা বলিয়া অন্য লোকে সংস্কার করিল কি না করিল তদ্রূপ সাধুলোকের দুর্গতি হইতে পারে না। সঙ্গত কাজগুলি বিধি মতে সুসম্পন্ন করা বিষয়ে অল্প লোককে প্ররোচিত করার জন্য হয়তঃ ভয় দেখাইয়া প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন কোন গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তদ্বারা উপকার যেমন হয় অপকারও কেবল কম হয় না। এইরূপ কোন বন্ধিমূল ধারণা লইয়া মৃত্যু হইলে তদ্রূপ দুর্গতি ভুগিবার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ গ্রীস দেশের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ভূতের বাড়ী।

গ্রীস দেশের রাজধানী এথেন্স নগরীর প্লীনি বংশের একজন সম্রাট ব্যক্তি এই ঘটনাটী প্রচার করিয়াছেন।

এথেন্স নগরীতে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী ভূতের উপদ্রবে বহুদিন

যাবৎ বাবহারের অযোগ্য অবস্থায় ছিল। অবশেষে এথেণ্ডোরাস নামক সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ঐ বাড়ীটী গ্রহণ করেন। প্রথম দিন তিনি স্বয়ং এবং তাহার দুইটী সাহসী ভৃত্য ঐ বাড়ীতে থাকিতে যান। তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন কিন্তু ভয় করিতেন না। বন্ধুভাবে ভূতের উপকার করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই বাড়ীতে গিয়া তিনি নিজে একটা প্রকোষ্ঠে টেবিল, চেয়ার, পুস্তক, দোয়াত, কলম আদি লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত কাজ করিতে লাগিলেন এবং ভৃত্য দুইজনকে অপর এক প্রকোষ্ঠে নির্বিঘ্নে শুইয়া থাকিতে বলিলেন। লেখাপড়াতে মনোযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভূতের চিন্তা হইতে নিজ মনকে সরাইয়া রাখা। কিছুক্ষণ পর্যান্ত নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করিতে পারিলেন। কিন্তু পরেই বাড়ীর বাহিরে শিকল নড়াচড়ার বন্ বন্ শব্দ আরম্ভ হইল। এথেণ্ডোরাস নিজ কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিয়া পূর্ববৎ মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিলেন তাহার সাধনা-লব্ধ শক্তির প্রভাবে ভয় তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। কিন্তু ভূতদ্বয় ভীত হইয়া গেল।

শিকলের শব্দ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাহার কোঠায় প্রবেশ করিল। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, এক শীর্ণকায়, রুম্মদেহ, আলুলায়িত রুম্মকেশ, হাতে পায় ও গলায় শিকলের বন্ধন যুক্ত, আঁকড়া পরিহিত, মনুষ্যাকৃতি এক ভূত হাত দিয়া সঙ্কেত করতঃ তাহাকে ডাকিতেছে। তখন এথেণ্ডোরাস হস্ত নাড়িয়া ঐ ভূতকে অপেক্ষা

করার জন্য সঙ্কেত করিলেন এবং ইতিমধ্যে লিখা শেষ করিলেন।

তখন ঐ ভূত আরও অগ্রসর হইল এবং এথেগোরাসের নিকট আসিয়া আশ্বে আশ্বে শিকলটা তার মাথায় লাগাইল এবং হাত নাড়িয়া সঙ্গে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিল। এথেগো-রাস্ দয়ার্দ্র হইয়া তাহার সঙ্গে রওয়ানা হইলেন। শিকলের ভারে ভূতটির হাটিতে দেবী হইতে লাগিল। দালানের বাহিরে অল্পদূর গিয়াই ভূতটি একটি নির্দিষ্ট স্থান হাতে আচড়াইয়া তাহাকে দেখাইল এবং হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন এথেগোরাস্ কয়েকটি ক্ষুদ্র গাছগাছড়া পাতা আদি আবর্জনা স্থাপন করিয়া ঐ জায়গাটি চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন।

ঐ রাত্রে আর কোন উপদ্রব হইল না। রাত্রি প্রভাতে বাড়ীর মালীককে ডাকাইয়া ঐ স্থানটা খনন করাইবার পরামর্শ দিলেন এবং বাড়ীর মালীক তাহা করাইলেন। কিছুদূর খনন করাইবা মাত্র এক মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গেল তাহার হাত পা ও গলদেশ শিকলে আবদ্ধ! ইহাকে উঠান হইল। শিকল খুলিয়া কঙ্কালটির অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করান হইল। তদবধি সেই বাড়ীতে আর কখনো ভূতের উপদ্রব হয় না !!

এ স্থলে লোকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মৃত্যুর পরও সে নিজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ মনে করিয়া চলৎশক্তি খর্ব্ব অবস্থায় বহুদিন যাবৎ বিপত্তি ভোগ করিতেছিল। শিকল খুলিয়া এবং অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইয়া তাহার

সংস্কার লোপ করা মাত্রেই সে স্বাধীন হইয়া গেল। আর উদ্বেগ করিল না।

অষ্ট্রেলিয়ার রাখাল।

[ডাক্তার লি সাহেবের “অলৌকিক দর্শন” (Glimpses of the supernatural) নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন যে এই বিবরণটি এমন লোকের নিকট পাওয়া গিয়াছে যাহাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখা যায় না।]

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের দুই রাখাল ইংলণ্ড ছাড়িয়া অষ্ট্রেলিয়া দেশে চলিয়া যায় এবং সেখানে গিয়া দুইজনে যৌথভাবে ঘর বাড়ী এবং বহুতর সম্পত্তি অর্জন করে। হঠাৎ একদিন তার মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল না। তাঁহার কিযে হইল কোন খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না। প্রায় ৩ সপ্তাহকাল পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে অপর সরিকটি ঘরে ফিরিয়া আসিতেছিল। পথিপার্শ্বে একটা গভীর বিল। বিলের তীরে একটা গাছ জলের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যাকালীন দিবালোক ক্রমশঃই মলিনভাব ধারণ করিতেছে। সূর্য লালবর্ণ মেঘে পরিবৃত্ত হইয়া মাঠে উৎপন্ন দীর্ঘ ঘাসের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। এমন সময় সেই রাখাল দেখিল যে তাহার সেই সঙ্গীটি বিলের কিনারায় তাহার বাম হাতটি বাম হাটুর উপরে রাখিয়া বিষন্নভাবে বসিয়া আছে। ঠিক জীবন্ত লোকটি। কিছুমাত্র বৈলক্ষ্য্য নাই। রাখাল দেখিবামাত্র কাছে যাইতে

ও কথা কহিতে উদ্যত হইল, কিন্তু চঠাৎ লক্ষ্য করিল যে চেহারা যেন ক্রমশঃ অস্পষ্ট ভাব ধারণ করিতেছে এবং অধিকতর বিষন্ন দেখা যাইতেছে। রাখাল খামিল এবং দূর হইতে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তখনই পুনরায় দেখিতে পাইল যে লোকটী পুনরায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এবং ডান হাত উত্তোলন করিয়া তর্জ্জনী দ্বারা জলাশয়ের ভিতরেই প্রান্তভাগে একটী স্থান দেখাইতেছে। কোন আবর্জনা নাই। ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানের জালের উপরিভাগে তৃণ আদি আবর্জনা আছে। ঐ স্থানটা বুলিয়া পড়া গাছের নীচে অবস্থিত। ছায়ামূর্তি ইচ্ছাক্রমেই ঐ স্থানটী দেখাইল। রাখাল স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কোন কথা বলিল না। তৎপর পুনরায় হস্ত সঞ্চালন ক্রমে তর্জ্জনীদ্বারা ঐ স্থানটী দেখাইয়া ছায়ামূর্তি আকাশে বিলীন হইল।

পরদিন সকালে রাখাল আরও লোকজন লইয়া জলাশয়ের সেই স্থানে নামিল। কাদা মাটি আদি কতক সরাইবার পরই তাহার সঙ্গীর মৃতদেহ পাইল। একটা বৃহদাকার পাথর বাঁধিয়া মৃতদেহকে জলের নীচে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে দেখা গেল ; এবং সেই স্থানে একটা কুঠার পাওয়া গেল এবং তদ্বারাই হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইল। তদন্তে প্রকাশ পাইল যে এই কুঠারটী একটা গুণ্ডা ধরনের লোকের। পরে সেই লোকটাকৈ অপরাধী বলিয়া গ্রেপ্তার করা হইল। সেই গুণ্ডার নিকট মৃত লোকটার কিছু মূল্যবান জিনিষ এবং দলিলপত্র পাওয়া গেল।

অপরাধী বলিয়া তাহার বিচার আরম্ভ হইল এবং বিচারকের
ধমকে সে সরলভাবে অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলিল। ঐ
লোকটার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

জীবিতকালের গুরুতর ত্রুটি বা অপরাধের প্রতিকার
করার উদ্দেশ্যে মৃতের আগমন।

মানুষ জীবিতকালে কোনরূপ অববেচনার কন্ম করিয়া যদি নিজকে অপরাধী মনে করে, এবং প্রতিক্রিয়া দ্বারা যদি সেই অপরাধ খণ্ডন না করিয়া দেহ ত্যাগ করে, তবে তাহার সেই অপরাধের সংস্কার থাকিয়া যায় এবং তদরূপ পরলোকে যাইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত অনুতাপ ভোগ করে এবং প্রতীকারের চেষ্টায় সময় সময় মর জগতে আসিয়া দেখা দেয়। এই শ্রেণীর একটা অতি আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ মহাত্মা লিডবিটার সাহেব তাহার “মৃত্যুর পরপার” (The other side of Death) নামক গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কোন উচ্চ বংশোদ্ভব তাঁহার কোন এক বিশিষ্ট বন্ধু স্বয়ং এই ঘটনার অংশীদার এবং তিনি স্বয়ং ঐ ঘটনা প্রচার করিয়াছেন। এই ঘটনার সত্যতা সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। যিনি ঘটনাটী বলিয়াছেন তাঁহার নাম প্রকাশিত না থাকায় বন্ধু বলিয়াই তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

গুপ্ত স্বীকারোক্তি।

[খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে

রোমান কৈথলিক একটা প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের ধর্মে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে মৃত্যুর পূর্বে ধর্ম-যাজকের নিকট (মহানু বলা যাউতে পারে কিম্বা গয়াধামে যে তীর্থগুরু থাকেন তাহাদের আয়।) অপরাধ স্বীকার করিতে হয়। ধর্মযাজক গোপনে তাহা শুনিয়া ধর্ম্মানুযায়ী প্রতীকার করেন এবং শিষ্টকে ঐ স্বীকৃত পাপের প্রতিকূল ভোগিবার দায়ী হইতে অব্যাহতি দেন। ধর্ম্মযাজক ঐ সকল স্বীকারোক্তি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। প্রকাশ করাটা তাহার পক্ষে মহাপাপ। প্রকাশ করিতে বাধ্যও নহেন। অনেক সাম্প্রতিক অপরাধের কথা মৃত্যুর পূর্বে এইরূপে স্বীকার করেন। এবং তদ্বারাই তাহারা ঐ সকল অপরাধের দায়ী হইতে মুক্ত হন বলিয়া বিশ্বাস করেন।]

ইংলণ্ডের কোনও ভদ্রপল্লীর এক বাড়ীতে বন্ধুটির নিমন্ত্রণ ছিল। ঘটনাক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তিনি ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হন। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখেন যে অভ্যর্থনা করার জন্য গৃহকর্ত্তী তখনও বৈঠকখানায় নামিয়া আসেন নাই। বৈঠকখানায় একটা ফরাসি বিছানাতে একজন রোমান কৈথলিক ধর্ম্মযাজক বসিয়া একাগ্র মনে একটা বৃহৎ পুস্তক পাঠ করিতেছেন তিনি বন্ধুটির সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুস্থ ও সবল দেহ। কর্ম্মক্ষম বুদ্ধিমান লোক বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু ভাবে বোধ হইল কোন বিষয়ে তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির। বন্ধুটি ঘরে প্রবেশ করিলে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন এবং ভদ্রভাবে অভিবাদন

জানাইয়া পুনরায় পুস্তকটির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি কোথাকার কে এবং কি সূত্রে এখানে, নিমন্ত্রিত বন্ধুটি চিন্তা করিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

অল্প সময় মধ্যেই নিমন্ত্রিত লোকেরা ক্রমশঃ আসিতে লাগিলেন এবং গৃহকর্ত্রী অভ্যর্থনা করার জন্ত নামিয়া আসিলেন। তিনি যথা সময়ে আসিতে পারেন নাই এবং সকলকে অভ্যর্থনা করা হয় নাই বলিয়া ক্রটি স্বীকারোক্তির বর্ণনা হইতে লাগিল এবং এই সকল আলাপে নিযুক্ত থাকায়, ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করার বিষয়টা আমাদের বন্ধুটি ঐ সময়ের জন্ত ভুলিয়া গেলেন।

পরে বন্ধুটি যখন আহ্বারের টেবিলে গৃহকর্ত্রীর সামনে বসিয়াছিলেন তখন ঐ কথা তাহার হঠাৎ মনে হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

“ভাল কথা, বৈঠকখানায় যে একজন রোমান কথলিক ধর্ম্মযাজক বসিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ত আপনি আমার পরিচয় করাইয়া দেন নাই?” তৎপর টেবিলটির সব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “তিনি ত এখানে আহ্বারেও আসেন নাই দেখা যাইতেছে।” এই কথা শুনিয়া গৃহকর্ত্রী কিছু ত্রস্ত হইয়া গেলেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি? আপনি কি প্রকৃতই ইহাকে তখন দেখিয়াছেন?”

বন্ধুটি উত্তর করিলেন, “দেখিয়াছি নিশ্চয় কিন্তু আমি ত

এতটা ভাবি নাই। আপনাকে কোনরূপ বিরক্ত করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমার আশঙ্কা হইতেছে কি জানি আপনাদের বিরক্তিকর কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ফেলিলাম। লোকটিকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জানার জন্য কোতুহল জন্মিল। তাই কথাটা উত্থাপন করিয়াছিলাম। তাহার উপস্থিতিটা গোপন করার যদি আপনার কোন উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আমি দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবে না।”

গৃহকর্ত্রী আরও চুপি চুপি বলিলেন, “না না কর্ত্তা, আপনি আমার কথা সর্ব্বতোভাবে বিপরীত বুঝিয়াছেন। [কর্ত্তা শব্দ সম্মানার্থে বলা হইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মণকে বলা হয়।] গোপন করার কিছুই নাই। কথাটা মাত্র এই যে আমার পতি মহাশয় এই কথাটার উল্লেখ ভালবাসেন না। আপনিও তাহাকে যে দেখিয়াছেন এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এযাবত আমাদের পরিবারের লোক ভিন্ন অন্য কেহ ইহাকে দেখিতে পায় নাই। ইহা কোন জীবিত মনুষ্য নহে। একটি অলৌকিক ছায়ামূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।”

বন্ধুটী স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, “ছায়ামূর্ত্তি?” গৃহকর্ত্রী বলিলেন, “হাঁ, ইহা যে অলৌকিক কিছু এ বিষয়ে সন্দেহ করা অসম্ভব। আমরা দুই বৎসর যাবৎ এই বাড়ীতে আছি। এই সময়ের মধ্যে আমি ও আমার পতি অস্তুতঃ দ্বাদশবার তাহাকে দেখিয়াছি। এমন সব অবস্থাদ্বীনে দেখিয়াছি যে ঐ দেখার মধ্যে কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি থাকার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমরা

ইহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে না পারায় এবং একরূপ ঘটিবার পাখিব কোন হেতু দেখিতে না পাওয়ায় এ বিষয়ে কাহারো নিকট কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যখন দেখিয়াছেন তখন আপনাকে বলি, আপনি দয়া করিয়া আমাদের একটা উপকার করিবেন কি ?”

বন্ধুটি উত্তর করিলেন, “আমার সাধের ভিতরে যদি হয় তবে নিশ্চয়ই করিব !”

গৃহকর্ত্রী বলিলেন, “আমরা মনে মনে ভাবি এমন সাহসী লোক যদি একজন পাইতাম যিনি ইহার সঙ্গে কথা বলিতে সমর্থ, তাহা হইলে বোধ হয় ইহার উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিতাম। আপনি কি দয়া করিয়া পুনরায় বৈঠকখানায় যাইয়া ধর্মবাজকটী এখানে সেখানে আছেন কিনা দেখিবেন ? যদি থাকেন তবে তিনি যেন এখানে আর না আসেন একথা বলিয়া আসিতে পারিবেন কি ?”

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বন্ধুটি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এতক্ষণ গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুটির চুপি চুপি কথা হইতেছিল। কি কথা হইতেছিল তাহা অণু কেহ লক্ষ্য করে নাই। কথাটা অন্তে না জানিবার উদ্দেশ্যে এখন বন্ধুটি প্রকাশ্যভাবে গৃহকর্ত্রীকে বলিলেন, “আপনার সম্মতি পাইলে অল্পসময়ের জন্ত আমি একবার বাহিরে যাইতে পারি। আমার একটু আবশ্যক আছে।” এই কথা বলিয়া বন্ধুটি চলিলেন। চাকরটী সঙ্গে

যাইতে উত্তত হওয়ায় হাতে ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে এখানেই থাকিতে বলিয়া গেলেন।

বন্ধুটি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেই ছায়ামূর্তি পূর্বের ন্যায় বহিষ্কার প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছেন। এইবারের দর্শনে তাহার মন অত্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল। তথাপি সাহসে বুক বাঁধিয়া ঐ মূর্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্বের ন্যায় এবারও সেই মূর্তি ভদ্রভাবে মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে অভিবাদন জানাইল কিন্তু এবার পুনরায় পুস্তকের দিকে না ফিরিয়া বন্ধুটির মুখের দিকে উদ্বিগ্নতার সহিত চাহিয়া রহিল। বন্ধুটি একটু থামিয়া পরে খুব গন্তীরভাবে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দোহাই জগদীশ্বরের, আপনি কে, এবং কি চান বলুন।” ছায়ামূর্তি পুস্তক বন্ধ করিয়া প্রান্ত্রোথান করিল। বন্ধুটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করতঃ পরিষ্কার মৃদুস্বরে স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিল।

“আমি আর কখনো এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হই নাই। আমি কে এবং কি চাই তাহা আপনাকে বলিব।.....দেখিতেছেন আমি একজন রোমান কেথলিক ধর্মযাজক। এই যে বাড়ীতে আমরা এখন দাঁড়াইয়া আছি, ৮০ বৎসর পূর্বে এই বাড়ী আমারই ছিল। আমি একজন সুদক্ষ অস্থারোগী ছিলাম এবং শীকারে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। সুযোগ সুবিধা পাইলেই শীকারে যাইতাম। একদিন অগাণ্ণ শীকারীদের সঙ্গে শীকারে যাওয়া সাব্যস্ত ছিল এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া

শীকারীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। তদনুসারে আমি রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে উচ্চবংশ সম্ভ্রূতা এক যুবতী তাহার পাপ স্বীকার করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সে এমন সব কথা বলিল যাহা প্রকাশ হইয়া গেলে ইংলণ্ডের একটা সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবারে ছরপানৈয় কলঙ্কের কালীমা পতিত হয়। কাজেই সে কথাটা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। স্বীকারোক্তির বিষয়টা এত জটিল ছিল যে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে গভীর চিন্তা ভাবনা দরকার। আমার তখন শীকারে যাওয়ার উৎকর্ষাবশতঃ আমি তাহা না করিয়া আপাততঃ যুবতীকে বিদায় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার স্বীকারোক্তিটা একটা কাগজে নোট করিয়া রাখি এবং তাহাকে বিদায় করিয়া দেই। উদ্দেশ্য ছিল যে শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবসর মতে তাহার এই পাপ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া প্রতিবিধান করিব ! এইরূপ নোট করার বিধান আমাদের শাস্ত্রে নাই। পক্ষান্তরে ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। করিলে পাপী হইতে হয়। তাড়াতাড়ির দরুণই এই কুকর্ম্মটা করিয়াছিলাম। এই নোট খানা যে একটা সর্ব্বনেশে অস্ত্র এবং অস্ত্রের হাতে ইহা পড়িলে যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে এ বিষয়ে আমার হুস ছিল। এই জন্তই অত্যন্ত গুপ্ত স্থানেই ইহা রাখিয়া গিয়াছিলাম। এই দালানেরই একটা দেওয়ালের এক অংশে কয়েকখানা ইট খোলা ছিল। নোটখানা একটা পুস্তকের পাতার ভিতরে রাখিয়া দেওয়ালের খোলা ইট কয়খানা বাহির করতঃ ঐ ছিদ্রের ভিতর

নোটসহ বইখানা প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রবেশ পথটা পুনরায় ইট দ্বারা বন্ধ করিয়া শীকারে গিয়াছিলাম। দেওয়ালের যে স্থানে ঐ বইখানা রাখিয়াছি তাহা দেখাইব। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সেই দিন সেই শীকার উপলক্ষে ঘোড়া হইতে পড়িয়া আমি তৎক্ষণাৎ মারা যাই। সেই দিন হইতে আমি ঐ নোটটী অন্তর হাতে পড়িয়া সর্বনাশ না হয় সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া এখানে আসিয়া ঘুরা ফেরা করি। কিরূপে যে ইহার প্রতীকার করিব তাহার কোন উপায় দেখি না। এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছি। এ পর্য্যন্ত কেহ আমার সঙ্গে সাহস করিয়া কথাটী পর্য্যন্ত বলে নাই। এ বিষয়ে কে যে আমার সহায় হইবে তাহা চিন্তা করিয়া পাই না। আজ আপনি আমাকে রক্ষা করিবেন কি না বলুন। এ জগতে আপনার যাহা যাহা প্রিয় আছে ঐ সকলের নামে শপথ করিয়া বলুন যে আমি স্থানটী দেখাইয়া দিলে আপনি ঐ নোটসহ বইটি খুলিয়া আনিয়া ঐ নোটের একটী অক্ষর পর্য্যন্ত নিজে না দেখিয়া এবং জগতে কাহাকেও না দেখাইয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। আপনি কি আমাকে ধর্ম্মতঃ এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?

আমাদের বন্ধুটী ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,

“আপনার কথিত আকাজক্ষা বর্ণে বর্ণে পূরণ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এতক্ষণ ছায়ামূর্ত্তি অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত উদ্ভিন্ন চিত্তে

আমাদের বন্ধুটির দিকে একাগ্র মনে নিরীক্ষণ করিতেছিল। এখন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল এবং বলিল, “তবে আসুন আমার সঙ্গে।”

ভয়ব্যাকুলিত অথচ কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে বন্ধুটি ছায়ামূর্তির অনুসরণ করতঃ প্রথমতঃ প্রশস্ত সিড়ি দিয়া নামিলেন। তৎপর একটু সরু রাস্তা দিয়া অল্প কতটুকু স্থান গিয়াই ছায়ামূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল এবং বন্ধুটির দিকে তাকাইল।

ছায়ামূর্তি তখন দেওয়ালের এক স্থানে হাত স্থাপন করিয়া বলিল, “এই সেই স্থান। এখানকার আস্তর খুলিয়া ইট সরাইলেই আমার কথিত ছিদ্রটি দেখিতে পাইবেন। স্থানটি ভাল রকম লক্ষ্য করিয়া দেখুন এবং আপনার প্রতিশ্রুতি মনে রাখুন।”

ছায়ামূর্তির নির্দেশ মতে আমাদের বন্ধুটি দেওয়ালের সেই স্থানটি বিশেষরূপে লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন। তৎপর ছায়ামূর্তিকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করার জন্ত ফিরিয়া দেখিলেন মূর্তি অন্তহিত !!

অত্যন্ত ভয়ব্যাকুলিত ও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তিনি সেই জনশূন্য স্থান হইতে দ্রুত পদে ফিরিলেন। এবং এক নিশ্বাসে সিড়ি অতিক্রম করিয়া গৃহকর্ত্রীর ভোজনাগারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে তাহার বিলম্ব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই বন্ধুটির সম্বন্ধে বলাবলি আরম্ভ করিয়াছিল। এখন ব্যস্ততার

সহিত উপস্থিত হওয়ায় তাহার দিকে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলিতে পারিলেন না। গৃহকর্ত্রীর আগ্রহবাজক কথাবার্ত্তায় বিষয়টা যে কি তাহা জানিবার জন্ম সকলেরই কৌতুহল হইল। গৃহকর্ত্রী খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া কি জন্ম তিনি বন্ধুটিকে পাঠাইয়াছিলেন তাহা বলিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কৌতুহলটি সকলেরই আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর বন্ধুটি প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইল। কিন্তু তথাপি তাহার মানসিক উত্তেজনা প্রবল ছিল। অপর দিকে সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কৌতুহলাতিশয়া বশতঃ ঘটনাটি সর্ব্বসমক্ষেই বলিতে হইল। গোপন রাখার কোন উপায়ই রহিল না।

একজন উচ্চ শ্রেণীর বক্তা বলিয়া বন্ধুটির পূর্ব্বাবধিই খ্যাতি ছিল। কিন্তু উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ একাগ্রমনে ঐ বিবরণ শুনিল জীবনে কখনো তাহার বক্তৃতা এত মনোযোগের সহিত কেহ শোনে নাই। উপস্থিত জনমণ্ডলী মন্থমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের প্রায় শ্বাস রোধ হওয়ার অবস্থা!

কথাটি শেষ হইতে না হইতে সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, “এখনই রাজমন্ত্রী আনা হউক এবং দেওয়াল খুঁড়িয়া সেই অলৌকিক বাণীর সত্যতা অবধারণ করা হউক।

রাজমন্ত্রীর জন্ম লোক পাঠান হইল। কতক্ষণ পরেই

রাজমিস্ত্রী আসিল এবং অল্প জোৎস্নার স্তিমিতালোকে রাজমিস্ত্রী সহ উপস্থিত সম্পূর্ণ জনতা বন্ধুটির অনুসরণ করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। দেওয়াল ভাঙ্গিয়া কথিত বই ও নোট পাওয়া যায় কি না এই চিন্তায় সকলেই উদ্গ্রীব। বিষ্ময়ে ও সন্দেহে আকুল হইয়া সকলেরই উৎকণ্ঠা প্রায় সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে।

বন্ধুটি অঙ্গুলী স্পর্শে দেওয়ালে নির্দেশ করিয়া দিল। রাজমিস্ত্রী কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী ধৈর্য্য হারা হইয়াছে। কেহ বলিলেন, “আস্তরটা ভয়ানক শক্ত বোধ হইতেছে।”

তখন গৃহকর্ত্রী বলিল, “আস্তরটা ভালই ত বাটে। অথচ ইহা নূতন। বৎসর দুই হইল আমাদের পূর্ববর্তী ভাড়াটে এই দালানের জীর্ণ সংস্কার করাইয়া নূতন আস্তর দেওয়াইয়াছে।”

এতক্ষণে মিস্ত্রী আস্তর খুলিয়া দুখানা ইট সরাইয়াছে। রাজমিস্ত্রী বলিল, “দেওয়ালের ভিতর ২ বর্গ ফিট প্রশস্ত এবং ১৮ ইঞ্চি গভীর একটি গর্ত দেখা যাইতেছে।” এ কথা বলা মাত্র উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অত্যধিক উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। গৃহকর্ত্রী আত্মহারা হইয়া সকলের আগে ঐ গর্ত দেখিতে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার হৃৎ হইল এবং ফিরিলেন। বন্ধুটিকে বলিলেন, “আমি মুহূর্ত্ত কালের জন্য আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখানকার প্রাথমিক তদন্ত কার্যের অধিকার এক মাত্র আপনারই আছে।”

নিশ্চয় হইয়া বন্ধুটী সংযতভাবে অগ্রসর হইলেন। গর্তের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়া তাহাতে হাত প্রবেশ করাইয়া একটা রুহদাকার প্রাচীন ধরণের ধূলিসমাচ্ছন্ন বই বাহির করিয়া আনিলেন। দৃষ্টিমাত্রে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে যেন একটা বিস্ফোভ উপস্থিত হইল। কিন্তু কোন শব্দদ্বারা এইস্থানের গভীর নীরবতা ভঙ্গ হইল না। বন্ধুটী অতিশয় শ্রদ্ধা ও সন্মানের সহিত বইটী খুলিয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া একটু লিখা কাগজ পাইলেন। বহুকালের বলিয়া ইহা হৃদে বর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে ত্রস্তভাবে লিখিত কয়েক লাইন টানা লেখা আছে দেখা গেল। বন্ধুটী যখন বুঝিলেন যে তাহার অঘেঘণের বস্তু মিলিয়াছে তখন তাহার দৃষ্টি ইহা হইতে ফিরাইয়া গেল। সমবেত জনমণ্ডলী পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি ইহা লইয়া মিড়ি অতিক্রম করতঃ নিকটবর্তী প্রকোষ্ঠের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমীপবর্তী হইলেন। অভীষ্ট দেবতাকে যেরূপে ভক্তি উপহার দেওয়া হয় ঠিক সেই ভাবে আমাদের বন্ধুটী ঐ লিখিত নোটটী সহ সম্পূর্ণ বহিখানা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। নিষ্কিণ্ত বস্তু নিঃশেষে ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সকলে নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। তৎপর কেহ কেহ যদিও “ধন্য ধন্য কি চমৎকার !” ইত্যাদিরূপ বাক্যদ্বারা নিজ নিজ মানসিক হর্ষভাব প্রকাশ করিল তথাপি অধিকাংশ ব্যক্তিই বিষয়টা দ্বারা এত অভিভূত হইল যে তাহাদের বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। বন্ধুটী মনে করিলেন যে এই ঘটনাতে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা কেহই ইহা

হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা (উপদেশ) এ জীবনে ভুলিতে পারিবে না। তিনি নিজে ত আর ভুলিতে পারিবেনই না। বহু বৎসর পর্য্যন্ত এই বৃত্তান্ত বলিতে হইলেই তাহার ভাবাবেশ হইত এবং বিচলিত হইয়া পড়িতেন। এই ঘটনার পর হইতে আর কখনো সেই ধর্ম্মযাজককে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই বৃত্তান্তটি হইতে আমরা ইহকাল পরকাল উভয়কালের উপযোগী সতুপদেশ প্রাপ্ত হই। যে সব বিষয়ের পরিণাম ঘোরতর বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কা আছে, যে বিপদ ঘটিয়া গেলে প্রতিকারের আর কোন ও উপায়ই থাকে না, ঐরূপ স্থলে ঐ কাজটুকু মুহূর্ত্তকালের জন্তও ফেলিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। কারণ, মুহূর্ত্তপরে কি হইবে তাহা কাহারো জানা নাই।

বৃষ্টাস্তের কথিত ধর্ম্মযাজক মৃগয়া বাসনে আসক্ত হইয়া সাংঘাতিক বিষয়ে অবহেলা করিয়াছিলেন। সংসারে ঐরূপ অবহেলা অনেকেই করেন এবং তজ্জন্ত ভোগেন ও যথেষ্ট। ঐরূপ বিষয় কখনো লিখিয়া রাখা উচিত নহে।

যে কথাটি পরবর্ত্তীকে না জানাইলে ঘোরতর অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ঐ কথাটি পূর্বে জানান উচিত। তবে যদি কোন বাধা থাকে তবে এমন সব লিপি রাখা উচিত যাহা পরবর্ত্তীর হাতে না পড়িয়াই পারে না।

অনেকে টাকা পয়সা এই রকম ভাবে লুকাইয়া রাখে যে ওয়ারিশগণ তাহার কিছুই জানে না। ঐ সব লোক হঠাৎ মরিয়া গেলে ঐ টাকা পয়সাগুলি বৃথা যায়। অন্তরূপ কারণ বশতঃ

মৃত ব্যক্তির এতই অনুশোচনা হয় যে তজ্জন্ম অসম্ভব রকমে যাতনা ভোগ করিয়া লইলেও পুনরায় ওয়ারিশগণকে দেখা দিতে বাধ্য হয়।

সঙ্গীতের নেশাহেতু আবির্ভাব।

ফ্রান্স দেশে এম্ বেক্ নামে একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ১৮৬৫ ইং সনে তিনি একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কালের বাজযন্ত্র (Spinnet) খরিদ করেন। যে দিন যন্ত্রটি খরিদ করেন ঐ রাত্রে স্বপ্নে তিনি দেখিতে পান যে একটি সুন্দর যুবক আসিয়া তাহার নিকট বলিতেছেন যে, ঐ যন্ত্র তাহার ছিল। তাহার প্রভু (তিনি যাহার চাকর ছিলেন) ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় হেনরী যন্ত্রটি তাহাকে দিয়াছিলেন এবং তিনি একটা গঁৎ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। যুবক ঐ গঁৎটি বেক্কে বাজাইয়া শুমাইলেন এবং ইহা যাহাতে বেক্ সাহেবের মনে থাকে তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন বলিয়া বলিলেন।

এম্ বেক্ জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে রাত্রি তখন ২টা। তিনি পুনরায় ঘুমাইলেন কিন্তু আর স্বপ্ন দেখিলেন না।

পরদিন প্রভাতে তিনি জাগ্রত হইয়া দেখেন যে তাহার শিয়রে একটি কাগজ। ঐ কাগজে ঠিক ঐ গঁৎটি লিখা রহিয়াছে। ঐ গঁৎএর লিখাতে অতি প্রাচীন কালের প্রচলিত চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। [তিনশত বৎসর পূর্বে তৃতীয় হেনরী ফ্রান্সের রাজা ছিলেন।] এই সকল চিহ্ন এম্ বেকের জানা ছিল না।

কয়েক সপ্তাহ পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল যে কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিলে আপনা হইতে তাহার লেখা আসিবে। সে মতে তিনি কাগজে পেন্সিল লাগাইয়া রাখিলেন। আপনা হইতে লিখা হইতে লাগিল। লিখার মধ্য এই, “এই পুরাতন যন্ত্রটির অভ্যন্তরে কোন অংশে রাজার স্বহস্ত লিখিত একটি কার্ড পাওয়া যাইবে। ঐ কার্ডে রাজার স্বহস্ত লিখিত একটি কবিতা লিখা আছে। ঐ কবিতাটি ও লিখা হইল।”

এম্ বেক্ অবিলম্বে সেই যন্ত্র আনিয়া খুলিলেন। ঐ যন্ত্রে লিখা রহিয়াছে ১৫৬৪ ইং। যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগ তাল্লাস করিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই একটি কার্ড রহিয়াছে। ঐ কার্ডে একটি কবিতা লিখা। রাজা তৃতীয় হেনরীর নাম দস্তখত ইত্যাদি সবই আছে। এম্ বেক্ এর হস্তদ্বারা যে কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে কার্ডের কবিতা প্রত্যেক শব্দে শব্দে মিলিল না। বটে কিন্তু কবিতার লিখিত বিবরণ অর্থাৎ তাৎপর্যার্থ সম্পূর্ণই মিল হইল।

এই ঘটনাটি তখন পেরিস মহানগরীতে বিশেষভাবে রাষ্ট্র ও আলোচিত হইয়াছিল এবং খবরের কাগজেও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গঁৎটি ছাপানভাবে প্রচারিত হইয়াছিল এবং এখনও তাহা কিনিতে পাওয়া যায়।

বৃত্তান্তটি দ্বারা মনে হয় সঙ্গীত বিদ্যায় প্রেতাঙ্কটির অত্যধিক আগ্রহ ও ঔৎসুক্য থাকাতে সেই ঔৎসুক্য মূলেই মর্ত্যালোকবাসীর

সঙ্গে এইভাবে ভাবের আদান প্রদান করিয়াছিল। যেমন কবি কবির অনুসন্ধান করে, ভাবুক ভাবুকের অনুসন্ধান করে সেইভাৱ হইতেই এই ঘটনার উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়।

ইটালী দেশের বিশেষ সম্ভ্রান্ত মাননীয় সিগ্‌নর জি, কে, বেগনেরো মহাশয়ের নিজের প্রত্যক্ষ করা নিম্নলিখিত ঘটনাটি তিনি স্বহস্তে লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অণু প্রমাণ অনাবশ্যক। তিনি লিখিতেছেন :—

১৮৯৯ ইং সনে আমি জেনোয়া সহরে আমার পিত্রালায়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম। তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর। একদিন প্রাতে ৭ টার সময় আমি গ্রীক ভাষায় লিখিত একখানা পুস্তকের পাতা উন্টাইতেছি এমন সময়ে দ্বার খুলিবার শব্দের শ্রায় একটা শব্দ শুনিলাম। চাহিয়া দেখি একটী যুবতী, তাহার পরণে সেমিজ,—রান্নাঘর হইতে বাহির হইরা আসিল! যুবতীটি ধব্ ধবে সাদা বর্ণ, দীর্ঘাকৃতি এবং সুন্দরী। তাহার গভীর কাল ব্রাউন রঙের কৌকরাণ লম্বা চুলগুলি পেছনের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার দিকে একটু চাহিয়া হঠাৎ হাসির ভাব দেখাইয়া আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেল এবং আমার পিতার কোঠার দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল এবং খট্ খট্ শব্দে কবাট বন্ধ করিল। আমি অবাক্ হইলাম এবং মনে মনে বলিলাম, “আচ্ছা, দেখি লোকটা কে এবং কেন এখানে আসিয়াছে।”

ইহার আন্দাজ ১০ মিনিট পর পিতা মহাশয় বাহির হইয়া

আসিলেন এবং তাহার অভ্যাস মতে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য রান্নাঘরে গেলেন। পিতা মহাশয় বাহির হওয়া মাত্রই আমি দৌড়াইয়া গিয়া ঐ কোঠায় প্রবেশ করিলাম। তন্ন তন্ন করিয়া ঐ কোঠার প্রত্যেক কোনা-খাম্চি পর্য্যন্ত তালাস করিলাম। শেষটায় ড্রয়ারের ভিতর বাস্তুর ভিতর টেবিল চেয়ারের নীচে পর্য্যন্ত তালাস করিলাম কিন্তু কেহ নাই। ঐ কোঠার আর কোন দরজাও নাই। জানালা আছে বটে কিন্তু সে কোঠাটি ৫ তালার উপর অবস্থিত। ঐ জানালা দিয়া বাহির হওয়ার যো ছিল না।

পিতা মহাশয় হাত মুখ ধুইয়া আসিলে তাঁহার নিকট বৃত্তান্তটী বলিলাম। তখন আমরা উভয়ে দৌড়াইয়া সিড়ি দিয়া নামিয়া ঐ বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার সদর দরজা পর্য্যন্ত গেলাম। কিন্তু কাহাকেও পাওয়া গেল না। সদর দরজায় তখন তালা দেওয়া ছিল। পিতা মহাশয় তালা খুলিলেন। দাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে ঐ সময় পর্য্যন্ত দরজা দিয়া কেহ প্রবেশও করে নাই এবং বাহিরও হয় নাই। আমাদের ঐ বাড়ীটির সোজাসোজি অপর বাড়ীতে মান্জিনি নামক একজন আইন ব্যবসায়ী বাস করিতেন। আমরা ঐ বাড়ীতে গিয়া ঐ ভদ্রলোককে বৃত্তান্তটী বলায় তিনি তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। তিনি যুবতীগীর চেহারা আদি বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া বলিলেন যে এক বৎসর পূর্বে এই যুবতী ঐ বাড়ীতে ঐ কোঠায় (যে

কোঠায় পিতা মহাশয় থাকেন) দেহত্যাগ করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে এই যুবতীগীর এইভাবে আবির্ভাব কেবল আমিই যে প্রথম দেখিলাম তাহা নহে। আমরা এই বাড়ীতে আসিবার পূর্বে অপর এক ভাড়াটীয়া সপরিবারে বাস করিতেন। ঐ পরিবারের লোকেরা এই যুবতীটিকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া অবশেষে ভীত হইয়া এই বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে।

সৈন্যধ্যক্ষ মিঃ বার্টারের বৃত্তান্ত।

[এই বৃত্তান্তটি সৈন্যধ্যক্ষ মিঃ বার্টার সাহেব নিজ হস্তে লিখিয়াছেন। পরে তাহার পত্নী লেডি বার্টারকে এবং তাহার সঙ্গীয় কর্মচারী মিঃ ষ্টুয়ার্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই ঘটনার সম্পূর্ণ সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।] ঘটনাটির বিবরণ এইরূপ :—

১৮৫৪ ইং সনে জেনারেল বার্টার সাহেব ৭৫নং সৈন্যদলের সর্ব অল্টাণ ছিলেন। পাঞ্জাবের মুরী নামক স্থানের পার্বত্য ষ্টেশনে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঐ ষ্টেশনে বদলী হইয়া যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে লেপ্টেনেন্ট বি নামক অপর এক সেনাপতির উপর ঐ ষ্টেশনের চার্জ ছিল। জেনারেল বার্টার যে বাড়ীতে থাকিতেন ঐ বাড়ীটি লেপ্টেনেন্ট বি নিজে উত্তোগ করিয়া তাহার নিজ পছন্দমত তৈয়ার করাইয়াছিলেন। সমর বিভাগীয় অফিসের বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে ১৮৫৪ ইং সনের ২রা জানুয়ারী তারিখে লেপ্টেনেন্ট বি, সাহেব পেশোয়ারে দেহত্যাগ করেন। বাড়ীটি এক পাহাড়ের হাতার উপরে

অবস্থিত ছিল। পাহাড়টির মূল শৃঙ্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত একটি বাঁধান রাস্তা আছে। একটি ঘোড়া চলিবার মত রাস্তা,—ঐ রাস্তা হইতে নামিয়া বাটার সাহেবের ঐ বাড়ীর ধার পর্য্যন্ত গিয়াছে। তৎপর ঐ ঘোড়ার রাস্তা হইতে একটা ফুটপাথ বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার অন্য কোন রাস্তা ছিল না। কথিত ঘোড়ার রাস্তাটি কখনো কোন অশ্বারোহী ব্যবহার করে নাই।

একদিন বিকালে জেনারেল বাটারের বন্ধু মিঃ ডিন ও তাহার পত্নী বাটার সাহেবের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এখানে থাকেন। সেই রাত্রে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছিল। খবরের কাগজ পড়া যায় মত পরিষ্কার জ্যোৎস্না। বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী ফিরিয়া যাওয়ার সময় বাটার সাহেব সঙ্গীয় দুইটি কুকুরসহ সিগারেট টানিতে টানিতে কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে গেলেন। ঘোড়ার পথটির নিকটবর্তী হইয়া বাটার সাহেব দাঁড়াইলেন এবং বন্ধু ও বন্ধুপত্নী ঘোড়ার পথটি দিয়া উঠিয়া গেলেন। তাহারা দৃষ্টির অন্তরাল হওয়ার পর সাহেব ফিরিয়া যাওয়ার মনস্থ করিতেছেন, এমন সময় ঘোড়ার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। মনে হইল ঘোড়ার পথটি দিয়া কেহ ঘোড়া চড়িয়া আসিতেছে। তিনি একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন যে ঘোড়ার পথটির মোড় হইতে একটি লোক একটা পনী-ঘোড়ায় চড়িয়া নামিয়া আসিতেছে। তাহার সঙ্গে দুইজন ভারতীয় সহস্। ঐ ঘটনাটী দেখা যাওয়া মাত্র কুকুর দুইটি ভয়াতুরের মত দৌড়াইয়া সাহেবের পায়ের

কাছে আসিয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিল। বাটার সাহেব যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন ঐস্থান হইতে ৮ কি ১০ ফুট উচ্চ ঘোড়ার রাস্তার উপর ঐ অশ্বারোহী ও সইস্‌দ্বয়কে পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। তখন জ্যোৎস্না অতি নিশ্চল। অশ্বারোহীর মাথায় হেট, ভোজনকালের পরিধেয় পোষাক, দীর্ঘকায় ব্যক্তি। একজন সইস্‌ ধরিয়া ধরিয়া ঘোড়াকে নামাইতেছে আর একজন অশ্বারোহীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। [রাস্তা অত্যন্ত খাড়া, উপর দিক হইতে নীচু দিকে নামিতেছে বলিয়া এইরূপ ধরিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।]

নিকটে আর কোন বাড়ী নাই। বাটার সাহেব মনে করিলেন অশ্বারোহী ব্যক্তি যিনিই হউন অবশ্যই তাহার বাড়ীতে যাইবেন। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে ? কি চান ?”

এই কথা শুনিয়া তাহারা থামিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী ছুই হাতে লাগাম একত্র করিয়া ধরিল এবং ফিরিয়া বাটার সাহেবকে চেহারা দেখাইল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে বাটার সাহেব দেখিলেন যে তাহার বিশেষ পরিচিত লেপ্টেনেন্ট বি। তাহাকে অত্যন্ত মলিন দেখা যাইতেছে। মুখশ্রী মৃত ব্যক্তির ন্যায়। বাটার সাহেব পূর্বে তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহা হইতে একটু অধিক মোটা দেখিলেন। পরিধানে একটা নিউগেট ফ্রিজ।

বাটার সবেগে তাহাদের দিকে উঠিতে লাগিলেন। লাফ দিয়া ঘোড়ার পথটিতে উঠিবার সময়ে নূতন মাটি ধসিয়া গিয়া

পদস্বলন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দেখেন
অশ্বারোহী ঘোড়া বা সহিস্ কেহই নাই।

রাস্তাটির দুইপার্শ্বে খাড়া উচ্চ পর্বত। এপাশে ওপাশে
যাওয়ার উপায় নাই। তিনি দৌড়াইয়া ১০০ গজ পরিমিত স্থান
- অগ্রসর হইলেন। কিছু দেখিলেনও না কিছু শুনিলেনও না।
কুকুর দুইটি কিন্তু তাহার সঙ্গে যায় নাই। (সাধারণতঃ ঐ
কুকুরদ্বয় কখনো তাহার সঙ্গে ছাড়িত না।)

পরদিন মিঃ বাটার তাহার বন্ধু ডিনের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে
লেপ্টেনেন্ট বি,র কথা তুলিলেন। ডিন সাহেব বলিলেন যে
মৃত্যুর পূর্বে বি, সাহেব অনেকটা মোটা হইয়াছিলেন এবং
রুগ্ন শয্যাতে ফিঞ্জটা তিনি ছাড়িতেন না।

তারপর মিঃ বাটার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ পন্থী ঘোড়াটা
তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন?” পন্থী ঘোড়াটার বিবরণ ও তিনি
যেমন দেখিয়াছিলেন তেমন বর্ণনা করিলেন।

ডিন সাহেব বলিলেন যে পেশোয়ারে তিনি ঐ ঘোড়াটা
কিনিয়াছিলেন এবং একগোয়ামী করিয়া অসতর্কভাবে ঐ ঘোড়ায়
চড়িয়া উপর দিক হইতে নীচ দিকে নামিবার কালে ঐ ঘোড়াটা
মারা যায়। এই ঘটনার পরও মিঃ বাটার এবং তাহার পত্নী ঐ
বাড়ীতে থাকিতে অনেক সময় ঘোড়ার পদশব্দ শুনিতেন কিন্তু
তাহাদের মনে এই ধারণা বন্ধমূল ছিল যে লেপ্টেনেন্ট
বি, ভিন্ন এই পথ দিয়া আর কখনো কেহ ঘোড়ায়
চলে নাই।

এই ঘটনাটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(১) মিঃ ডিন্ ও তাহার পত্নী এই রাস্তা দিয়া উঠিতে-
ছিলেন অন্য কোন শাখা রাস্তা নাই। তাহারা ঐ অশ্বারোহী
বা সইস্কে দেখে নাই। লেপ্টেনেন্ট বি, ডিনেরও বিশেষ
পরিচিত।

(২) মিঃ বার্টার লেপ্টেনেন্ট বি, কে ভালরূপ চিনিতেন।
কিন্তু এতটা মোটা দেখেন নাই। ঘোড়াটাও তিনি দেখেন নাই
এবং ইহার বিষয় পূর্বে শোনেন ও নাই। পরিধানে ফ্রিঞ্জটা
থাকাও তিনি পূর্বে জানিতেন না।

(৩) মিঃ ডিনের সঙ্গে পরবর্তী আলাপে বুঝা গেল যে
মোটা দেখা বা ফ্রিঞ্জ দেখা কিম্বা ঘোড়াটা দেখা মিঃ বার্টারের
ভুল বা স্বপ্ন হইতে পারে না। কারণ এইগুলি প্রকৃত ছিল।

লেপ্টেনেন্ট বি, মৃত্যুর পর কেন এইভাবে আবিভূত হইবেন?
এই প্রশ্নের উত্তরে ইঙ্গিত হইতে পারে যে সেই বাড়ীটা ও
স্থানটার উপর তাহার আসক্তি থাকার সম্ভব মনে হয়। ঘোড়ার
মৃত্যুটাও তাঁহার মনে লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বাগ্‌ড়াটে ভূত।

[মাঝে মাঝে এমন ঘটনাও হয় যে ভূত অকারণে বাগড়া,
কলহ করে ও অত্যাচার করে। এইরূপ ঘটনার সংখ্যা খুব
বেশী নহে। নিম্নে একটা ঘটনা বিবৃত করা যাইতেছে। ১৮৯০
ইং সনে মিঃ জেম্‌স্ ডারহাম এই ঘটনাটী স্বহস্তে লিখিয়া দস্তখত
করেন।]

ডারলিংটন সহরের ষ্টক্‌স্টন নামক ষ্টেসনে আমি রাত্রির পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। শীতকালের একরাত্রে ১২-৩০ মিনিটের সময় আমি বাহিরে থাকিয়া শীতে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। একটু সরিয়া গিয়া কিছু খাওয়ার যোগাড় করিব মনে করিলাম। নিকটে একটা দালানের কোঠরিতে আগুন জ্বলিতেছিল। একটা কয়লার গোদাম ঐ কোঠরীর সংলগ্ন ছিল। কয়েক পা নামিয়া সেই কোঠার আগুনের পার্শ্বস্থ একটা বেঞ্চে ওভার-কোটটা খুলিয়া রাখিয়া আগুনের নিকটে গেলাম। এমন সময় একটা লোক কয়লার গোদাম হইতে আসিল। তাহার সঙ্গে একটা কুকুর। আসিয়াই সে আমার দিকে চোখ ঘুরাইয়া চাহিয়া আগুনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি ও তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ লোকটা আমাকে একটা আঘাত করিল। আমিও হাত মুট করিয়া তাহাকে ঘুষি মারিলাম কিন্তু আমার হাত তাহার শরীরের ভিতর দিয়া গিয়া আগুনের উপর দিকে একটা পাথরে গিয়া লাগিল এবং তদ্রূপ হাতে বাথা পাইলাম। আমার ঘুষিতে লোকটাও কতক হেলিয়া পড়িল। এবং বিড়্ বিড়্ করিয়া অস্পষ্ট শব্দ করিল। ইতিমধ্যে কুকুরটা আমার পায়ে আছড়াইতে ও উদ্বেগ করিতে লাগিল।

ঘুষি মারার পর লোকটা পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কুকুরটাকে সিস্ দিয়া ডাকিল এবং কুকুর সহ পুনরায় কয়লার গোদামে প্রবেশ করিল। আমার লেনটার্ণটা জ্বলাইলাম।

আলো লইয়া কয়লার গোদামে গেলাম। দেখিলাম গোদাম ঘর একেবারে জনপ্রাণী শূন্য! ঐ এক দরজা ভিন্ন গোদামের অন্য কোন দরজাও ছিল না।...

কয়েক বৎসর পর মিঃ পিজ সাহেবের সঙ্গে আলাপে জানিলাম যে ঐ লোকটা ষ্টেসনে চাকরী করিত। পরে আশ্চর্যতা করে এবং তাহার দেহটা ঐ দারোয়ানের কোঠরীতে নেওয়া হয়। তাহার একটা কুকুর ও ছিল। পিজ ঐ কর্মচারীর বিবরণে যাহা বলিলেন তাহাতে আমার দৃষ্ট লোকটা সেই কর্মচারী বলিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল।

ভৌতিক ঘটনার মধ্যে সময় সময় এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তাহার কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। কাপ্তান মরগেনের নিজের অভিজ্ঞতার একটা বৃত্তান্ত নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

পাখীরূপী ভূত।

কাপ্তান মর্গেন এবং তাঁহার একজন বন্ধু একদিন বৈকালে লগুনে উপস্থিত হইলেন এবং দুইজনে দুই কোঠা ভাড়া করিয়া রহিলেন। রাত্রে শুইয়া আছেন—নিদ্রা হইয়াছে এমন অবস্থায় কোঠার ভিতরে পাখীর পাখা নাড়ার শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সর্ব্বশরীরে যেন একটা ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড কালরঙ্গের পাখীর আকৃতি জানোয়ার পাখা দুইটী বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখ দুটী আগুনের মত লাল।

পাখীটা সাহেবের কাছে আসিয়া চোখে মুখে ঠোকরাইতে উত্তত হইল। পাখীটা এমন ক্ষিপ্ততার সহিত আক্রমণ করিল যে সাহেব ছুইহাতে এবং বালিশের সাহায্যে অতি কষ্টে যেন আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই প্রবল যুদ্ধের সময় সাহেবের মনে হইল যে বাড়ীওয়ালার পোষা কোন পাখী দৈবাৎ ছুটিয়া গিয়া এই কোঠায় আবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

পাখীটা পুনঃ পুনঃ সাহেবকে অবর্ণনীয়রূপে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সাহেব লক্ষ্য করিলেন যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত যদিও তিনি আত্মরক্ষা করিতেছেন তথাপি একবার ও পাখীটাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। কয়েক মিনিটকাল এইরূপে যুদ্ধ করিয়া সাহেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং লাফাইয়া উঠিয়া পাখীটাকে আক্রমণ করিলেন। পাখীটা পশ্চাদিকে সরিয়া কোণায় গিয়া দাঁড়াইল।

এতক্ষণে সাহেব কিছু ভরসা পাইয়া সবেগে যাইয়া পাখীটার উপর পড়িলেন। পাখীটার উপর পড়া মাত্রই সাহেব আর পাখী দেখেন না। হাতের মুঠা ও আকাশ ভিন্ন কিছুই নাই। সব অলীক ! স্বপ্নবৎ !

লেম্প লইয়া সমস্ত ঘর তালাস করিলেন কিন্তু কোথাও কিছু নাই। অনেকক্ষণ তালাস করতঃ হতাশ হইয়া সাহেব পুনরায় ঘুমাইলেন। আর কোন উদ্বেগ হইল না।

সাহেব যোদ্ধা বীর পুরুষ। মনে মনে ঠিক করিলেন যে এই অপমানের বিষয় কাহাকেও বলিবেন না। পরদিন প্রভাতে

তিনি এই বিষয় কিছুমাত্র আলাপ আলোচনা না করিয়া তাহার বন্ধুটির সঙ্গে বাসা অদল বদল করার প্রস্তাব করিলেন। বন্ধুটি সরল মনে তাহা স্বীকার করতঃ পরস্পর বাসস্থান পরিবর্তন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বন্ধুটি আসিয়া বলিলেন সে রাত্রিতে তিনি বড়ই উদ্বেগ সহ করিয়াছেন! পাখীর মত কাল রঙ্গের একটা জানোয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু ধরিতে গিয়া ধরা যায় নাই। এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা তিনি জীবনে প্রত্যক্ষ করেন নাই।

পুনর্জন্ম বাদ।

মিঃ গিল্ডহল্ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে ব্রহ্মদেশের কয়েকটি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত একটি রত্নাস্তের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিতেছেন :—

আমার এক বন্ধু ঘটনাক্রমে একদিন ব্রহ্মদেশের এক সুদূর ক্ষুদ্র পল্লীর সমীপবর্তী এক অরণ্যে অবস্থিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মঠে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষে মঠটি বৃহদাকার ও অতি রমনীয় হইয়াছে। টিক্ নামক অতি মূল্যবান কাষ্ঠ নিষ্মিত মঠ (আশ্রম)। ইহা প্রস্তুত করিবার জন্ত হয় ত বহু দূর হইতে কাষ্ঠ আনাইতে হইয়াছে এবং নির্মাণ কার্যে বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে।

তাঁহার এই মন্তব্য শুনিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকেরা ঐ মঠের

নিৰ্মাণকাহিনী যাহা বলিল, সে অতি বিস্ময়কর। বৃত্তান্তটি এই :—

অতি প্রাচীনকালে অত্যাশ্চর্য বস্তু পল্লীর স্থায় এই পল্লীতেও ছন বাঁশের নিৰ্ম্মিত আশ্রম গৃহই ছিল। তদানীন্তন মহাস্ত (সন্ন্যাসী) ঐ আশ্রমের সংকীর্ণতা প্রযুক্ত, বিশেষতঃ তাহাতে তৎপরিচালিত পাঠশালার স্থান সংকুলান না হওয়ার দরুণ নানা প্রকারে অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন। [ব্রহ্মদেশের অধিবাসীগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সে দেশের প্রত্যেক গ্রামেই এক একটি মঠ বা আশ্রম থাকে। তাহাতে একজন মহাস্ত অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকে। ঐ মহাস্ত গ্রামের ছেলে মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়। তাঁহার আশ্রমটি একটি বিদ্যালয়। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ঐ সন্ন্যাসীর উপদেশ মতেই ঐ গ্রামের লোক পরিচালিত হয়। ভিক্ষারন্তিই সন্ন্যাসীর উপজীবিকা। গ্রামের লোক পুণ্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীকে সময় সময় খাদ্য পরিধেয় আদি উপঢৌকন স্বরূপেও দিয়া থাকে।]

কোনও এক বর্ষা ঋতুতে সন্ন্যাসী কতকগুলি টিঙ্ বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ করতঃ আশ্রমের নিকটবর্তী স্থানে ঐগুলি বপন করিলেন এবং পরে আবশ্যকমত জল সিঞ্চনাদি দ্বারা যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন ঐ সমস্ত বীজ হইতে চাড়া উঠিয়া ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল তখন তিনি বলিতেন “এই গাছগুলি দ্বারা এই মঠ নিৰ্ম্মাণের কাঠের কাজ চলিবে। আমি পরজন্মে আবার এই স্থানে ফিরিয়া আসিব এবং এই গাছগুলির

কাঠ দ্বারা নূতন মঠ নির্মাণ করিব। সেই মঠ এখনকার মঠ হইতে বৃহদাকার ও সুন্দর হইবে।

টিক্ গাছগুলি বড় হইয়া কার্যোপযোগী কাঠ যোগাইতে অন্ততঃ একশত বৎসর সময় লাগে। সন্ন্যাসীর উক্ত টিক্ গাছের চারাগুলি নিতান্ত কচি থাকিতেই ঐ সন্ন্যাসী পরলোকগামী হন এবং তাঁহার স্থলে অপর এক সন্ন্যাসী আসিয়া মঠের কার্য নিৰ্বাহ করিতে থাকে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। এক সন্ন্যাসীর পর অপর সন্ন্যাসী আসিয়া মঠের কার্য নিৰ্বাহ করিতে লাগিল। যথাকালে আবশ্যকমতে মঠটার জীর্ণ সংস্কার এবং কখনো বা নূতন মঠ নির্মাণ হইতে লাগিল। ঐ দিকে টিক্ গাছগুলিও আস্তে আস্তে বড় হইতে লাগিল। কালক্রমে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র গ্রামটী আরও ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিল। মঠের সন্ন্যাসী মরিয়া গেল। দুর্দশার স্থানে অত্র কোন সন্ন্যাসী আসিল না। ক্ষুদ্র পল্লীটীতে মঠও রহিল না সন্ন্যাসীও রহিল না।

মঠ শূন্য অবস্থায় থাকা গ্রামবাসীর পক্ষে নিতান্তই অসুবিধাজনক। 'কে বা ছেলেপিলেদের লিখাপড়া শেখায়—কেই বা ধর্মোপদেশ দেয়—ধর্মোপার্জনেরই বা উপায় কি?' বাস্তবিক ঐ গ্রামের বাসিন্দাগণ নিতান্তই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

অবশেষে একদিন বিকালে ঐ গ্রামের কয়েকটী বালিকা কুয়া হইতে জল আনিতে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, ক্ষুধায় ও পথশ্রমে কাতর এক সন্ন্যাসী অরণ্য হইতে বাহির হইয়া আসি-

তেছে। তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ পল্লীময় রাষ্ট্র হইল এবং গ্রাম-বাসীরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিল এবং পরিত্যক্ত পুরাতন মঠ পরিষ্কার করিয়া সন্ন্যাসীর বাসের যোগা করিয়া দিল। সন্ন্যাসী মঠে প্রবেশ করিল। গ্রামবাসীরা দলে দলে সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া আলাপ করিতে লাগিল। এই-রূপ আলাপে প্রকাশ পাইল যে, সন্ন্যাসী সেই মঠ চিনে, মঠের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জঙ্গল চিনে, ঐ জঙ্গলে কোথায় কোন সংকীর্ণ পথ আছে, কোথায় কোন গাছ আছে, কোন দিকে কোথায় কোন গ্রাম—কোন পথেই বা কোন গ্রামে যাওয়া যায়, তাহা সব চিনে ও জানে। গ্রামবাসীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বোধ হইল যেন এই সন্ন্যাসী বহুকাল এখানে বাস করিয়াছে। কিন্তু তাহার বয়স তো দেখা যায় অল্প। বয়সে তাহার জ্যেষ্ঠ লোক ত বহুতর রহিয়াছে। যদি এই সন্ন্যাসী এখানে থাকিত তার পরিচয় থাকিত না কি? অথচ এই সন্ন্যাসী গ্রামের মৃত মুর্খবিশদের নাম বলিতে পারিতেছে। বিষয়টা কি ঠিক করিতে না পারিয়া গ্রামের লোক হতবুদ্ধি হইয়া রহিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী রাতি অনুসারে ভিক্ষা করিতে গ্রামে গেল। বিকালে গ্রামের লোক মঠে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তখন সন্ন্যাসী বলিল যে, এক সন্ন্যাসী বহুপূর্বে এই সব টুক্ গাছ লাগাইয়াছিল এবং ঐগুলি বড় হইলে পুনঃরায় আসিয়া মঠ নিৰ্ম্মাণ করিবে বলিয়াছিল। এই কথা শুনিয়া ৯০৯৫ বৎসর বয়স্ক লোকেরা

বলিল “হাঁ, সেত বছকালের কথা। এ সন্ন্যাসী মরিয়া গিয়াছে।”

তখন সন্ন্যাসী বলিল “আমিই সেই সন্ন্যাসী। গাছগুলি বড় হইয়াছে। ঐগুলির কাষ্ঠ দ্বারা আমি এখন নূতন মঠ তৈয়ার করাইব।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী অবাক্ হইয়া গেল। কেহ কেহ সন্ন্যাসীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এমন সময় অপর এক বৃদ্ধ আসিয়া বলিল “এক সন্ন্যাসী যে টিক্ গাছ লাগাইয়াছে এবং ঐ গাছ বড় হইলে পুনরায় আসিয়া ঐ গাছের কাঠ দ্বারা নূতন মঠ তৈয়ার করাইবে বলিয়া গিয়াছে, এই প্রবাদ বাক্য ত আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি? তখন সন্ন্যাসী বলিলেন যে তিনি সবই জানেন। আরও বলেন যে বর্তমান জন্মে তিনি দক্ষিণাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করতঃ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকেন ও লেখাপড়া শিক্ষা করিতে থাকেন। কালক্রমে এক মঠে তিনি ভর্তি হন এবং ক্রমশঃ ফুজি (মহাস্ত বা সন্ন্যাসী) হন। ঐ সময়েই তাঁহার পূর্ব জন্মের স্মৃতি উপস্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে তিনি যে কোথাকার কে তাহা তিনি জানিতেন না। টিক্ গাছ লাগান তিনি স্বপ্নেও দেখিয়াছেন।

পরের দিনই তিনি রওয়ানা হইলেন এবং দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাটিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া অবশেষে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। গ্রামবাসীগণ

সকলেই বিশ্বাস করিল এবং সকলের সমবেত পরিশ্রমে অত্যন্ত সময় মধ্যেই টিক্ গাছ কাটা হইয়া তদ্বারা প্রকাণ্ড মঠ প্রস্তুত হইল। সন্ন্যাসী সারাজীবন ঐ মঠে থাকিয়া ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শিখাইলেন। গ্রামবাসীগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী শিক্ষা দিলেন এবং অবশেষে যথাকালে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কারণ কথিত আছে যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মৃত হন না। প্রত্যাবর্তন করেন মাত্র !!

নিম্নলিখিত ঘটনাটিও মিঃ এইচ্ গিল্ডহল সাহেব নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :—

মোয়াঙ্ সান্ নাই ইন্ এবং মাগাই উইনের বৃত্তান্ত।

“প্রায় ৫০ বৎসর হইল ব্রহ্মদেশের অক্সিট্‌গণ নামক গ্রামে দুইটা শিশু জন্মগ্রহণ করে। ঐ দুইটা শিশু একই সময়ে দুই পৃথক বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করে। বড়টা ছেলে এবং তাহার নাম মোয়াঙ্ সান্ নাই ইন্। ছোটটা মেয়ে, নাম মাগাই উইন্। এই বালক বালিকা দুইটা একত্রে খেলা করিত এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিত। কালক্রমে তাহারা পরস্পর বিবাহিত হয় এবং গ্রামের পার্শ্ববর্তী জমিতে কৃষি আদি করিয়া গৃহস্থ জীবন যাপন করিতে থাকে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত বলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধি ছিল। এবং একত্রে জীবন যাপন করিয়া একত্রেই তাহারা দেহত্যাগ করে। একই দিনে একই সময়ে তাহাদের উভয়ের মৃত্যু হয় এবং একই সমাধিতে তাহা-দিগকে সমাহিত করা হয়। ঐ সময়ে ঐ দেশে হুর্ভিক্ষ মহামারী

আদি উৎপাত আরম্ভ হয়। গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া অন্ত্র চলিয়া বাইতে থাকে এবং মোয়াঙ নাইইন্ ও মাগাই উইন্ এর কথা সকলেই ভুলিয়া যায়।

অকসিট্গণ মৌজার মোয়াং কান্ নামক এক ব্যক্তি তাহার পত্নীসহ কাবাইও নামক গ্রামে চলিয়া যায় এবং সেই গ্রামেই বাস করিতে থাকে। মোয়াঙ্ কান্ কাবাইও গ্রামে যাওয়ার অল্প পূর্বে অকসিট্গণ গ্রামে থাকা কালে তাহার দুইটি জমজ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। একটির নাম ছিল মোয়াঙ্ গাইই (অর্থাৎ বৃহৎ ভাই) অপরটির নাম ছিল মোয়াঙ্ মি (ক্ষুদ্র ভাই)। বালক দুইটি কাবাইও গ্রামে বদ্ধিত হইতে লাগিল এবং অল্প দিন মধ্যেই কথা কহিতে শিখিল। এক দিন তাহাদের পিতা মাতা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল যে ছেলে দুইটি পরস্পর পরস্পরকে যথাক্রমে মোয়াঙ্ গাইই ও মোয়াঙ্ মি না ডাকিয়া মোয়াঙ্ সান্ নাইইন্ ও মাগাই উইন্ ডাকিতেছে। মাগাই উইন্ নামটি স্ত্রীলোকের নাম। তাহাদের পিতামাতার মনে ছিল যে ঐ দুই নামের বান্ধব আকসিট্গণ গ্রামে স্বামী স্ত্রী ছিল এবং তাহারা একত্রে মৃত ওঁ সমাধিস্থ হইয়াছিল। উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা তাহাদের পিতামাতা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঐ দুই ব্যক্তির আত্মা আসিয়া তাহার পুত্রদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছে। বিষয়টা ভালরূপে পরীক্ষা করার জন্ত তাহারা ছেলে দুইটিকে লইয়া অকসিট্গণ মৌজায় গেলেন। গিয়া দেখিলেন ছেলেরা সেই মৌজা চিনে, পথঘাট চিনে এবং লোকজন বাড়ীঘর সবই চিনে। তাহারা পূর্বজন্মে যে

কাপড় পরিয়াছিল তাহাও চিনিতে পারিল। এই বিষয়ে কোন সন্দেহই রহিল না। ছোটটি যে পূর্বজন্মে স্বীলোক ছিল তখন যে তাহার পতির অজানা মতে মা থেট নামক অপর এক স্বীলোক হইতে দুই টাকা কজ্জ নিয়াছিল। ঐ ঋণ পরিশোধ হওয়ার পূর্বেই তাহাদের মৃত্যু হয়। ঐ ঋণের বিষয় মনে হইল এবং অনুসন্ধান করিয়া মা থেটকে জীবিতই পাওয়া গেল। মাগাই উইন যে তাহা হইতে দুই টাকা ধার নিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণ ছিল।

কিছু দিন পর ছেলে দুইটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। (গিল্ডহল সাহেব বলিতেছেন)। তাহাদের বয়স তখন ৬ বৎসর। বড়টী সবলদেহ ও নোটা মোটা এবং ছোটটী হাল্কা ও মেয়ে লোকের আকৃতি বিশিষ্ট। তাহারা আমার নিকট তাহাদের পূর্বজন্মের বিবরণ বলিয়াছিল। তাহারা বলিল যে মৃত্যুর পর কিছু সময় তাহারা দেহহীন অবস্থায়ই ছিল। বায়ুর মধ্যে পরিভ্রমণ করিত এবং গাছের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিত। কয়েক মাস পরেই তাহারা বনজ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। বড়টী বলিল যে কিছুদিন পূর্বে সম্পূর্ণ বিবরণই তাহার স্পষ্ট মনে ছিল, কিন্তু যতই সময় যাউতেছে ততই তাহার স্মৃতি মলিন হইতেছে।

“আরও একটী শিশুছেলে আমাকে (মিঃ গিল্ডহলকে) বলিয়াছে যে তাহার পূর্বজন্মের পরিধেয় রেশমী কাপড় দেখিয়া তাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি উদয় হইয়াছিল। ঘটনাগী হইয়াছিল

এই যে একজন ধনী বণিকের পুত্রের সন্ন্যাসগ্রহণ উপলক্ষে ঐ শিশুটি নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসীর মঠে গিয়াছিল। তখন তাহার বয়স ৩ বৎসর মাত্র। মঠটি ছিল বাঁশের তৈয়ারী। উৎসব উপলক্ষে পরদা দিয়া ঐ মঠের ভিতরের স্থান কয়েকটি কোঠায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। শিশু দেখিল ঐ পর্দাতে তাহার পূর্বজন্মের রেশমী শীতবস্ত্রটা লাগান রহিয়াছে। ঐ কাপড়খানা দেখিয়া তাহার পূর্বজন্মের বাড়ীঘর আত্মীয় স্বজনের কথা মনে হইল। পরে তদন্তে জানা গেল যে সে ছেলে মরিয়া যাওয়ার পর তাহার কাপড়গুলি সন্ন্যাসীর মঠে দান করা হইয়াছিল। মঠে তাহা পর্দারূপে ব্যবহৃত হইতেছে।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

মৃত্যু-ভয় ।

দৃশ্যমান সৃষ্ট জীবের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধিতে মানুষ শ্রেষ্ঠ—ইহা অবিসম্বাদী সত্য । মানুষ ইচ্ছা করিলে পুরুষকারের বলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে । ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আজ ও বিরল নহে । স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে জীবন্ত সিংহ বাস করিতেছে—তাহাকে জাগাইতে পারিলেই হইল । ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র এ হেন মানব জাতি নিতান্ত অসহায়ের মত ভীত ও দুর্বল হইয়া থাকা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় । ইংরেজীতে একটি সুন্দর কথা আছে, যে, ভীরা কাপুরুষেরা মৃত্যুর পূর্বেই সহস্রবার মরিয়া থাকে । ভীত লোক সর্বদাই দুর্বলচিত্ত ।—বাস্তবিক সবলতাই জীবন এবং দুর্বলতাই মৃত্যু । ভীত ও দুর্বলচিত্ত লোকের ইহকাল পরকাল সব কালই নষ্ট হইয়া থাকে । ভয় হইতেই দুর্বলতার উৎপত্তি হয় এবং সেই দুর্বলতা হেতু লোকে মিথ্যা বলে, প্রবঞ্চনা করে, স্বার্থপর ও কুটিলপ্রকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং তদ্রূপ পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, হিংসা দেব আদি জঘন্য ও ঘৃণিত মনোবৃত্তি অবলম্বনে জগতের অমঙ্গল সাধন করে এবং নিজের আত্মাকে অধঃপাতিত কবে । পক্ষান্তরে বলবান বীর হৃদয়ে

ভয় বা দুর্বলতার স্থান নাই। দুর্জয় পুরুষকারের বলে অভীষ্ট তাঁহার সর্বদাই করতলগত। সত্য ও সোজা উপায়ে যিনি নিজ মহদভিপ্রায় সিদ্ধি করিতে সক্ষম, কাহার ভয়ে তিনি মিথ্যা বা কপটতা অবলম্বন করিবেন? মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দ্বেষ আদিকে তিনি স্পর্শের সহিত পদাঘাত করিয়া থাকেন।

মহাবীর আলেকজান্ডার দিগ্বিজয় উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিয়া দণ্ডী নামক এক ঋষির আশ্রমের অদূরবর্তী স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন। পূর্ব হইতেই তিনি ভারতের ঋষিদিগের বৃত্তান্ত খানিকটা অবগত থাকায়, এই সুযোগে তিনি ঋষির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ করার জন্য কোঁতূহলাক্রান্ত হন এবং ঋষিকে নিজ শিবিরে আনিবার জন্য আশ্রমে অনুচর প্রেরণ করেন।

অনুচর আশ্রমে গিয়া ঋষির নিকট বাদসাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ঋষি বলিলেন “এই সময়ে বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহাতে বাদসাহের কোনরূপ উপকার হওয়ার যদি সম্ভবনা থাকিত তবে তপস্তার কাজ স্থগিত রাখিয়া ও শিবিরে যাওয়া কর্তব্য হইত। কিন্তু তাহা হওয়ার সময় এখনো আসে নাই। অकारণে তপস্তার বিঘ্ন সংঘটন করিতে আমরা অক্ষম। বাদসাহকে এই সংবাদ এবং আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর।”

বাদসাহের অনুরোধ এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইতে অনুচর তাহার জীবনে কোথাও প্রত্যক্ষ করে নাই। ঋষির

বাপারটী একান্তই স্বাভাবিক, সুনিশ্চিত এবং অনিবাধ্যরূপে প্রয়োজনীয় বাপার। ইহা কখনো দুঃখের কারণ নহে ও হইতে পারে না। আমরা মোহজালে এতই বিজড়িত রহিয়াছি যে স্বয়ং ভগবান আমাদের সশরীরে স্বর্গে নেওয়ার জন্য সুবর্ণরথ পাঠাইলেও আমরা যাইতে সম্মত হইব না। এই ঘৃণিত মনোবৃত্তি-টাকে ত্যাগ করিয়া সর্বদা সর্বক্ষণ সাহস ও উৎসাহে বুক বাঁধিয়া এই অস্থিমাংসের দেহরূপী বোঝাটা সরাইয়া দেওয়ার সুসময়ের জন্য প্রতীক্ষায় থাকাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য। গর্দভ পৃষ্ঠের বোঝার ন্যায় আমাদের এই জড়দেহটা ভগবানের বিতরিত অনেক সুখ সম্পদ হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখিয়াছে। আমরা দ্রষ্টব্য জিনিষের এক আনা পরিমাণও দেখিতে পাই না। উপভোগ্য জিনিষের এক আনা পরিমাণও উপভোগ করিতে পারি না। এই অনর্থের মূল হেতুই হইতেছে এই জড়দেহটা। ইহার প্রতি আসক্তির একমাত্র কারণই হইতেছে মায়ামোহ। যুক্তির দিক দিয়া ভাবিতে গেলে আসক্তির কিছুমাত্র হেতু পাওয়া যাইবে না।

মৃত্যু নামাকরনীয় দেহত্যাগকে ঋষিশাস্ত্রে মহানিদ্রা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক নিদ্রা যেমন দেহত্যাগ, মহানিদ্রাও তাই। নিদ্রার পর পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসা হয়, মহানিদ্রায় তাহা হয় না। নিদ্রা আসিতে কাহারো কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হয় না; সেইরূপ জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহযাত্রার উপযোগী অত্যাবশ্যকীয় আহার, নিদ্রা, শ্বাস, প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন,

পরিপাক ক্রিয়া, মল মূত্র ত্যাগ আদি কোন ব্যাপারেই স্বাভাবিক ভাবে ভগবান কোনরূপ ক্রেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই। আমরা এক সিঁড়িতে দাড়াইয়া অন্য সিঁড়ির অবস্থা বর্ণনা করার স্পর্ধা করি, তাহাতেই সিদ্ধান্ত ভুল হয়। আমরা মাতৃগর্ভে থাকিয়া যদি মাতৃগর্ভের অবস্থা বর্ণনা করিতে পারিতাম কিম্বা দেহত্যাগ সময়ে যদি দেহত্যাগের অবস্থা বর্ণনা করিতে পারিতাম তবেই ঐ সকল অবস্থাকে ক্রেশের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিতাম না। জলমগ্ন অবস্থায় ১০ মিনিটে আমাদের প্রাণবিয়োগ হয়; কিন্তু মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণী জলেই পরমানন্দে নৃত্য করে এবং জলেই বৃদ্ধিত হয়। ডাঙ্গায় উঠিলেই ইহাদের মৃত্যু! বয়স্ক লোকের পক্ষে গর্ভে বাস করার ভাবনাটা যতই ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বিবেচিত হউক, গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষে মাতৃগর্ভ ভিন্ন সুখ শান্তি দায়ক স্থান জগতে মিলে না। ধনীর ধনাগার নৃপতির রাজ প্রাসাদ, মহর্ষির আশ্রম, রোগীর স্বাস্থ্য নিবাস প্রভৃতিতে কিম্বা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এমন একটী স্থান নির্বাচন করা যাইবে না, যেখানে গর্ভস্থ ভ্রূণ তাহার কচিদেহ রক্ষা করিয়া বাঁচিতে সক্ষম। মাতৃগর্ভে সে যে কেবল বাঁচিয়া থাকে তাহা নহে, অত্যন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিতে কালাতিপাত করে। দিন দিন পুষ্ট ও বৃদ্ধিত হওয়াই ইহার অকাট্য প্রমাণ! ক্রেশে থাকিলে কখনো পুষ্টি বা বৃদ্ধি হইতে পারে না।

দেহত্যাগের ব্যাপারটাও আমরা দেহাশ্মবোধসম্পন্ন লোকের আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত ক্রেশকর বলিয়া অনুমিত হইলেও প্রকৃত

প্রস্তাবে ইহা অত্যন্ত সুখ শাস্তির ব্যাপারই বাটে। ইহাতে রোগ শাক, দুঃখ দারিদ্র্য আদি জনিত সর্বপ্রকারের ক্লেশ সর্বতোভাবে বিদূরিত হইয়া যায়। দেহত্যাগ হওয়ার পরই প্রকৃত উপভোগ্য জীবন লাভ হয়।

আপাত দৃষ্টিতে দেহত্যাগের পূর্বের কাহারো কাহারো কতগুলি গুরুতর ক্লেশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়—যেমন বিভীষিকা সূচক বিকৃত মুখভঙ্গী, অস্পষ্ট চিৎকার প্রভৃতি। ঐ গুলি প্রায়ই জড়দেহের স্বাভাবিক সংকোচন প্রসারণশীলতা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্রূপ দেহের কোনরূপ ক্লেশবোধ করিতে হয় না। ঐ সকল সংঘটিত হওয়ার অনেক পূর্বে হইতেই দেহী দেহের সংশ্রব ছাড়িয়া দিয়া থাকে। পড়িয়া থাকে কেবল দেহটা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াটা। কোন কোন স্থলে শ্বাসরোধ হওয়ার ৩৪ ঘণ্টা পূর্বে দেহী তাহার পরলোকগত হিতৈষী আত্মীয় বন্ধুগণের সাহায্য লাভ করতঃ দেহের বাহিরে চলিয়া যায়। তৎপর ক্ষণেকের জন্য পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিলেও সেই ক্ষণমাত্র সময় সুস্থ এবং শান্ত ভাবই অবলম্বন করে।

দেহত্যাগের পূর্ববর্তী রোগ যন্ত্রনাটা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই। এরূপ যন্ত্রণা আমরা জীবনে অনেকই ভুগিয়া থাকি। তজ্জন্য ব্যাকুল হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নাই। সৃষ্টি প্রপঞ্চের প্রতি নিবিষ্ট চিন্তে লক্ষ্য করিলে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র কেবল ভগবানের অপার করুণার ভাবই পরিলক্ষিত হয়।

পাপী পুন্যাত্মা নির্বিশেষে সকলের মাতা পিতা ও বন্ধুবান্ধব ভগবান যেন সকলের সুখ শান্তি বিধান করার উদ্দেশ্যে অনিমেঘনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন। দুঃখ বেদনার সীমা অতিক্রম হওয়ার লক্ষণ উপস্থিত হওয়া মাত্রে তিনি সকলকেই তাঁহার শান্তিদায়ক ক্রোড়ে আশ্রয় দেন। তখন দেহটী মাত্র পড়িয়া থাকে। লোকে বলে মূর্ছা আসিয়াছে। যে পরিমাণ বেদনা ও যন্ত্রণাতে মূর্ছা হয় তাহার ওজন সর্বত্র সমান। তদতিরিক্ত যন্ত্রণা কেহকে কোন অবস্থায়ই ভোগ করিতে হয় না। তবে আর মৃত্যুভয় কেন?

সর্পদংশন, উদ্বন্ধন, নিমজ্জন আদি মূলে দেহত্যাগ ব্যাপার, মোহান্ধ জীব আমরা বড়ই যাতনাদায়ক মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হই। পরম কারুণিক সর্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের কৃপাদৃষ্টি সর্বত্র সমভাবে নিপতিত রহিয়াছে। ভুলেও কদাপি অনায়াসে অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ঘোর অবিশ্বাসী, অক্ষম ও মোহান্ধ আমরা নিজ কর্মফলে অকারণ উদ্বেগ ভোগ করিয়া থাকি।

সর্পদংশন, উদ্বন্ধন, নিমজ্জনাদি মূলে মৃতবৎ প্রতীয়মান অনেক বাক্তি পুনরায় তাক্ত দেহে ফিরিয়া আসিতে ও সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আলাপে বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান থাকে ততক্ষণ নিদারুণ মৃত্যুভয়ই অত্র সর্ব প্রকারের যন্ত্রণাকে ঢাকিয়া রাখে, অনুভব করিতে দেয় না। তৎপর জ্ঞান লোপ হইয়া গেলে আর কোন যন্ত্রণাই থাকে না।

বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনুভূতি হয়। যিনি যে পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নহেন, সেই

পরিস্থিতির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। সাধনা বলে যাহারা জ্ঞানের উচ্চতরে অধিকৃত হইতে পারেন, সর্বপ্রকারের পরিস্থিতি তাহাদের নিকট হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া যায় এবং তাহাদের সিদ্ধান্ত সকল ভ্রমশূন্য হয়। এই প্রকারের মহাপুরুষ শ্রীমৎ কৃষ্ণ দৈন্যায়ন বেদবাস কটুক লিখিত শ্রীভগবানের অভয়বাণী উচ্চারণ করতঃ চলুন আমরা গ্রন্থ সমাপন করি।

দেশ-বিদেশ-বাসী সতাব্রত ও জিতেন্দ্রিয় সৃক্ষদর্শী মহাপুরুষ-গণের অমৃত নিশ্চন্দ্রিনী বাণী অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল। সেই মহাপুরুষগণের কৃপা ও শুভেচ্ছায় সমান কেশদধ্ব শোকার্ত নরনারীর তাপিত প্রাণে শান্তিধারা বহিত হউক। সর্ব ভয় নিবারণকারী শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে :

পিতাহমস্মৈ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদাং পবিত্রমোংকার ঋক্ সাম যজুর্বেদ ॥ গীতা ৯ম অঃ ১৭

গতির্ভূতা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং যুগ্মং ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ম ॥ ৯।১৮

তপামাহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যাস্থজামি চ ।

অমৃতৈশ্বেব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ৯।১৯

—:~:—

সম্পূর্ণ

